গদাধর

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের
বাল্য লীলা কাহিনী

গদাধর

প্রথম খণ্ড

[ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের
বাল্যলীলা কাহিনী]
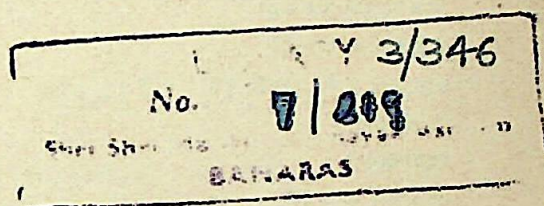
অজাতশত্রু

প্রথম প্রকাশ :
রথযাত্রা ১৩৬৫
প্রকাশক :
শ্রীকমলেশ চক্রবর্ত্তী
কল্পতরু প্রকাশনী
৮নং কে. কে. রায়চৌধুরী রোড (বড়িষা)
কলিকাতা—৮
মুদ্রাকর :
শ্রীনির্ম্মল কৃষ্ণ বসু
নির্ম্মল প্রেস
২১ নং রাজা লেন
কলিকাতা—৯
প্রচ্ছদ শিল্পী :
শ্রীমাণিক চট্টোপাধ্যায়
ব্লক নির্ম্মাণ :
ব্যানার্জ্জী ব্রাদার্স
১নং সাহিত্য পরিষদ ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৬
প্রচ্ছদপট মুদ্রণ :
মোহন প্রেস
কলিকাতা—৯
বাঁধাই :
ন্যাশানাল কমার্সিয়াল সিণ্ডিকেট
কলিকাতা—৯
পরিবেশক
শ্রীঅপরেশ চক্রবর্ত্তী
৮ নং কে. কে. রায়চৌধুরী রোড (বড়িষা)
কলিকাতা—৮

মূল্য : ৪.৫০ ন. প.

উৎসর্গ

জনক জননী
৺শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
ও
৺কালীকুমারী দেবীর
পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে

লেখকের কথা

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূত জীবন নিয়ে অনেক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিই গ্রন্থ রচনা করেছেন। তারপরেও আবার আমি কেন লিখলাম সেই কৈফিয়ৎ দেবার জন্যেই এইটুকু লেখা।

ঠাকুরের পূত জীবন নিয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা হ'লেও, তাঁর জনক জননী, পারিবারিক ও বাল্যজীবন নিয়ে একমাত্র স্বামী সারদানন্দ মহারাজ রচিত "রামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ" ছাড়া অন্য কোন গ্রন্থে বিশদভাবে কেউ লেখেন নি বা কেউ লিখলেও সে কথা আমার জানা নেই।

আবার বাল্যজীবনের অনেক বিশেষ বিশেষ ঘটনা যা শ্রীঅক্ষয়-কুমার সেন মহাশয় রচিত "রামকৃষ্ণ পুঁথিতে" পেয়েছি তা আবার "রাম-কৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গে" উল্লেখ নেই। আমি উভয় গ্রন্থের ও শ্রীবৈদ্যনাথ লাহা মহাশয়ের লেখা "কামারপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণ" ইত্যাদি রচনা থেকে ঘটনাগুলো নিয়ে কাহিনীর মত ক'রে ধারাবাহিক ভাবে সাজিয়ে গেছি। ঘটনাগুলো কোনটাই আমার মানস কল্পিত নয়। তবে কারণগুলোতে ও চরিত্রকে বিশেষ ভাবে ফুটিয়ে তোলবার জন্যে কিছু কিছু কল্পনার সাহায্য নিয়েছি।

পরিশেষে এই কথাই ব'লতে চাই—যিনি মূককে বাচাল করেন, পঙ্গুকে দিয়ে গিরি লঙ্ঘন করান, তাঁরই কৃপা এবং করুণাতে আমার মত অক্ষমের দ্বারা এই বই লেখা সম্ভব হ'য়েছে। এখন বাংলার ঘরে ঘরে তাঁর এই বাল্যলীলা কাহিনী সমাদৃত হ'লে শ্রম সার্থক ব'লে মনে ক'রবো ও ধন্য হব।

যাঁদের গ্রন্থ থেকে তথ্য নিয়ে আমি এই লীলা কাহিনী রচনা ক'রেছি এই সঙ্গে তাঁদের আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এ ছাড়া শ্রীকমলেশ

চক্রবর্ত্তী, অপরেশ চক্রবর্ত্তী, যুগলকিশোর দাস, দুর্গাপদ বসু, তারাপদ বসু, ফণী লাহিড়ী, আশু লাহিড়ী, সুদীপ্ত ভট্টাচার্য্য, বিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত, নির্ম্মলকুমার বসু, ছোট বড় সমবয়সী বন্ধুদের আন্তরিক সাহায্য ও উৎসাহদান ভিন্ন যে এই পুস্তক প্রকাশ করা সম্ভব হ'ত না এই অকপট স্বীকৃতি জানিয়ে তাঁদের কাছে চিরকৃতজ্ঞতার ঋণ আমার অপরিশোধই রাখলাম।

ইতি—গ্রন্থকার।

গদাধর

এক

ফাল্গুন মাস। দিকে দিকে বসন্তের সমারোহ চ'লেছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দ্বিপ্রহর রৌদ্রের তেজটাও বেশ প্রখর হ'য়ে উঠেছে।

সেই রৌদ্রের ভিতর গ্রামের মেঠো-পথ ধ'রে চলে ক্ষুদিরাম। বয়স যদিও যৌবন অতিক্রম ক'রে গেছে, কিন্তু যৌবনের তেজ ও দীপ্তি তখনো যায়নি। দীর্ঘ বলিষ্ঠ গৌরবর্ণ ঋজু দেহ, উন্নত ললাট, আয়ত নয়ন। কপালে একটি রক্ত চন্দনের টিপ, গায়ে বেনিয়ান, কাঁধে একখানি সূতির চাদর, পরণে তাঁতের মোটা ছোট বহরের ধূতি আর পায়ে এক জোড়া সাধারণ চটি। মাঠে কোন ফসল নেই, তাই ধান্য ক্ষেত তখন তেপান্তরের মাঠে রূপান্তরিত হ'য়ে গেছে। তার উপরে রৌদ্র প'ড়ে যেন খাঁ খাঁ করছে। গাছপালাও বিশেষ চোখে পড়ে না, শুধু দূরে দূরে নব ফুল-পল্লবে দু'একটা বাবলা গাছ এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে। আর আছে স্থানে স্থানে বনকুলের ঝোপ।

গন্তব্য পথটিকে সংক্ষিপ্ত করার জন্যেই ক্ষুদিরাম এই জনবিরল মাঠের পথ ধ'রেছে। মাথায় যদিও ছাতা আছে তবু রৌদ্রের ঝাঁজে ও ক্লান্তিতে মুখখানি লাল হ'য়ে উঠেছে। তার সঙ্গে চিন্তার কয়েকটি রেখা প'ড়ে মুখটিকে কাতর ক'রেছে, আর মনটিকে ক'রেছে উত্তলা।

দূরাগত একটা কোকিলের ডাকে ক্ষুদিরামের ভাবনাটি ফেলে-আসা দিনে ফিরে যায়। অনেক ঘাত-প্রতিঘাতই এই জীবনের উপর দিয়ে গেছে। আজ অনেক দুঃখে ও যত্নে একটু শান্তির ছোঁয়া পেয়েছে। অভাব আছে কিন্তু পীড়াদায়ক নয়, গৃহদেবতা রঘুবীরের দয়ায় মোটা ভাত ও কাপড়ের সংস্থান হ'য়েছে। তবে তার ঊর্দ্ধে আর কিছু হয় না, আর সে চায়ও না। ভগবানের এই দয়ার জন্যে সে অপরিসীম কৃতজ্ঞ।

সেদিনের কথা মনে হ'লে আজও মনটা ভয়ে শঙ্কিত হ'য়ে ওঠে। উঃ কি দিনই না গেছে,—মিথ্যা সাক্ষী দিতে না পারায় জমিদারের কোপানলে প'ড়ে যেদিন রঘুবীরকে বুকে ক'রে স্ত্রী পুত্রের হাত ধ'রে পৈতৃক বাস্তু দেরেপুর গ্রাম ছেড়ে নিঃস্ব হ'য়ে এই কামারপুকুরে এসেছিলো, সেদিন রঘুবীর ছাড়া ভরসা এবং নির্ভর করার আর কেউ ছিলো না। সেই রঘুবীরই সুখলালের মতন বন্ধু মিলিয়ে দিলেন।

সুখলাল তার বসত-বাড়ীর এক অংশ বাসের জন্যে একখানা চালাঘর ছেড়ে দিল। আর দিল গ্রাসাচ্ছাদন চালাবার জন্যে এক বিঘা দশ ছটাক ধান্য জমি। ভগবানের কৃপায় তা'তেই তার দিনগুলি সুখে দুঃখে একরকম কেটে যায়।

আজ তার মনে হয় পৈতৃক বিষয় গিয়ে ভালই হ'য়েছে, থাকলে হয়তো রঘুবীরকে এমন নিবিড় ভাবে পেত না, পেত না এই অনাবিল আনন্দ আর আত্মবিশ্বাস। জীবনে চলার পথ কখনো কুসুমাস্তীর্ণ হয় না, পদে পদে আসে বাধা, সেও নিষ্কৃতি পায় না। অনেক বাধা-বিপত্তি আসে, তবে মনটা আগেকার মতন আর বিহ্বল হ'য়ে পড়ে না, রঘুবীরকে সব অর্পণ ক'রে নিশ্চিন্ত হয়।

একটা বনকুলের ঝোপ অতিক্রম ক'রতেই একটি চাষী ব'লে ওঠে, বাবাঠাকুর যে! বলি এই দুপুর রোদে কোথায় চ'লেছেন? ব'লেই কাছে এসে পায়ে হাত দিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে।

ক্ষুদিরাম প্রশান্ত হাসির সঙ্গে হাত তুলে আশীর্ব্বাদ ক'রে বলে, কল্যাণ হোক। তারপর তার কথার উত্তর দিয়ে বলে, যাচ্ছি আনুরে।

গ্রাম্য চাষী পরাণ মাটি থেকে উঠে দাঁড়ায়। কথার ভিতর একটু দরদ দিয়ে জিজ্ঞাসা করে, আনুর—জামাইবাড়ী? তারপর সহানুভূতি দেখিয়ে বলে, তা' এই রোদের ভিতর না বেরিয়ে বেলা পড়লে বেরুলেই পারতেন।

ক্ষুদিরাম তেমনি প্রশান্ত কণ্ঠে বলে, জানোতো বাড়ীতে ঠাকুর আছেন। সন্ধ্যার সময় আমাকেই আবার ফিরে শেতল দিতে হবে। এখন না বেরুলে সন্ধ্যার আগে কি ফিরতে পারবো?

পরাণ সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে আবার জিজ্ঞাসা করে, তা' জামাইবাড়ী কেন?

পরাণের প্রশ্নে ক্ষুদিরামের মুখের প্রশান্তিটা মিলিয়ে যায়। ব্যথিত কণ্ঠে বলে, মেয়েটার অসুখের সংবাদ শুনে মনটা বড় ব্যাকুল হয়েছে···

পরাণ ক্ষুদিরামকে কথাটা শেষ করার অবকাশ না দিয়ে চোখ দু'টিকে বিস্ফারিত ক'রে আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে, অসুখ? তা কি অসুখ বাবাঠাকুর? ব'লে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

পরাণের আন্তরিকতায় ক্ষুদিরাম মনে মনে বড় তৃপ্তি পায়। এই সব গ্রামবাসীদের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও আন্তরিকতা চলার পথে তাকে সাহস দেয়, প্রেরণা দেয়, ভগবদ্‌প্রেমে অনুপ্রাণিত ক'রে তোলে, ঈশ্বরে নির্ভরতা গভীর হয়ে ওঠে।

মনটা যেন দূর দূরান্তরে অপার্থিব জগতের দিকে ছুটে যায়, তাই

পরাণের জিজ্ঞাসা তার কাছে আতিশয্য ব'লে মনে হয় না। ক্ষুদিরাম আত্মীয়তার সুরে বলে, অসুখ যে কি তা ঠিক জানি না, কারণ সংবাদটা পাঁচ কাণ হ'য়ে এসেছে, তবে তোমার মাঠাকরুণ শুনেছে, মাথার ব্যামো।

সঙ্গে সঙ্গে পরাণ ব'লে ওঠে, আহা! তারপর ব্যস্ত হয়ে আবার বলে, তা' হ'লে যান বাবাঠাকুর, আর দেরী ক'রবেন না। ঠাকুর করুন যেন ভালো হ'য়ে যায়।

ক্ষুদিরাম যাবার জন্যে প্রস্তুত হ'য়ে বলে, তাই বল পরাণ, আমি তো কারো কোন অনিষ্ট করিনি।

পরাণ সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে, আপনি দেবতা! আপনার মত মানুষ হয় না।

পরাণের কথায় ক্ষুদিরাম কুণ্ঠিত হ'য়ে পড়ে। সলজ্জ কণ্ঠে বলে, না না, আমি তোমাদেরই একজন। ব'লে চ'লতে সুরু করে।

পরাণ বলে, একটু দাঁড়ান বাবাঠাকুর, আর একবার পায়ের ধূলো নিই। ব'লেই এগিয়ে এসে ক্ষুদিরামের পায়ের উপর সটান শুয়ে পড়ে।

ক্ষুদিরাম ব্যস্ত হ'য়ে হাত তুলে বলে, থাক থাক—হ'য়েছে হ'য়েছে। তারপর আত্মস্থ হ'য়ে পরাণের মাথায় হাত দিয়ে বলে, কল্যাণ হোক, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।

ক্ষুদিরামের আশীর্ব্বাদে পরাণের মন একটা অনির্ব্বচনীয় আনন্দে ভ'রে ওঠে। সে মাটি ছেড়ে উঠে মাথা নত ক'রে দাঁড়ায়।

ক্ষুদিরাম তার ভাববিহ্বল মুখের দিকে চেয়ে সহজ সুরে বলে, তা হ'লে আসি। ব'লেই চ'লতে সুরু করে।

পরাণ ভাববিহ্বল কণ্ঠে বলে, আসুন বাবাঠাকুর, ব'লে সেও বাড়ীর পথ ধরে।

দুই

ক্ষুদিরাম যখন আন্দুরে জামাইবাড়ীর দরজায় এসে দাঁড়ায় মধ্যাহ্ন তখন যায় যায়।

জামাইয়ের বাড়ীও মাটির চালা, দু'ধারে দাওয়া। সম্মুখে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ এবং চারিধার মাটির প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। সদরের সম্মুখেও অনেকখানি খালি জায়গা। কোন ফসল বা গাছপালা কিছু নাই। শুধু একটা প্রকাণ্ড বড় নিমগাছ সদর দরজার অনতিদূরে কিঞ্চিৎ আলো বাতাস আড়াল ক'রে দাঁড়িয়ে আছে।

ক্ষুদিরাম দরজার কাছে দাঁড়িয়ে একটি আরামের নিঃশ্বাস ছাড়ে। একে গায়ের রং ফর্সা, তাতে রোদের ঝাঁজে এবং ক্লান্তিতে মুখখানা আগুনে-পোড়া কাঞ্চনের মতন টক্‌টকে লাল হ'য়ে উঠেছে। তৃষ্ণায় বুকের ছাতি শুকিয়ে গেছে।

আর ইতস্ততঃ না ক'রে দরজাটা ঠেলে। দরজা ভেজানো ছিল--হাত দিতেই খুলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদিরামও প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ায়। ঘরের দিকে চেয়ে দেখে দাওয়ার উপর মাদুর বিছিয়ে কাত্যায়নী আধশোয়া অবস্থায় ব'সে আছে। আর তাকে ঘিরে পাড়ার ও বাড়ীর কয়েকটি মহিলা কি যেন আলোচনা ক'রছে।

অপ্রত্যাশিত ভাবে ক্ষুদিরামকে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ ক'রতে দেখে কাত্যায়নীর ননদ বিস্মিত কণ্ঠে ব'লে ওঠে, ওমা! তাঐমশায় যে! তারপর কাত্যায়নীকে লক্ষ্য ক'রে বলে, বৌদি। তোমার বাবা এসেছেন।

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে কাত্যায়নী লজ্জাসরম ভুলে গিয়ে লাফিয়ে ওঠে। বসন সংযত ক'রতেও ভুলে যায়। বুকের আঁচল খ'সে পড়ে। খোঁপা-করা চুলগুলি এলিয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে গিয়ে মূর্ত্তিটাকে আরো

রুক্ষ এবং বীভৎস ক'রে তোলে। ক্ষুদিরামের উপর জ্বলন্ত দৃষ্টি ফেলে চীৎকার ক'রে বলে, কি ক'রতে এসেছিস ? দূর হ'য়ে যা, দূর হ'য়ে যা! আদর দেখাতে এসেছেন। ওরে আমার বাবা রে!

কাত্যায়নীর কথা শুনে শাশুড়ী তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে। ননদের মুখখানা বিস্ময়ে ও লজ্জায় রাঙা হ'য়ে ওঠে।

সে কাত্যায়নীর মুখের উপর হাত চাপা দিয়ে বিস্মিত কণ্ঠে বলে, কাকে কি ব'লছ বৌদি! ছিঃ ছিঃ, তোমার মাথা খারাপ হ'লো!

ক্ষুদিরাম এক পাও আর এগুতে পারে না। লজ্জায়, ঘৃণায়, বিস্ময়ে, অপমানে মাথা নত ক'রে স্থাণুর মত সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে। সারা মুখখানা একেবারে আগুনের মত লাল হ'য়ে ওঠে। কাণ দুটো ভোঁ ভোঁ ক'রতে থাকে, পিপাসার কথা ভুলে যায়। মনে মনে মা বসুমতীকে ডেকে বলে, 'ধরিত্রী দ্বিধা হও'।

ক্ষুদিরামের সেই রক্তাক্ত মুখের দিকে চেয়ে কাত্যায়নীর কিন্তু মমতা জাগে না, সে ঝট্‌কা মেরে ননদের হাতখানা সরিয়ে দিয়ে একই ভাবে বলে, লজ্জা করে না! বেহায়া কোথাকার! শুধু হাতে মেয়েকে দেখতে এসেছিস ?

ননদ এবার সবলে কাত্যায়নীর মুখখানা চেপে ধরে। শাশুড়ী ধমক দিয়ে বলে, কি হচ্ছে বৌমা! চুপ কর।

কাত্যায়নীর কণ্ঠস্বরটা ক্ষুদিরামের কাছে কেমন যেন একটু অস্বাভাবিক ব'লে মনে হয়। একটা সংশয় ও সন্দেহ মনের মধ্যে উঁকি মারে। সেটা নিরসন করার জন্যে সমস্ত গ্লানি ঝেড়ে ফেলে মাথা তুলে কাত্যায়নীর দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চায়।

চোখে চোখে মিলতেই কাত্যায়নী কেমন যেন ভীত ও বিহ্বল হ'য়ে পড়ে। দৃষ্টিটা আপনা আপনিই নত হ'য়ে যায়। মুখখানিতে ফুটে ওঠে একটা আতঙ্ক। আর দাঁড়িয়ে থাকতেও পারে না। থপ ক'রে ব'সে পড়ে, অসহায়ের মত এদিকে সেদিকে চায়।

ক্ষুদিরাম সেই জ্বালাময়ী দৃষ্টি নিয়েই ধীরে ধীরে কাত্যায়নীর কাছে এগিয়ে আসে। কাত্যায়নী ক্রমেই ভয়ে একেবারে কুঁকড়ে যায়, কোথায় যে লুকোবে ভেবে পায় না। সন্ত্রস্ত হ'য়ে পার্শ্ববর্তিনীর কোলের ভিতর মুখখানাকে ঘুরিয়ে দিয়ে কাতর কণ্ঠে বলে, তোমার পায়ে প'ড়ছি—তুমি যাও। আমার কাছে এসো না, এসো না।

ক্ষুদিরামের জ্বলন্ত দৃষ্টি এবং কাত্যায়নীর ভয়-বিহ্বলতা দেখে পার্শ্ববর্তিনীরা বিস্মিত হ'য়ে যায়। অজানা শঙ্কায় সকলেই কেমন যেন শঙ্কিতা হ'য়ে পড়ে।

ক্ষুদিরাম দাওয়ায় উঠে আসে। মহিলারা শ্রদ্ধা ও ভয়ে স'রে দাঁড়ায়। কাত্যায়নীর শাশুড়ী কুণ্ঠিতা হ'য়ে ভয়-বিহ্বল কণ্ঠে বলে, থাক থাক, বেয়াইমশায়! আপনি আর কিছু ব'লবেন না। ওর মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে। না হ'লে আপনাকে এইভাবে ব'লতে পারে! তারপর আক্ষেপের সঙ্গে বলে, ভালমানুষ বৌ, হঠাৎ কেন যে এমন হলো!

সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদিরাম বেয়ান ঠাকুরাণীর মুখ থেকে কথাটি কেড়ে নিয়ে প্রশান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে বলে, কি যে হ'য়েছে তা আমি বুঝতে পেরেছি। ব'লেই দৃষ্টিটা আবার তীব্র ক'রে কাত্যায়নীর উপর ফেলে বজ্রগম্ভীর স্বরে বলে, উঠে বসো।

কাত্যায়নী পার্শ্ববর্তিনীর কোল থেকে মুখটা তুলে নিয়ে ভয়ে ভয়ে উঠে বসে, কিন্তু ক্ষুদিরামের দিকে চাইতে পারে না। দৃষ্টি নত ক'রে ভয়ে কাঁপতে থাকে।

ক্ষুদিরাম সেই রকম জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চেয়ে একই ভাবে জিজ্ঞাসা করে, তুমি কে? কেন আমার মেয়েকে কষ্ট দিচ্ছ?

কাত্যায়নী সেই দৃষ্টির সম্মুখে এবং কণ্ঠস্বর শুনে কেমন যেন সম্মোহিতা হ'য়ে যায়, চোখের পাতা দুটো বুজে আসে। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বিকৃত কণ্ঠে বলে, আমি এক প্রেত।

কাত্যায়নীর বিকৃত স্বর এবং উত্তর শুনে সকলেই ভয়ে সন্ত্রস্ত হ'য়ে

পড়ে। প্রত্যেকের চোখে মুখে ফুটে ওঠে একটা আতঙ্ক। বিহ্বল দৃষ্টিতে এ ওর মুখের দিকে চাইতে থাকে।

ক্ষুদিরাম একই ভাবে আবার জিজ্ঞাসা করে, কেন আমার মেয়েকে কষ্ট দিচ্ছ ?

কাত্যায়নীর কণ্ঠ দিয়ে বিকৃত স্বরে উত্তর আসে—আমার গায়ে উঠোন ঝাঁট দেওয়া ঝাঁটার বাড়ি মেরেছিলো।

ক্ষুদিরাম বিস্মিত কণ্ঠে বলে, ঝাঁটার বাড়ি মেরেছিলো ?

কাত্যায়নীর কণ্ঠ দিয়ে আবার উত্তর আসে—হ্যাঁ! খিড়কির পুকুর-পাড়ে একটা আস্‌শ্যাওড়া গাছে আমি থাকি, আপনার মেয়ে উঠোন ঝাঁট দিয়ে সেই ঝাঁটা পুকুরে ধুয়ে জল ঝরাবার জন্যে আমার গাছে বাড়ি মেরেছিলো।

সকলেই বিস্ময়ে হতবাক হ'য়ে যায়। প্রত্যেকেই মনে মনে রামনাম জপ ক'রতে থাকে। কাত্যায়নীর শাশুড়ী ভীতকণ্ঠে বলে, বাবা! এত কাণ্ড হ'য়েছে তা' তো আমরা জানি নে!

ক্ষুদিরাম সে কথার কোন জবাব না দিয়ে কাত্যায়নীর দিকে একই ভাবে চেয়ে বলে, থাক, না জেনে ক'রেছে তার জন্যে তুমি ওকে ক্ষমা ক'রে ছেড়ে চলে যাও।

কাত্যায়নীর কণ্ঠ দিয়ে মিনতি মাখা স্বরে উত্তর আসে—যেতে পারি, যদি আপনি গয়ায় পিণ্ডি দিয়ে আমায় মুক্তি দেন।

ক্ষুদিরাম সহসা কোন জবাব দিতে পারে না। মনে মনে ভাবে—একে সম্বলহীন তার উপরে পথও দীর্ঘ। যানবাহনে যেতে গেলে যে অর্থের প্রয়োজন তা' তার পক্ষে সংগ্রহ করা অসম্ভব। যেতে হ'লে পদব্রজেই যেতে হবে, তাছাড়া বাড়ীতে রঘুবীর আছেন, তাঁর নিত্যপূজার ব্যবস্থাও ক'রতে হবে।

ক্ষুদিরামকে নীরব দেখে কাত্যায়নীর কণ্ঠ দিয়ে আবার মিনতিমাখা স্বরে অনুরোধ আসে—আপনার পায়ে পড়ি, আমাকে উদ্ধার করুন।

কি জ্বালা যে পাচ্ছি। ব'লতে ব'লতে কাত্যায়নীর চোখ দু'টো জলে ভ'রে আসে। দু'চার ফোঁটা জল গাল বেয়ে ঝ'রেও পড়ে।

ক্ষুদিরামের ভাবনার মোড় ঘুরে যায়। সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়—তারও তো বাপ-পিতামহের পিণ্ডদান হয়নি, তাঁদের আত্মাও হয়তো এরই মতন কষ্ট পাচ্ছে, তাঁরাও হয়তো অশরীরী দেহে তৃষ্ণাকাতর হ'য়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। অতএব গয়ায় গেলে তাঁদেরও আত্মার গতি হয়। তাই আর দ্বিরুক্তি না ক'রে প্রশান্ত কণ্ঠে বলে, আচ্ছা যাবো। তোমার এবং তোমার পিতার নাম ও গোত্র বলো। কিন্তু তুমি যে মেয়েকে ছেড়ে যাবে তার প্রমাণ কি ?

কাত্যায়নীর কণ্ঠ দিয়ে করুণ স্বরে উত্তর আসে—প্রমাণ ? আমি সদরের ঐ নিমগাছটার একটা ডাল ভেঙ্গে দিয়ে যাব। ব'লেই একটু থেমে আবার বলে, তা হ'লে শুনুন—আমার নাম নরহরি মণ্ডল। বাবার নাম ঈশ্বর বিষহরি মণ্ডল।—আবার একটু চুপ ক'রে থেকে বলে, আচ্ছা এবার আমি গেলাম। আপনি নিশ্চয় আপনার প্রতিজ্ঞা রাখবেন। বলার সঙ্গে সঙ্গে শোঁ শোঁ ক'রে একটা শব্দ 'ওঠে, আর বাইরে নিমগাছের একটা প্রকাণ্ড ডাল মড়্ মড়্ শব্দে ভেঙ্গে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে কাত্যায়নী জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ে।

তিন

সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে। ক্ষুদিরাম তখনও ফেরেনি। চন্দ্রমণির উৎকণ্ঠা বেড়ে যায়। নানা আশঙ্কা মনের মধ্যে ঘনিয়ে আসে। রঘুবীরের সন্ধ্যারতির আয়োজন ক'রতে ক'রতে বার বার শুধু কাত্যায়নীর কথাই মনে হয়। রঘুবীরের পাদপদ্মে মনটাকে নিবিষ্ট রাখতে পারে না। ঘন ঘন ব্যাকুল দৃষ্টিতে সদরের দিকে চায়। জ্যেষ্ঠপুত্র রামকুমারও বাড়ী নেই যে, তাকে এগিয়ে খোঁজ নিতে ব'লবে। আর কনিষ্ঠ রামেশ্বর বালক, তাকে এগিয়ে দেখতে ব'ললে সে হয়তো যাবে, কিন্তু তাকে পাঠিয়ে আর এক দুশ্চিন্তা।

এই সব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতেই ক্ষুদিরাম বাড়ী এসে ঢোকে। তার সাড়া পেতেই চন্দ্রমণি ঠাকুরঘর ছেড়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসে। গভীর উৎকণ্ঠা নি'য়ে ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, হ্যাঁগা, কাত্যায়নীকে কেমন দেখলে? ভাল আছে তো?

ক্ষুদিরাম ক্লান্তপদে দাওয়ায় উঠে এসে খালি মেঝের উপরেই ক্লান্তিতে ব'সে পড়ে। তারপর একটি আরামের নিঃশ্বাস ফেলে বলে, হ্যাঁ, উপস্থিত ভালো আছে।

শ্বশুরের সাড়া পেয়ে রামকুমারের স্ত্রীও কৌতূহল নিয়ে রান্নাঘর ছেড়ে শাশুড়ীর পাশে এসে দাঁড়ায়।

মেয়ের কুশল সংবাদ শুনে চন্দ্রমণির উৎকণ্ঠা দূর হয় বটে, কিন্তু কৌতূহল কমে না। তাই আবার জিজ্ঞাসা করে—কি অসুখ ক'রেছিল?

ক্ষুদিরাম ক্লান্ত স্বরে বলে, সব বলছি। আগে এক ক'ল্‌কে তামাক সেজে দাও দিকি। একটু ঠাণ্ডা হই।

চন্দ্রমণি আর কিছু না ব'লে অদূরে গিয়ে তামাক সাজতে বসে। ক্ষুদিরাম সেই দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করে, রামকুমার কোথায় ?

চন্দ্রমণি ক'ল্‌কের ভিতর তামাক দিতে দিতে বলে, লাহাদের বাড়ী গেছে শিবপূজার ফর্দ্দ দিতে।

ক্ষুদিরাম আবার জিজ্ঞাসা করে, আর রামেশ্বর ?

চন্দ্রমণি হুঁকার উপর ক'ল্‌কেটা দিয়ে ও অন্য হাতে চক্‌মকিটা নিয়ে ক্ষুদিরামের কাছে এগিয়ে আসতে আসতে বলে, সে ঘুমিয়ে পড়েছে। ব'লে হুঁকা, ক'ল্‌কে ও চক্‌মকিটা ক্ষুদিরামের দিকে বাড়িয়ে ধরে।

ক্ষুদিরাম চন্দ্রমণির হাত থেকে হুঁকা, ক'ল্‌কে ও চক্‌মকিটা নেয়। তারপর চক্‌মকি ঠুকে কয়লা ধরিয়ে নিয়ে ক'ল্‌কেতে ফুঁ দিতে দিতে একটি আরামের নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে, কাতুকে ভূতে ধরেছিলো।

কথাটা শুনে চন্দ্রমণির চোখ দুটো বিস্ময়ে ডাগর হ'য়ে ওঠে। বিস্মিত কণ্ঠে বলে, এ্যাঁ! বল কি ?

ক্ষুদিরাম ততক্ষণে ক'ল্‌কেটা ধরিয়ে নিয়ে হুঁকায় লাগিয়ে একটি দীর্ঘ টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলে, হ্যাঁ, মেয়ে উঠোন ঝাঁট দিয়ে সেই ঝাঁটা খিড়কির পুকুরে ধুয়ে যে গাছে প্রেতটা থাকে সেই গাছে বাড়ি দিয়েছিল। ব'লে আবার হুঁকায় মুখ লাগায়।

চন্দ্রমণির কৌতূহল বেড়ে ওঠে। ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, ওর শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা কিছু বুঝতে পারে নি ?

ক্ষুদিরাম আবার হুঁকা থেকে মুখটা তুলে নিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলে, না।

চন্দ্রমণি তেমনি আগ্রহভ'রে জিজ্ঞাসা করে, তুমি কি ক'রে ধ'রলে ?

ক্ষুদিরাম হুঁকা টানতে টানতে বলে, আমি বাড়ী ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে দেখে মেয়ে ব'লে উঠলো—কেন এসেছিস্ ? দূর হয়ে যা...ইত্যাদি।

চন্দ্রমণির চোখ দুটো আবার ডাগর হয়ে ওঠে। বিস্মিত কণ্ঠে বলে, এ্যাঁ—বল কি !

ক্ষুদিরাম এবার হুঁকায় একটি দীর্ঘ সুখটান দিয়ে হুঁকাটা দেওয়ালের গায়ে ঠেসিয়ে রেখে চন্দ্রমণির উপর দৃষ্টি তুলে বলে, পাঁচজনের সম্মুখে আমাকে ঐ ভাবে ব'লতে আমার তখন মনে হচ্ছিল মাটির মধ্যে প্রবেশ করি। যাক্‌গে, সে অনেক কথা। বিকৃত কণ্ঠস্বর শুনে আমার সন্দেহ হয়। রঘুবীরের নাম স্মরণ ক'রে সামনে দাঁড়াতেই ভয়ে কুঁকড়ে গেল। তবে হ্যাঁ, আমাকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়ে তবে ভূতটা ছেড়ে গেছে।

চন্দ্রমণি সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে, কি প্রতিজ্ঞা ?

ক্ষুদিরাম একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বলে, তার আত্মার মুক্তির জন্যে গয়ায় গিয়ে পিণ্ডি দিতে হবে এবং আমি রাজিও হয়েছি। তবে সে কাতুকে ছেড়ে গেছে।

চন্দ্রমণি চিন্তিতা হ'য়ে পড়ে। হতাশ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, তুমি কি এই বয়সে হেঁটে গয়ায় যেতে পারবে ?

ক্ষুদিরাম একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বলে, কষ্ট একটু হয়তো হবে। কিন্তু কি করবো......যেতে হবে। তা ছাড়া এই উপলক্ষ্যে আমারও বাপ-পিতামহের পিণ্ডি দেওয়া হবে।

চন্দ্রমণির ভাবনা দূর হয় না। তাই বিমর্ষ কণ্ঠে বলে, কিন্তু ফিরতে তো দেরী হবে ?

ক্ষুদিরাম গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। উঁকি মেরে একবার আকাশের দিকে চেয়ে রাত্রি কত অনুমান ক'রে নেয়। তারপর চন্দ্রমণির উপর দৃষ্টি ফেলে আশ্বাস দিয়ে বলে, তা কিছু দেরী হবে বৈকি !

চন্দ্রমণি সঙ্গে সঙ্গে বলে, আমি এই কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে একা একা...

চন্দ্রমণিকে কথাটা আর শেষ ক'রতে না দিয়ে ক্ষুদিরাম বলে, রামকুমার সব দেখাশুনা ক'রবে। তাছাড়া পাড়া-প্রতিবেশীরা আছে। ধর্ম্মদাসকে ব'লে যাব।

চন্দ্রমণি একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বলে, যাক্‌, যা হবার হবে।

তুমি আর দেরী ক'র না। সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে, ঠাকুরের শীতল দেওয়া হয়নি।

ক্ষুদিরাম ব্যস্ত হ'য়ে বলে, হ্যাঁ, এই যে…কথাটা আর শেষ না ক'রে জামা কাপড় ছেড়ে গামছা নিয়ে হাতমুখ ধুতে পুকুরের দিকে এগিয়ে যায়। আর চন্দ্রমণি বিমর্ষ মনে আবার ঠাকুরের ঘরে ঢোকে।

●

চার

সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই ক্ষুদিরাম ধর্ম্মদাসের বাড়ীর দরজায় এসে হাজির হয়। একটু ইতস্ততঃ ক'রে ডাকে, ধর্ম্মদাস! ধর্ম্মদাস! কে? ব'লে সাড়া দিয়ে ধর্ম্মদাস মুখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে আসে। ক্ষুদিরামকে দেখে বিস্মিত ও ব্যস্ত হ'য়ে পায়ের ধূলো নিয়ে বলে, আরে দাদা যে! এস এস, কি খবর? মেয়ে ভালো আছে তো? ব'লে ক্ষুদিরামকে নিয়ে বাইরের ঘরে এসে বসে।

ক্ষুদিরাম বলে, হ্যাঁ, উপস্থিত ভালোই আছে।

ধর্ম্মদাস ক্ষুদিরামের কথার কোন জবাব না দিয়ে বাড়ীর চাকরকে ডাকে—ভূতো! ভূতো! তারপর ক্ষুদিরামের দিকে চেয়ে বলে,

ভাল, ভাল। তা এই ভোরবেলায় পূজোপাট না সেরেই গরীবের বাড়ীতে পায়ের ধুলো দিলে কেন বল দেখি ?

এমন সময় বাড়ীর বৃদ্ধ চাকর ভূতো ঘরে ঢুকে ধর্ম্মদাসের দিকে চেয়ে বলে, আমায় ডাকছো কেনে গো ?

ভূতো কাণে কম শোনে। তাই ধর্ম্মদাস তার দিকে চেয়ে ঈষৎ চীৎকার ক'রে বলে, কড়ি বাঁধা হুঁকোটায় জল ফিরিয়ে এক ক'ল্‌কে তামাক সেজে এনে দে।

ভূতো কাণের কাছে হাত রেখে মুখটা ধর্ম্মদাসের দিকে এগিয়ে এনে গভীর মনোযোগ সহকারে শোনে। তারপর বলে, কড়িকাঠে আলকাতরা মাখাবো ? তা, আমি পারবো কেনে গো। বুড়োমানুষ— যদি ভারা থেকে প'ড়ে যাই।

ভূতোর কথা শুনে ক্ষুদিরাম হো হো ক'রে হেসে ওঠে। আর ধর্ম্মদাস বিরক্তিভ'রে ক্ষুদিরামকে বলে, শুনলে এর কথা ? সকাল থেকে এই যে আরম্ভ হ'ল—সারাদিন চীৎকার করিয়ে করিয়ে মারবে। একে নিয়ে কি যে করি—জবাব দিলেও যায় না।

ক্ষুদিরাম হাসি থামিয়ে সহানুভূতির সঙ্গে বলে, আহা, ভগবান ওকে মেরেছে—তা কি ক'রবে বল ? তা ছাড়া তোমার বাড়ীতে কাজ ক'রে বুড়ো হ'য়ে গেল। এই বুড়ো বয়সে আর কোথায় যাবে ? তারপর ভূতোর দিকে চেয়ে ঘরের কোণে অবস্থিত হুঁকাটার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ ক'রে হাবে-ভাবে বুঝিয়ে দেয়। আর ভূতো ঘাড় নাড়তে নাড়তে তামাক সেজে আনতে বেরিয়ে যায়।

ধর্ম্মদাস ক্ষুদিরামের দিকে চেয়ে গভীর আগ্রহভ'রে জিজ্ঞাসা করে, হ্যাঁ···কাত্যায়নী মা'র কি হয়েছিল ?

ক্ষুদিরাম বলে, ভূতে ধ'রেছিল।

বিস্ময়ে আর উৎকণ্ঠায় ধর্ম্মদাসের চোখ দুটো ডাগর হ'য়ে ওঠে। কৌতূহলের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে—তারপর—তারপর ?

ক্ষুদিরাম প্রশান্ত কণ্ঠে বলে, তারপর আর কি—রঘুবীরকে স্মরণ ক'রে সামনে দাঁড়াতেই কুঁকড়ে গেল। তবে ভাই, অঙ্গীকার করিয়ে নিয়ে ছেড়ে গেছে।

ধর্ম্মদাস তেমনি বিস্মিত কণ্ঠে বলে, অঙ্গীকার!

এমন সময় ভূতো হুঁকার উপর ক'ল্‌কে দিয়ে ফুঁ দিতে দিতে আবার ঘরে ঢুকে বিনীতভাবে ক্ষুদিরামের দিকে এগিয়ে দেয়।

ক্ষুদিরাম ভূতোর হাত থেকে হুঁকাটা নিয়ে একটা দীর্ঘ টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলে, হ্যাঁ, গয়ায় গিয়ে তার আত্মার মুক্তির জন্য পিণ্ডি দিতে হবে। ভূতো আবার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে।

ধর্ম্মদাস ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, তুমি রাজী হয়েছ?

ক্ষুদিরাম বলে, হ্যাঁ, না হয়ে আর কি করি। যে ভাবে অনুনয় বিনয় ক'রলে তাতে আর না ক'রতে পারলাম না। আর ভেবে দেখলাম —এই উপলক্ষ্যে আমারও বাপ-পিতামহের পিণ্ডি দেওয়া হবে। আর একটা তীর্থ দর্শনও হবে।

ধর্ম্মদাস বলে, তাতো হবে, কিন্তু পারবে কি? এই বয়সে অত পথ হাঁটা। তার উপরে পাথেয়ও আছে। পথঘাটও বিপদসঙ্কুল······

ক্ষুদিরামহুঁকায় শেষ টান দিয়ে ক'ল্‌কেটা তুলে ধর্ম্মদাসের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, নাও খাও। ব'লে হুঁকাটা দেওয়ালের কোণে ঠেসিয়ে রাখে।

ধর্ম্মদাস ক্ষুদিরামের হাত থেকে ক'ল্‌কেটা নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। ঘরের কোণ থেকে নিজের হুঁকাটা নিয়ে তার উপরে ক'ল্‌কেটা দিয়ে টানতে টানতে যথাস্থানে এসে বসে।

ক্ষুদিরাম একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বলে, সব জানি ভাই, তবু প্রতিজ্ঞা যখন করেছি······

ক্ষুদিরামকে কথাটা শেষ করার অবকাশ না দিয়ে হুঁকা থেকে মুখটা তুলে নিয়ে তাচ্ছল্যের সঙ্গে ধর্ম্মদাস বলে, নাও-নাও, ভূতের কাছে প্রতিজ্ঞা তার জন্য আবার এত······

ক্ষুদিরাম মর্ম্মাহত হ'য়ে বলে, ছিঃ ধর্ম্মদাস! ও কথা ব'ল না। তুমি তো জানো—এই সত্যরক্ষা করবার জন্য পৈতৃক বাস্তু দেরেগ্রাম ছেড়ে স্ত্রী পুত্রের হাত ধ'রে নিঃস্ব হ'য়ে এই কামারপুকুরে এসেছিলাম। আর আজ আমি মরণের তীরে দাঁড়িয়ে সেই সত্য ভঙ্গ ক'রবো। এ কথা তুমি ব'ল্‌লে কি ক'রে ?

লজ্জায় ধর্ম্মদাস ম্লান হ'য়ে যায়। কুণ্ঠিত হ'য়ে বলে, সত্যি অন্যায়ই হ'য়েছে—তবে দীর্ঘ পথ—এই বুড়ো বয়সে খুব কষ্ট হবে—এই ভেবেই আর কি……

ক্ষুদিরাম প্রশান্ত কণ্ঠে বলে, আমার রঘুবীর ভরসা।

ধর্ম্মদাস হুঁকায় একটা দীর্ঘ টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে জিজ্ঞাসা করে, তা কবে যাচ্ছ ?

ক্ষুদিরাম বলে, এই মাসেই যাবো মনস্থ করেছি। তা না হ'লে চৈত্র মাসের প্রথমে গিয়ে পৌঁছোতে পারবো না।

ধর্ম্মদাস হুঁকায় শেষবারের মত একটা টান দিয়ে দেওয়ালের গায়ে ঠেসিয়ে রাখতে রাখতে বলে, চৈত্র মাসের প্রথমেই যে যেতে হবে তার কি কথা আছে ?

ক্ষুদিরাম বলে, চৈত্রমাস হ'চ্ছে মধুমাস, এই মাসে পিণ্ড দিলে প্রেতাত্মারা পরম তুষ্ট হয়। আর যখন যেতে হবে আর দিতেই হবে তখন অযথা দেরী ক'রে লাভইবা কি ? সেজন্যেই তোমার কাছে আসা। অবশ্য রামকুমার উপযুক্ত হয়েছে—তা হ'লেও সংসারে সে অনভিজ্ঞ। আমার অবর্ত্তমানে তুমি একটু খোঁজ-খবর নিও।

ধর্ম্মদাস ব্যস্ত হ'য়ে বলে, এ কথা আবার তোমাকে ব'লতে হবে।

ক্ষুদিরাম খুসির সঙ্গে বলে, তা আমি জানি। একটু চুপ ক'রে থেকে ঈষৎ কুণ্ঠার সঙ্গে পুনরায় বলে, আর কিছু টাকা দরকার···অবশ্য রামকুমারকে ব'লে যাব। সে মাসে···

ধর্ম্মদাস ক্ষুদিরামের কথায় বাধা দিয়ে ক্ষুব্ধ স্বরে বলে, এর জন্যে

তোমাকে মোটে ভাবতে হবে না। তোমার কোন সাহায্যে নিজেকে লাগাতে পারলে ধন্য মনে করি। তারপর একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে ব্যথিত কণ্ঠে আবার বলে, কিন্তু তুমি তো আমার কাছ থেকে কোন আর্থিক সাহায্য নিতেই চাও না।

ক্ষুদিরাম সান্ত্বনা দিয়ে বলে, তার জন্য দুঃখ ক'র না। জীবনের প্রথম থেকেই যখন শূদ্রের দান গ্রহণ করিনি তখন আর এই বৃদ্ধ বয়সে ......যাক্‌গে তাহ'লে আমি এখন উঠি। ব'লে উঠে দাঁড়ায়।

ধর্ম্মদাস ব্যস্ত হ'য়ে বলে, কত টাকার দরকার ? আর এখনি নেবে তো ?

ক্ষুদিরাম বলে, ৫০৲ টাকা হ'লেই হবে আর এখন দরকার নেই। যাবার আগের দিন নিয়ে যাব। ব'লে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে।

পাঁচ

ক্ষুদিরামের গয়ায় যাবার দিন ক্রমেই এগিয়ে আসে। কারণ চৈত্র মাস হ'চ্ছে মধুমাস এবং পিতৃপুরুষদিগের পিণ্ডদানের উপযুক্ত সময়। তাই বিলম্ব ক'রতে ইচ্ছা হয় না। আর যেতে যখন হবে তখন অযথা দেরী ক'রেই বা লাভ কি ?

যাবার দিন একপ্রহর রাত থাকতে উঠে চন্দ্রমণিকে ডেকে বলে, ওগো শুনছো; আমার জিনিষপত্রগুলো সব গুছিয়ে দাও। আমি ঘোর থাকতে থাকতে বেরিয়ে যাব !

স্বামীর ডাকে চন্দ্রমণি ধড়মড় ক'রে শয্যা ছেড়ে উঠে বসে। চোখ

ড'লতে ড'লতে বিস্মিত কণ্ঠে বলে, ওমা! এখনও রাত রয়েছে যে গো!

ক্ষুদিরাম ঘরের প্রদীপটা জ্বালতে জ্বালতে বলে, ভোর হ'তে আর বেশী দেরী নেই। ধ্রুবতারা উঠে গেছে। আর সব সেরেসুরে বেরুতে বেরুতে ফরসা হ'য়ে যাবে। ব'লে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে দাওয়ায় এসে আল্‌না থেকে গামছাখানা টেনে নেয়।

চন্দ্রমণিও স্বামীর পিছু পিছু দাওয়ায় এসে দাঁড়ায়। উঁকি মেরে একবার আকাশের দিকে চেয়ে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে ব্যথিত কণ্ঠে বলে, হ্যাঁ, ধ্রুবতারা উঠে গেছে।

ক্ষুদিরাম দাওয়া থেকে উঠানে নামতে নামতে বলে, আমি প্রাতঃকৃত্য স্নান ইত্যাদি সেরে আসছি। তুমি ইতিমধ্যে জামা, কাপড়, গামছা, একটা সতরঞ্চি, বালিস ইত্যাদি সব গুছিয়ে রাখো। ব'লে হন্ হন্ ক'রে বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে যায়। চন্দ্রমণি আর একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে এক ঘটি জল নিয়ে উঠানে নেমে এসে মুখ ধুতে বসে।

এদের পদশব্দে ও কথাবার্ত্তায় রামকুমার ও তার পত্নী উভয়েই জেগে ওঠে এবং ব্যস্ত ও লজ্জিত হ'য়ে বাইরে বেরিয়ে আসে।

রামকুমার সলজ্জকণ্ঠে চন্দ্রমণিকে জিজ্ঞাসা করে, মা, বাবা কি চ'লে গেছেন?

চন্দ্রমণি মুখ ধোওয়া শেষ ক'রে ঘরের দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বলে, না বাবা, তিনি স্নান করতে গেছেন। ব'লে ঘরে ঢুকে স্বামীর জামা কাপড় গোছাতে থাকে।

রামকুমারের স্ত্রী আর না দাঁড়িয়ে গৃহকর্ম্মে মনোনিবেশ করে। আর রামকুমার চোখেমুখে জল দিতে খিড়কির পুকুরের দিকে এগিয়ে যায়।

একটু পরে ক্ষুদিরাম ও রামকুমার প্রায় একসঙ্গে ঘুরে আসে।

ক্ষুদিরাম ঘরে ঢুকে কাপড় ছাড়তে ছাড়তে জিজ্ঞাসা করে, জামা-কাপড়, বিছানা-বালিস সব গুছিয়ে দিয়েছ?

চন্দ্রমণি নীরবে শুধু ঘাড় নাড়ে।

ক্ষুদিরাম আর কিছু না ব'লে ঠাকুরঘরে এসে ঢোকে। গৃহদেবতা রঘুবীরের সম্মুখে আঁখি নিমীলিত ক'রে পদ্মাসন হ'য়ে বসে। তারপর ধ্যানস্থ হ'য়ে যায়। আঁখি বেয়ে ভাবাশ্রু নেমে আসে।

চন্দ্রমণি স্বামীর জিনিষপত্র সব গুছিয়ে রেখে ঠাকুরঘরের দরজায় এসে দাঁড়ায়। আকাশে ভোরের সূচনা দেখে একটু চঞ্চল হ'য়ে উঠে। কুণ্ঠার সঙ্গে বলে, ভোর হ'য়ে আসছে, আর দেরী ক'র না।

চন্দ্রমণির কথা শুনে ক্ষুদিরামের ধ্যান ভেঙ্গে যায়। আঁখি উন্মোচন ক'রে রঘুবীরের পাদপদ্মে প্রণাম ক'রতে ক'রতে অশ্রুসজল কণ্ঠে বলে, প্রভু, তোমার পাদপদ্মে সব রেখে গেলাম, তুমিই দেখো। ব'লে ঠাকুরঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে। আকাশের দিকে চেয়ে ব্যস্ত হ'য়ে বলে, ফর্‌সা হ'য়ে এলো দেখছি যে—যাও যাও, বেনিয়ানটা আর চাদরখানা নিয়ে এস। রোদ উঠে প'ড়লে আর বেশী দূর এগুতে পারবো না।

চন্দ্রমণি ঘরে ঢুকে জামা ও চাদর এনে দেয়।

ক্ষুদিরাম জামাটা গায়ে দিতে দিতে চন্দ্রমণিকে জিজ্ঞাসা করে, রামেশ্বর কি এখনও ঘুম থেকে ওঠে নি ?

চন্দ্রমণি সঙ্গে সঙ্গে বলে, না। ডেকে দেবো ?

ক্ষুদিরাম ব্যস্ত হ'য়ে বলে, না না, থাক—ছেলেমানুষ ঘুমাচ্ছে ঘুমাক।

ইতিমধ্যে রামকুমার ঘরের ভিতর থেকে বিছানা ও ক্যাম্বিসের ব্যাগটা হাতে নিয়ে ক্ষুদিরামকে এগিয়ে দেবার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে দাঁড়ায়।

ক্ষুদিরাম চন্দ্রমণির দিকে চেয়ে বলে, কই ছাতাটা দিলে না।

চন্দ্রমণি আবার ঘরে ঢুকে ছাতাটা এনে ক্ষুদিরামের হাতে দেয়।

ক্ষুদিরাম ছাতাটা নিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে বলে, তা হ'লে এবার আসি।

এমন সময় রামকুমারের স্ত্রী একটি পিতলের রেকাবীতে কয়েকখানা বাতাসা ও এক গ্লাস জল নিয়ে শাশুড়ীর পাশে এসে দাঁড়ায়।

স্বামীর কথা শুনে চন্দ্রমণি আর আত্মসম্বরণ ক'রতে পারে না। অবরুদ্ধ চোখের জল বাঁধভাঙ্গা নদীর মত হু হু ক'রে বেরিয়ে আসে।

আর শাশুড়ীর চোখে জল দেখে বৌয়ের চোখ দুটোও জলে ভ'রে আসে।

ক্ষুদিরাম রেকাবী থেকে একটা বাতাসা তুলে নিয়ে মুখে ফেলে জলের গেলাসটা হাতে নেয়। বাতাসাটা চিবুতে চিবুতে সান্ত্বনা দিয়ে বলে, ছিঃ, তুমি যদি এমন ক'রে কাঁদো তাহ'লে এরা কি ক'রে আত্মসম্বরণ করে বল দেখি ?

জলটা এক নিঃশ্বাসে পান ক'রে গেলাসটা বৌমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে আবার বলে, রামকুমার উপযুক্ত হ'য়েছে। ধর্ম্মদাসকেও ব'লে গেলাম। তাছাড়া যত তাড়াতাড়ি হয় ফিরে আস্‌ছি। অতএব ভাববার কি আছে গো।

রামকুমারের স্ত্রী শ্বশুরের হাত থেকে গেলাসটা নিয়ে মেঝেয় নামিয়ে রেখে প্রণাম করার জন্য গলায় আঁচল তুলে দেয়।

চন্দ্রমণি অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলে, পথ তো একটুখানি নয়, তার উপরে এই বয়েস। তাছাড়া যার তার হাতে যা' তা' খাবে না।

ক্ষুদিরাম ঠাকুরঘরের দিকে চেয়ে বলে, রঘুবীর সব ব্যবস্থা ক'রে দেবেন, তুমি ভেব না।

চন্দ্রমণি আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে বলে, যাই হোক্ চারটি চিড়ে, একটু গুড়, একটা পুঁটলি ক'রে বেঁধে দিয়েছি—যে ক'দিন থাকে সময়মত চারটি চারটি ক'রে খেও। ব'লে গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করে। সেই সঙ্গে রামকুমারের স্ত্রীও প্রণাম করে।

ক্ষুদিরাম চক্ষু নিমীলিত ক'রে মনে মনে আশীর্ব্বাদ করে। তারপর ব্যাগ ও বিছানা নেবার জন্য রামকুমারের দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলে, দাও।

সঙ্গে সঙ্গে রামকুমার বলে, চ'লুন, আপনাকে গাঁয়ের পথটা এগিয়ে দিয়ে আসি।

তবে চল। ব'লে ক্ষুদিরাম দাওয়া থেকে নেমে চ'লতে সুরু করে। রামকুমার ব্যাগ আর বিছানা নিয়ে পিতাকে অনুসরণ করে।

চন্দ্রমণি ও রামকুমারের স্ত্রী সদর দরজা পর্য্যন্ত ওদের পিছু পিছু আসে।

ক্ষুদিরাম কোনদিকে দৃষ্টিপাত না ক'রে সামনের পথ ধ'রে এগিয়ে যায়। রামকুমারও সঙ্গে সঙ্গে যায়।

চন্দ্রমণি ও পুত্রবধূ জলভরা চোখে সদর দরজার কপাট ধ'রে দাঁড়িয়ে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

যে মনোবল এবং দৃঢ়তা নিয়ে ক্ষুদিরাম পথে বেরিয়ে পড়ে, কিছুদূর যেতে না যেতেই ক্রমে তা' শিথিল হ'য়ে আসে। মনের মধ্যে নানা ভয় ও ভাবনা এসে জড়িয়ে ধরে।

ভোরের এই নবারুণ আলো, পাখীর কূজন, বসন্তের স্নিগ্ধ-শীতল বাতাস কিছুই আর চলার পথে প্রেরণা দিতে পারে না। সব কিছুই বিষাদ এবং তিক্ত ব'লে মনে হয়।

প্রেতের কাছে প্রতিজ্ঞা করার জন্য অনুশোচনা জাগে। ক্ষণিকের জন্য মনেও হয় যে, আর গিয়ে দরকার নেই—যা' হবার তাই হবে। স্বাস্থ্য রেখে তবে তো ধর্ম্ম। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই নিজেকে নিজে ধিক্কার দিয়ে ওঠে। ছিঃ ছিঃ, কি সে যা' তা ভাবছে। জীবন-নদীর তীরে দাঁড়িয়ে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের অপরাধ নিয়ে ম'রবে! ধর্ম্মই যদি রক্ষা করা না গেল তা' হ'লে এ জীবনের মূল্য কি? সাধারণ গৃহীতে আর তাতে পার্থক্য কোথায়? হোক পথ দীর্ঘ ও দুর্গম, জীবন যাক্ নিপাত হ'য়ে—তবু সত্য ভঙ্গ ক'রতে পারবে না। সত্যরক্ষা করার জন্যে যে একদিন সব কিছু ত্যাগ ক'রে অকূল সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে প'ড়েছিল, আজ সে সামান্য পথের কথা ভেবে কাতর হ'চ্ছে। ছিঃ ছিঃ, এ চিত্ত-দৌর্ব্বল্য তার সাজে না।

তা' ছাড়া ক্ষুদিরাম যেন স্পষ্ট অনুভব করে—সেই প্রেতটা ছায়া-মূর্ত্তিতে যেন অনুসরণ ক'রে আসছে। মুক্তির আনন্দে চোখ দুটো জ্বল জ্বল

ক'রছে। এ ছাড়া পিতৃপুরুষরাও আছে। তাদের প্রতিও তার কিছু কর্ত্তব্য আছে।

ভাবতে ভাবতে মনের বিষণ্ণ ভাবটা কেটে যায়, উৎসাহ ও উদ্দীপনা আবার ফিরে আসে।

রামকুমার পিতাকে বিষণ্ণ এবং চিন্তিত দেখে আর কিছু বলে না। নীরবে অনুসরণ ক'রে আসে।

গ্রামের শেষ সীমায় আসতেই রামকুমার একটু ইতস্ততঃ ক'রে কুণ্ঠার সঙ্গে ডাকে, বাবা!

পুত্রের আহ্বানে ক্ষুদিরামের সম্বিত ফিরে আসে। একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে নিয়ে রামকুমারের দিকে ফিরে হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে বলে, হ্যাঁ—এবার ব্যাগ আর বিছানাটা দিয়ে তুমি যাও। আর আসতে হবে না। অনেকটা পথ এসেছ।

রামকুমার ব্যাগ ও বিছানাটা বাবার হাতে দেয়। তারপর সেই পথের উপরেই চরণ স্পর্শ ক'রে ভক্তিভ'রে প্রণাম করে।

ক্ষুদিরামের মনটা আসন্ন বিচ্ছেদে আবার ভারাক্রান্ত হ'য়ে ওঠে। এতক্ষণ পর্য্যন্ত তার পরিবারের সকলের সঙ্গে সংযোগ ছিল, এইবার সেই যোগসূত্র ছিঁড়ে গেল। আবার কোনদিন মিলবে কিনা কে জানে! অনেক কষ্টে সে ভাবটাকে দমন ক'রে নিয়ে রামকুমারের মাথায় হাত রেখে প্রায় ধ্যানস্থ হ'য়ে নীরবে আশীর্ব্বাদ করে।

হাতখানা তুলে নিতেই রামকুমার উঠে দাঁড়ায়। অশ্রুসজল কণ্ঠে বলে, গয়ায় পৌঁছে একটা চিঠি দেবেন, আর সাধ্যমত সাবধানে থাকবেন।

রামকুমারের চোখের জল ক্ষুদিরামের চোখ দুটোকেও সজল ক'রে তোলে। অশ্রুভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলে, হ্যাঁ, দেব। আর তুমিও সাবধানে থাকবে। এখন সব ভার তোমার উপর। তুমি উপযুক্ত হ'য়েছ ব'লেই আমি তীর্থদর্শনে প্রয়াসী হ'য়েছি। সমগ্র পরিবারের শুভাশুভ, মান সম্মান এখন তোমার উপর। এইটে সব সময় মনে রেখে চ'লবে।
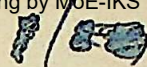
রামকুমারও অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলে, যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।

ক্ষুদিরাম একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে, আমি জানি তোমা হ'তে পরিবারের গৌরব বৃদ্ধি হবে বৈ ক্ষুণ্ণ হবে না। আর আমি যদি না ফিরতে পারি…

ক্ষুদিরামকে কথাটা শেষ ক'রতে না দিয়ে রামকুমার আর্ত্তস্বরে চীৎকার ক'রে ব'লে ওঠে, বাবা! আর সেই সঙ্গে অবরুদ্ধ চোখের জল ঝর্ ঝর্ ক'রে গাল বেয়ে ঝ'রে পড়ে।

ক্ষুদিরামের চোখের কোলেও জল এসে টলমল করে। চাদরের প্রান্তভাগ দিয়ে মুছে নেয়। পুত্রকে কাতর হ'তে দেখে প্রসঙ্গটা চাপা দিয়ে বলে, আচ্ছা থাক, এবার তাহ'লে আমি আসি। ব'লে আর একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে দ্রুতপদে এগিয়ে যায়।

আর রামকুমার জলভরা চোখে পিতাকে যতদূর দেখা যায় নির্ব্বাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে।

●

ছয়

ক্ষুদিরাম বাড়ী থেকে চ'লে যাবার পর প্রায় পণেরো দিন গত হ'য়ে গেছে। চন্দ্রমণি বিচ্ছেদ ব্যথা সামলেও নিয়েছে। তবু একটু অবসর পেলেই ভাবে তার স্বামীর কথা।

দিনটা যদিও কাজকর্ম্মের ভিতর দিয়ে যায়, রাত্রিটা আর যেতে চায় না। ভাবনাগুলো দুর্ভাবনা হ'য়ে মনটাকে এমন ভীতিবিহ্বল ক'রে তোলে যে মাথা গরম হ'য়ে যায়। সহসা ঘুম আসে না আর যদিও আসে নানা রকম দুঃস্বপ্ন ঘুমের গাঢ়তা নষ্ট ক'রে দেয়। ঘোর থাকতে উঠে

সর্ব্বাগ্রে ঠাকুরঘরে ঢুকে রঘুবীরের চরণতলে লুটিয়ে প'ড়ে অশ্রুসজল কণ্ঠে বলে, ঠাকুর, তুমি তাকে দেখো। তুমি ছাড়া দেখবার আর কেউ নেই। চোখের জলে ঘরের মেঝে ভিজে ওঠে। হৃদয়ও শান্ত হয়।

সেদিন মধ্যাহ্নের শেষে চন্দ্রমণি বৌমাকে সঙ্গে নিয়ে খেতে ব'সেছে, কিন্তু ভাতের গ্রাস মুখে তুলতে গিয়ে আর-তুলতে পারে না। মনে পড়ে তার স্বামীর কথা। ভাবে সে বোধহয় পথের ধারে কোন পান্থশালায় অভুক্ত হয়ে প'ড়ে আছে। ভাবতে ভাবতে চোখ দিয়ে হু হু ক'রে জল নেমে আসে। ভাতের গ্রাস চোখের জলে ভিজে ওঠে।

সহসা শাশুড়ীকে খেতে গিয়ে বিরত হ'য়ে চুপ ক'রে ভাবতে দেখে ও নীরবে কাঁদতে দেখে বধূ অবাক হ'য়ে যায়। সেও আর খেতে পারে না। হাত গুটিয়ে নিয়ে বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, ওমা! কি হ'ল ? কাঁদছ কেন ?

বধূর প্রশ্নে চন্দ্রমণি লজ্জা পায়। ভাবনাটাকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে। বাঁ হাত দিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে ধরা গলায় বলে, না কিছু হয় নি। তুমি খাও।

ঠিক সেই সময় একটা ভিখারী বাড়ীর ভিতর ঢুকে মিনতি ক'রে বলে, মা, চারটি ভাত দেবে গো ? সারাদিন কিছু খাইনি।

চন্দ্রমণির আর অন্ন গ্রহণ করার ইচ্ছা ছিল না। তাই ভিখারীর প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে, ব'স বাছা। ব'লেই নিজের ভাতের থালাটা নিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

বধূ ব্যস্ত হ'য়ে বলে, ওমা, একি করছো! তুমি কি খাবে! ওকে আমি খেয়ে উঠে চিড়ে-মুড়ি দিচ্ছি। তুমি খাও.........

চন্দ্রমণি পুত্রবধূর মুখ থেকে কথাটা কেড়ে নিয়ে স্মিতহাস্যে বলে, চিড়ে মুড়ি আমিই খাব মা। আহা, এই ভর দুপুর বেলায় চারটি ভাত চেয়েছে...না দিয়ে কি থাকা যায়। ব'লে ভাতের থালাখানা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

শাশুড়ীর উপর অভিমানে পুত্রবধূর মুখখানা ভার হ'য়ে যায়। হাত গুটিয়ে নিয়ে ভাবে আর খাবে কিনা।

পুত্রবধূর ভাবান্তর শাশুড়ীর দৃষ্টি এড়ায় না। তাই ভাতের থালা নিয়ে ভিখারীর দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলে, তুমি খাও মা, আমার জন্য কিছু ভেবো না। একটা বেলা যা' তা' খেয়ে.........

শাশুড়ীকে কথাটা শেষ করার অবকাশ না দিয়ে পুত্রবধূ ঈষৎ রুক্ষকণ্ঠে বলে, প্রায় দিনই মুখের ভাত একে ওকে তাকে ধ'রে দিচ্ছ—কেন বল তো? আর এমন ক'রলে কদিন বাঁচবে?

চন্দ্রমণি বধূর দিকে ফিরে চোখ টিপে তাকে চুপ ক'রতে ব'লে ভিখারীর সম্মুখে এসে ভাতের থালাটা সযত্নে ধ'রে দেয়। সস্নেহে বলে, একটু দাঁড়াও, আমি হাত ধুয়ে খাবার জল দিচ্ছি।

পুত্রবধূর সব কথাই ভিখারীর কাণে যায়, তাই মর্ম্মাহত হ'য়ে সলজ্জ কণ্ঠে বলে আপনার মুখের ভাতটা ধ'রে দিলেন মা? এমন হবে জানলে...

চন্দ্রমণি বাধা দিয়ে বলে, তাতে কি হ'য়েছে। তুমি লজ্জা ক'র না, খাও। আমার স্বামী বলেন—গরীব দুঃখীকে দিলে ভগবান তুষ্ট হন।

ভিখারী কোন কথা না ব'লে মাথা নত ক'রে ভাতের দিকে লুব্ধদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

চন্দ্রমণি তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে এক ঘটি খাবার জল তার সম্মুখে ধ'রে দিয়ে বলে, নাও খেতে বস!

ভিখারী আর দ্বিরুক্তি না ক'রে হাত ধুয়ে খেতে বসে।

চন্দ্রমণি সকরুণ দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখে। স্বামীর জন্য ক্ষোভ এবং ব্যথা এই সময়টুকুর জন্য সব দূর হ'য়ে যায়।

এমন সময় ধনী ব'লতে ব'লতে বাড়ীর ভিতর ঢোকে—কই গো বাড়ীর গিন্নী! বলি, খাওয়া হ'ল? ব'লে বাড়ীর ভিতর ঢুকে ভিখারীকে দেখে আর চন্দ্রমণিকে তার অনতিদূরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বিস্মিত দৃষ্টিতে চায়।

পুত্রবধূ খাওয়া শেষ ক'রে হাতমুখ ধোবার জন্য বেরিয়ে আসতে আসতে বলে, ছাই হ'ল। মুখের ভাত ওকে সব ধ'রে দিলেন। ব'লে ভিখারীকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ ক'রে দেখায়।

ভিখারী লজ্জায় আবার মাথাটাকে নত ক'রে ফেলে।

চন্দ্রমণি ভিখারীর ভাবান্তর লক্ষ্য ক'রে পুত্রবধূর দিকে চেয়ে ঈষৎ রুক্ষকণ্ঠে বলে, তুমি চুপ কর তো বৌমা, মানুষটাকে এমন ক'রে লজ্জা দিও না।

ধনী এবার পুত্রবধূর কথা সমর্থন ক'রে অনুযোগের সুরে বলে, সত্যি তো বৌদি, তুমি রোজ রোজই প্রায় এমন কর। তারপর ভিখিরীটার দিকে চেয়ে ঈষৎ রুক্ষকণ্ঠে বলে, আর তোমাদেরও বলি বাছা, ভিক্ষে করার কি আর সময় অসময় নেই—ভর দুপুর বেলা তোমরা...

চন্দ্রমণি ধনীর কথার ধরণ দেখে এবং ভিখারীকে পাংশু হ'য়ে যেতে দেখে বাধা দিয়ে রুক্ষকণ্ঠে বলে, আঃ, চুপ কর্ না ধনী, কি বলছিস্ যা তা। দেখ দেখি তোদের কথা শুনে মানুষটা খাওয়া বন্ধ ক'রে দিল।

ভিখিরী অবশিষ্ট ভাত কটা গোগ্রাসে খেয়ে নেয়। উচ্ছিষ্ট পাতাটা তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। চন্দ্রমণির দিকে চেয়ে গভীর পরিতৃপ্তির সঙ্গে বলে, না মাঠাক্‌রুণ, আমার খাওয়া হ'য়ে গেছে।

সঙ্গে সঙ্গে ধনী বলে, তবে আর দাঁড়িও না বাছা। এঁটো পাতাখানা বাইরে ফেলে দিয়ে খিড়কির পুকুর থেকে হাতমুখ ধুয়ে রওনা দাও।

ভিখারী আর না দাঁড়িয়ে কুণ্ঠিত পদে সদরের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে, আপনার জয় হোক মা।

আনন্দে আর পরিতৃপ্তিতে চন্দ্রমণির মুখখানা প্রশান্তিতে ভ'রে ওঠে। মনের সমস্ত ব্যথা ও বেদনা দূর হ'য়ে যায়।

এমন সময় ধর্ম্মদাস লাহার বিধবা কন্যা প্রসন্ন বাড়ীর ভিতর ঢুকে চন্দ্রমণি ও ধনীকে উঠানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা

করে, ওমা! তোমরা এখানে দাঁড়িয়ে কেনে গো? বলি, খাওয়া দাওয়া চুকে গেছে তো?

ধনী আর প্রসন্ন উভয়েই চন্দ্রমণির সমবয়সী ও প্রতিবেশী এবং সহচরীর মত।

ধনী কর্ম্মকারের মেয়ে। এই গ্রামেই তার বাপের বাড়ী। শ্বশুর ঘর সে করেনি ব'ললেই হয়। কারণ বিবাহের অল্পদিন পরেই বিধবা হ'য়ে সেই যে বাপের বাড়ী আসে আর যায় নি বা শ্বশুরবাড়ীর দিক থেকেও কেউ নিতে আসেনি। আর বাবাও তাকে বুক দিয়ে আগলে রেখেছিল। কোন অভাবই সে কোনদিন বুঝতে পারেনি। কিন্তু বাবার মৃত্যুর পর থেকে তাকেই সংসার প্রতিপালন ক'রতে হয় এবং সেই থেকে চিড়ে, মুড়ি ভেজে, ধান ভেঙ্গে দিন চালায়। স্বভাব চরিত্র খুবই মধুর। তাই চন্দ্রমণিও তাকে ভালবাসে। সময় অসময়ে ডেকে পাঠায়।

প্রসন্নও ধনীর মতনই বিবাহের পর বিধবা হয়। তবে তার পিতার অবস্থা ভাল। তাকে নিয়ে এসে আর কোনদিন পাঠায়নি। সেই থেকে প্রসন্নও বাপের সংসারেই একজন হ'য়ে আছে। চন্দ্রমণির সহজ সরল ব্যবহারে মুগ্ধ হ'য়ে ধনীর মতন আসে এবং কিছুক্ষণ সময় হাসি গল্পে কাটিয়ে যায়।

প্রসন্নর কথার জবাব চন্দ্রমণি দেবার আগেই ধনী একটু বিদ্রূপ ক'রে বলে, হ্যাঁ, বাকী ছিল কাঙালী ভোজন, সেটাও এই শেষ হ'ল। তাই এখানে দাঁড়িয়ে।

চন্দ্রমণি কপট রাগের সঙ্গে বলে, তুই থাম দেখি ধনী। সব কথাতেই ফোড়ন কাটা চাই। ব'লে প্রসন্নর দিকে এগিয়ে এসে হাতখানা ধ'রে মৃদু টান দিয়ে বলে, চ' ঘরে গিয়ে বসি। তারপর ধনীর দিকে চেয়ে বলে, আয়।

সকলে ঘরের দিকে এগিয়ে যায়।

●

সাত

দশদিন বাড়ী থেকে বেরিয়ে ক্ষুদিরাম প্রায় ক্রমান্বয়ে হেঁটে চলে। তবে দ্বিপ্রহরে প্রখর রৌদ্রের জন্য হাঁটতে পারে না, কষ্ট হয়। আর ঘন ঘন পিপাসাও পায়। অথচ সব জায়গায় তৃষ্ণার জল পাওয়া যায় না, আবার পানীয় জল নিয়ে হাঁটাও পীড়াদায়ক। কারণ এই দারুণ গ্রীষ্মের ভিতর একঘেয়ে পথ অতিক্রম ক'রতে ক'রতে ব্যাগ বিছানা, এমন কি অঙ্গবাস পর্য্যন্ত অসহ্য হ'য়ে ওঠে ; তার উপরে পানীয় জল নিয়ে হাঁটা… …ইচ্ছাও করে না বা পারেও না।

দ্বিপ্রহরে হাঁটতে পারে না ব'লে অনেক সময় পথের সাথী পেলে দীর্ঘরাত্রি পর্য্যন্ত হাঁটে। তারপর নিকটে কোন চটী পেলে সেখানে রাত্রিটুকুর জন্য আশ্রয় নেয়। আবার নিশি ভোর হবার আগেই যাত্রা সুরু করে।

সেদিন সন্ধ্যার সময় কোন সাথী না পেয়ে এবং নিকটে একটা চটী দেখে আশ্রয় নিতে এগিয়ে আসে। দূর থেকে ভেবেছিল চটিতে বোধ হয় কেউ নেই, এবং তাকে একাই রাত্রিবাস ক'রতে হবে।

কিন্তু চটির কাছে আসতেই কে একজন ভিতর থেকে ব'লে ওঠে, ব্যোম্ শঙ্কর ! চালাও বেটা !

আচম্বিতে চীৎকার শুনে ক্ষুদিরাম চমকে ওঠে। কিন্তু সামলে নিয়ে ভিতরে ঢোকে। দেখে—ঘরের এককোণে একটা ধূনী জ্বলছে আর অন্যধারে গৈরিক বাস পরিহিত একটি শুট্‌কো সাধু কম্বল বিছিয়ে ব'সে তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

সাধুর বয়স অনুমান করা শক্ত। পঁচিশও হ'তে পারে, পঞ্চাশও হ'তে

পারে। একে চেহারাটা পাকিয়ে গেছে, তার উপরে ভস্মাচ্ছাদিত হ'য়ে থাকায় বয়েসটা একেবারেই ঢাকা প'ড়েছে। মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া এক মাথা চুল, তৈলাভাবে রুক্ষ। তবে পরিপাটি ক'রে আঁচড়ানো। মুখেও পাত্‌লা পাত্‌লা গোঁফ দাড়ি। চোখ দুটো যেমন ছোট তেমনি কোটরগত। বৈরাগীর কোন উদাস ও ভাববিহ্বল চাহনি সে চোখের ভিতর নেই। কপটতা আর ভোগলালসার সুতীব্র বাসনা নিয়ে দৃষ্টি সব সময় সুযোগ অন্বেষণ ক'রছে। সন্ন্যাসীর অন্যান্য উপকরণেরও অভাব নেই—চিম্‌টে, কমণ্ডুল ইত্যাদি মাথার শিয়রে বৈরাগ্যের নিদর্শন নিয়ে ব'সে আছে।

ক্ষুদিরামকে বিহ্বল দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থাকতে দেখে সাধু আবার বলে, ক্যা সোচতা ? আও বৈঠ। ব'লে তার পাশে কম্বলটার উপর হাতখানা চাপড়াতে থাকে।

ক্ষুদিরাম ইতিপূর্ব্বে কাশী, বৃন্দাবন, রামেশ্বর তীর্থ দর্শন ক'রে এসেছে এবং বহু সাধু সজ্জন ব্যক্তিকেও দেখেছে। তাছাড়া তার নিজেরও একটা অন্তর্দৃষ্টি আছে যার দ্বারা সহজেই সে ভাল মন্দ চিনে নিতে পারে।

এই সাধুকে দেখেই তার মনে একটা অশ্রদ্ধা এসেছিল। তাই তার আহ্বানে সাড়া না দিয়ে উদাস কণ্ঠে বলে, না, থাক। আমার নিজের বিছানা পেতে নিচ্ছি। ব'লে ব্যাগটা নামিয়ে রেখে বিছানাটা পাততে থাকে।

সাধু খুব খুশীর সঙ্গে বলে, আপনি বাঙালী ? আঃ বাঁচলাম। মেড়োর দেশে ঢুকে পর্য্যন্ত বাংলায় কথা বলতে পারি নি। বাংলা ভাষা একেবারে ভুলতে বসেছিলাম। যাক্ সে সব কথা পরে হবে। আগে এক ছিলিম গাঁজা বার ক'রে দিন দিকি। আমি ততক্ষণ সাজি। আপনাকেও ক্লান্ত দেখছি আর আমিও অনেকক্ষণ নেশা করিনি।

ক্ষুদিরাম বিছানা পাততে পাততে সাধুর দিকে চেয়ে বিস্মিত কণ্ঠে বলে, গাঁজা !

সাধু ঈষৎ বিরক্তি ভ'রে বলে, হ্যাঁ হ্যাঁ, গাঁজা। ব'লে তার শিয়র থেকে শূন্য ক'লকেটা তুলে নিয়ে দুই হাতের তালুর মধ্যে ফেলে একটা দীর্ঘটান দিয়ে ঊর্দ্ধে মুখ তুলে ধোঁয়া ছাড়ার ভঙ্গিতে বলে, যা' দেবাদিদেব মহাদেব খান, আর খেয়ে সব ভুলে থাকেন, তাই না তাঁর নাম ভোলা মহেশ্বর।

ক্ষুদিরামের বিছানা পাতা হ'য়ে যায়। তার উপরে ব'সে মৃদু হেসে বলে, হুঁ, কিন্তু গাঁজা তো আমি খাই নে!

সাধুর মুখখানা ব্যথায় ও হতাশায় শুকিয়ে যায়। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে রুক্ষকণ্ঠে বলে, তবে কি খান—ভাঙ? বেশ তাই দিন। ষোল আনা নেশা না হোক দশ আনা তো হবে। ব'লে ক্ষুদিরামের দিকে হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে আঙ্গুলগুলো নাড়তে থাকে।

ক্ষুদিরাম তেমনি হাসতে হাসতে বলে, তাও খাইনে।

সাধু একেবারে মুষড়ে পড়ে। মেজাজটা রুক্ষ হ'য়ে ওঠে। মুখটা বিকৃত ক'রে প্রগাঢ় তাচ্ছল্যের সঙ্গে বলে, তবে কি ক'রতে বেরিয়েছ? বাড়ী থাকলেই তো পারতে। তারপর মুখখানা গম্ভীর ক'রে দৃঢ়তার সঙ্গে বলে, কোন্ বেটা সাধু গাঁজা না খেয়ে ঈশ্বর পেয়েছে দেখাও দিকি। সেইজন্যই না তুলসীদাস তার দোঁহাতে লিখে গেছে, "বিনা গাঁজাসে নাহি মিলে নন্দলালা"।

সাধুর কথায় ক্ষুদিরাম বেশ কৌতুক বোধ করে। তাই আরো উপভোগ করার জন্য বলে, সেজন্যই বুঝি তুমি গাঁজা খাও?

সাধু উৎসাহিত হ'য়ে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে, আমার গাঁজা খাওয়া দেখেই না এক সাধু আমাকে বললে, তুম্ এত্না গাঁজা পিতা—তুম্‌কো তো আধা ভগবান মিল গিয়া। তুম বেটা কাহে হিঁয়া পড়কে হ্যায়। ঘর ছোড়কে চলা যাও। তুম্‌কো জরুর ভগবান মিলে গা। তাই না বেরিয়ে পড়লাম।

সাধু থামতেই ক্ষুদিরাম জিজ্ঞাসা করে, তা ভগবান মিলেছে?

সাধু আবার মুখ বিকৃত ক'রে তাচ্ছল্যের সঙ্গে বলে, মিলবে কি! গাঁজাই জুট্‌ছে না। আজ তো সারাদিন এক ছিলিমও জোটে নি। তারপর একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বলে, যাক্, আপনি যখন খানই না তখন আর ও আলোচনা না করাই ভালো। তা ছাড়া ঐ আলোচনা ক'রলে মনটা গাঁজার জন্যে......

প্রসঙ্গটা ছেড়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করে, তা দাদার নামটা কি?

ক্ষুদিরাম বিস্মিত কণ্ঠে বলে, বেটা থেকে একেবারে দাদা!

সাধু ঈষৎ লজ্জা পেয়ে বলে, যস্মিন্ দেশে যদাচরেৎ। এই মেড়োর দেশে বেটা বেটী না ব'ললে কেউ আমল দিতে চায় না। যাক্ গে, তা দাদার নামটা কি?

ক্ষুদিরাম প্রশান্ত কণ্ঠে বলে, শ্রীক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়।

সাধু চোখ দুটো বিস্ফারিত ক'রে নীরবে আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ ক'রতে থাকে।

সাধুকে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে দেখে ক্ষুদিরামও বিস্মিত হয়। কিন্তু সে ভাবটা দমন ক'রে নিয়ে জিজ্ঞাসা করে, তোমার নাম কি?

সাধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে, শ্রীনেইরাম মণ্ডল।

ক্ষুদিরাম অবাক হ'য়ে যায়। বিস্মিত কণ্ঠে বলে, নেই রাম!

সঙ্গে সঙ্গে সাধু বলে, তাছাড়া আর কি ব'লবো বলুন? লম্বা চওড়া দীর্ঘাকৃতি পুরুষ হ'য়ে আপনি যদি ক্ষুদিরাম হন তা হ'লে আপনার পাশে আমি তো নেই। অতএব নেইরাম.........

ক্ষুদিরাম হোঃ হোঃ ক'রে হেসে ওঠে। পরে হাসি থামিয়ে বলে, তুমি তো বেশ রসিক আছো হে।

সাধু খুশীর সঙ্গে বলে, আগে আরো ছিলাম। শুধু গাঁজার অভাবে কিঞ্চিৎ শুকিয়ে গেছি। আর সাধনায়ও বিঘ্ন হচ্ছে। প্রসঙ্গটা ছেড়ে দিয়ে আবার জিজ্ঞাসা করে, তা রাত্রে খাওয়া দাওয়ার কি আয়োজন করছেন?

ক্ষুদিরাম একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বলে, কি আর খাব! শরীরও

ক্লান্ত...তা ছাড়া এখানে কোথায় কি পাওয়া যায় তাও জানিনে। আর অন্ধকারও হ'য়ে গেছে। অপরিচিত জায়গা......

সাধুর আর শোনার ধৈর্য্য থাকে না। একটি দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে "ব্যোম্ শঙ্কর" ব'লে দুই হাতের উপর মাথা রেখে বিরস মনে শুয়ে পড়ে।

ক্ষুদিরাম অবাক হ'য়ে বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, কি হ'ল! শুয়ে প'ড়লে কেন ?

সাধু বিরস মনে বলে, কি আর ক'রবো বল ? যা শোনালে তাতে শুয়ে পড়া ছাড়া তো আর কোন কাজ দেখছি না। তারপর আবার ব্যস্ত হ'য়ে উঠে ব'সে ক্ষুদিরামের দিকে চেয়ে বলে, বাঙালী শুনে খুব আশা হ'য়েছিল। ভাবলাম বহুদিন পরে চারটি ভাত জুটবে। কিন্তু···যা শোনালে···কথাটা আর শেষ না ক'রে আবার "ব্যোম শঙ্কর" ব'লে অনুরূপ ভাবে শুয়ে পড়ে।

ক্ষুদিরাম মৃদু মৃদু হাসতে হাসতে বলে, বেশ তো আমি পয়সা দিচ্ছি, তুমি যাওনা। যদি কিছু আনতে পার।

সাধু ক্ষুদিরামকে কথাটা শেষ ক'রতে না দিয়ে শয্যা ছেড়ে লাফিয়ে উঠে কাছে এসে হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে বলে, দাও দাও, আমি এখনই সব ব্যবস্থা ক'রে ফেলছি।

ক্ষুদিরাম কোঁচার খুঁট থেকে পয়সা বার ক'রতে ক'রতে জিজ্ঞাসা করে, কত দেব ?

সাধু খুব উৎসাহের সঙ্গে বলে, দাও, গণ্ডা চারেক পয়সা। চাল ডাল পেলে আর ছাতু আনবো না। ছাতু আর রুটি খেতে খেতে পেটে চড়া প'ড়ে গেছে। তা ছাড়া যদি এক ছিলিম গাঁজা পাই।

ক্ষুদিরাম আর দ্বিরুক্তি না ক'রে পয়সা দেয়! আর সাধু খাদ্যের অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়ে।

আট

ক্ষুদিরাম গয়াধামে এসে যখন পৌঁছায় তখন আর তাকে চেনা যায় না। সেই তপ্ত কাঞ্চনের মত বর্ণ রোদে পুড়ে একেবারে কালী হ'য়ে গেছে। খোঁচা খোঁচা গোঁফ দাড়িতে মুখখানা আচ্ছন্ন। মাথার চুলগুলো রুক্ষ ও উস্কখুস্ক, চোখ দুটো কোটরগত। এই ক'দিনেই দেহটা যেন শুকিয়ে গেছে। তেজ ও দীপ্তি অন্তর্হিত হ'য়েছে। বার্দ্ধক্য আর জরা প্রভাব বিস্তার ক'রেছে। সহসা দেখলে ব্যাধিগ্রস্ত ব'লেই মনে হয়। আর বসন ভূষণও সেই রকম মলিন।

ক্ষুদিরাম সহরে প্রবেশ ক'রে রাস্তার ধারে একটা দোকানে এসে জিজ্ঞাসা করে, এটা কি গয়াধাম ?

দোকানী হিন্দুস্থানী। বয়সে প্রৌঢ়। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ক্ষুদিরামের আপাদ মস্তক দেখে নিয়ে বলে, হাঁ, কা মাংতা, বোলো ?

ক্ষুদিরাম বিনীত স্বরে বলে, একটা বাসা।

দোকানী তাচ্ছল্যের সঙ্গে বলে, হিঁয়া বাসা উসা নেই হ্যায়। পাণ্ডা লোক্‌কা পাস যাও।

ক্ষুদিরাম আবার জিজ্ঞাসা ক'রে, তাদের কোথায় পাব ?

দোকানী এবার বিরক্ত হ'য়ে ওঠে। রুক্ষকণ্ঠে বলে, মন্দিরমে যাও, উঁহা সবকুছ্ মিলেগা।

ক্ষুদিরাম দোকানীর বিরক্তি ভাব ও তাচ্ছল্য উপেক্ষা ক'রে জিজ্ঞাসা করে, মন্দিরটা কতরদূ ?

দোকানীর মেজাজটা আরও রুক্ষ হ'য়ে যায়। কতগুলো পথচারীর দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ ক'রে রূঢ়কণ্ঠে বলে, দিক্‌দারী কর মত্! এই লোক্‌কা সাথ সাথ যাও। ব'লে ক্ষুদিরামের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে বসে।

ক্ষুদিরাম আর দ্বিরুক্তি না ক'রে দোকানীর নির্দ্দেশমত যাত্রীদের অনুসরণ করে।

যদিও সে দীর্ঘপথ অতিবাহিত ক'রে এসেছে, আহার এবং নিদ্রা কিছুই তার নিয়মমত ও পরিমাণ মত হয় নি। সারাদিন পাদক্রমা ক'রে সন্ধ্যার সময় কোন ধর্ম্মশালায় আশ্রয় নিয়ে ক্লান্তিতে শুয়ে প'ড়েছে। উঠে আহার পর্য্যন্ত ক'রতে পারে নি। ভেবেছে, আর বোধ হয় এগুতে পারবে না। এই জনহীন পথপ্রান্তে আত্মীয় পরিজন হ'তে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে জীবনের অন্তিম শয্যা বিছাতে হবে। আর সেই বেদনায় হৃদয়টা শঙ্কিতও হ'য়েছে। কিন্তু পরের দিন আবার রঘুবীরের নাম স্মরণ ক'রে যথানিয়মে পথের ব্যবধানকে নিকটতর ক'রেছে। ক'রেছে বটে, তবে তাতে কোন আনন্দও পায় নি, আবেগও পায় নি।

কিন্তু এই তীর্থভূমিতে পা দিয়ে ক্ষুদিরামের মন থেকে সমস্ত ক্ষোভ এবং বেদনা দূর হ'য়ে যায়। মন্দিরাভিমুখী যাত্রীদলকে অনুসরণ ক'রে যেতে যেতে মনে হয়, এখানে না এলে জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য থেকে চ্যুত হ'য়ে যেত। যে আশায় পিতা সন্তানের কামনা করে—পিতার সে আশা অপূর্ণ থেকে যেত। শুধু তাই নয়, একটা অভূতপূর্ব্বভাবে মনটা সমাহিত হ'য়ে যায়। পথ অতিক্রম ক'রতে ক'রতে ভগবানের চিন্তা যত না ক'রেছে তার চেয়ে বেশী ক'রেছে সংসারের চিন্তা। যদিও রামকুমার উপযুক্ত হ'য়েছে এবং উপায়ক্ষম হ'য়েছে, তবুও সে ছিল বটবৃক্ষের মতন। শাখা-প্রশাখা বিস্তার ক'রে ছায়া দিয়ে ঢেকে রেখেছিল এই প্রাণীগুলিকে। এখন বটবৃক্ষের ছায়া অপসারিত হ'য়ে গেছে। মাথার উপর আর পত্রছায়া নেই, অতএব—

ভাবতে ভাবতে মন্দিরের সম্মুখে এসে পড়ে। তার ঐ রকম রুক্ষ চেহারা এবং ব্যাগ ও বিছানা দেখে পাণ্ডাদের আর বুঝতে দেরী হয় না যে, লোকটা তীর্থাভিলাষী। তাই পাণ্ডারা মধুলোভী মৌমাছির মতন ক্ষুদিরামের চারিদিকে এসে জড় হয়।

একজন জিজ্ঞাসা করে, ক্যা, পিণ্ড দেনে আয়া ? ক্ষুদিরাম ঘাড় নাড়তে না নাড়তে একজন হাত থেকে ব্যাগটা ছিনিয়ে নেয়, আর একজন বিছানাটা বগলদাবা থেকে টেনে নেয়। একজন হাত ধ'রে ঝাঁকি দিতে দিতে বলে, বোলো--বোলো, পিতাজীকো নাম বোলো ?

ক্ষুদিরাম ইতোপূর্ব্বে আরো কয়েকটী তীর্থ দর্শন ক'রে এসেছে। কিন্তু পাণ্ডাদল কর্ত্তৃক এইভাবে পথিমধ্যে আক্রান্ত হয় নি। তাই অতর্কিত আক্রমণে হতভম্ব হ'য়ে যায়। কি যে ক'রবে ভেবে পায় না। নির্ব্বাক হ'য়ে থাকে।

আর একজন পাণ্ডা কাপড় জড়ানো খাতাখানা খুলতে খুলতে বলে, বাত বোলতা নেই কাহে ? তুম্ কি গোঙা হ্যায় ?

ক্ষুদিরামের বিহ্বলতা কেটে যায়। গলা ঝেড়ে বলে, ঈশ্বর...

একজন পাণ্ডা ক্ষুদিরামের মুখ থেকে কথাটা কেড়ে নিয়ে উৎসাহিত হ'য়ে বলে, ব্যস্ ব্যস্ মিল গিয়া। ব'লে খাতাখানা খুলে নিয়ে ক্ষুদিরামের চোখের উপর ধ'রে একটা লেখার প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ ক'রে বলে, এই দেখো ঈশ্বরলাল পাণ্ডে, গাঁও বলবড্ডা, জেলা—সাঁউতাল পরগণা। কথাটা শেষ ক'রে ক্ষুদিরামের হাত ধ'রে অন্য পাণ্ডাদের দিকে চেয়ে বলে, আভি ছোড়, মেরা যজমান। মালুম হো গিয়া তো ?

অন্যান্য পাণ্ডারা হতাশ হ'য়ে পড়ে।

ক্ষুদিরাম ঈষৎ বিরক্ত হ'য়ে বলে, ঈশ্বর...মানে গত...

কথাটা ক্ষুদিরামকে শেষ করার অবকাশ না দিয়ে আর একজন পাণ্ডা চীৎকার ক'রে বলে, হাঁ—হাঁ, ঈশ্বর মালগৎ, পিতা মহেশ্বর মালগৎ, গাঁও তেহারা, জিলা ছাপরা।

ক্ষুদিরাম এবার বিরক্ত হ'য়ে ওঠে। একে পথশ্রান্ত, তার উপরে পাণ্ডাদের চেঁচামেচি ও অভদ্রোচিত ব্যবহারে সংযম হারিয়ে ফেলে। তাই রুক্ষকণ্ঠে বলে, তোমার মাথা !

পাণ্ডাটা তাড়াতাড়ি মাথায় হাত দিয়ে বিস্মিত কণ্ঠে বলে, মাথা ?

এমন সময় একজন প্রৌঢ়বয়স্ক দীর্ঘাকৃতি প্রিয়দর্শন পাণ্ডা সেখানে এসে গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করে, ক্যা হুয়া ?

সকলেই সসম্ভ্রমে ক্ষুদিরামকে ছেড়ে স'রে দাঁড়ায় ও পরস্পর পরস্পরের মুখ চাওয়া চায়ি করে। কেউ আর কিছু ব'লতে পারে না।

ক্ষুদিরামও লোকটির দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারা ও ব্যক্তিত্ব দেখে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চায়।

লোকটা ক্ষুদিরামের দিকে চেয়ে প্রশান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, আভি কহিয়ে তো আপ্‌কা মুকাম কাঁহা ?

টানা হ্যাঁচ্‌ড়া থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে ক্ষুদিরাম যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। ক্লান্তস্বরে বলে, গ্রাম কামারপুকুর, জিলা হুগলী।

লোকটা আবার জিজ্ঞাসা করে, আপ্‌কা নাম আউর আপ্‌কা পিতাজীকা নাম ?

ক্ষুদিরাম বলে, আমার নাম শ্রীক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়, পিতার নাম ৺মাণিকরাম চট্টোপাধ্যায়।

ক্ষুদিরামের কথা শুনে লোকটা এবার পাণ্ডাদের দিকে চেয়ে বলে, আভি বোলো ?

কেউ আর কিছু বলে না, চুপ ক'রে থাকে। যে যা ক্ষুদিরামের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল আবার তা ঘুরিয়ে দেয়।

লোকটা আবার ক্ষুদিরামের দিকে চেয়ে বলে, আপ্‌কা তো কই পাণ্ডা নেহি হ্যায়, ইস্‌কা ভিতরসে আপ এক আদ্‌মীকো ঠিক কর্‌ লিজিয়ে। উ আপ্‌কা সব কাম কর্‌ দেগা !

ক্ষুদিরাম কুন্ঠিত স্বরে জিজ্ঞাসা করে, আপনি কি এই কাজ করেন ?

লোকটা কথা না ব'লে ঘাড় নাড়ে।

ক্ষুদিরাম উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে, আপনাকেই আমি আমার পাণ্ডা নিযুক্ত ক'রতে চাই।

লোকটা বিনয়ের সঙ্গে বলে, আপ্‌কো মেহেরবাণী।

ক্ষুদিরাম বলে, কিন্তু আমি একমাস থাকবো। আগে ক্ষেত্রকর্ম্মাদি ক'রে শেষে পিণ্ডদান ক'রব। উপস্থিত একটা আশ্রয়...

লো কটা বলে, আইয়ে। ব'লে এগিয়ে যায়। আর ক্ষুদিরাম তাকে অনুসরণ করে।

নয়

মধ্যাহ্ন যায় যায়। চন্দ্রমণি খাওয়া দাওয়া চুকিয়ে দাওয়ায় বসে ছুঁচ সূতা দিয়ে তারই পরণের একটা শাড়ী নিবিষ্ট মনে সেলাই ক'রে চ'লেছে। এমন সময় তার দশ বৎসরের কনিষ্ঠ পুত্র রামেশ্বর পাঠশালা থেকে বাড়ী ফিরে আসে। বইগুলো শোবার ঘরে ঢুকে রেখে দেয়। তারপর নিঃশব্দে রান্নাঘরের দাওয়ায় উঠে এসে চন্দ্রমণির গলা জড়িয়ে ধ'রে আব্দার ক'রে বলে, মাগো, ক্ষিধে পেয়েছে।

আচম্‌কা স্পর্শে চন্দ্রমণি চম্‌কে ওঠে। বিস্মিত কণ্ঠে বলে, ও মা! ঘাড় ফিরিয়ে রামেশ্বরের দিকে চেয়ে ব্যস্ত হ'য়ে বলে, ছাড় ছাড় হাতে ছুঁচ ফুটে যাবে!

রামেশ্বর গলাটাকে আরো নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধ'রে নিজের গালটা মার গালে মিশিয়ে দিয়ে আব্দারের সঙ্গে বলে, না ছাড়বো না। ক্ষিধে পেয়েছে—আগে খেতে দাও।

চন্দ্রমণি নিরুপায় হয়ে ছুঁচ সূতোটা কাপড়ের সঙ্গে আট্‌কে রেখে স্নেহকরুণ কণ্ঠে বলে, ওরে—লাগে লাগে, ছাড় ছাড়! বাবা বাবা, কি দস্যি ছেলে গো!

রামেশ্বর এবার গলায় ঝাঁকি দিতে দিতে বলে, ওঠো না—ওঠো না!

চন্দ্রমণির সেলাই ছেড়ে উঠতে আর ইচ্ছা করে না। তাই অনুরোধ

ক'রে বলে, আর জ্বালাতন করিস্‌নে বাবা! সেলাইটুকু আমাকে শেষ ক'রে নিতে দে।

রামেশ্বরের মুখখানা ভার হ'য়ে যায়। অভিমান ভরা কণ্ঠে বলে, বা রে, আমার বুঝি ক্ষিদে পায় না? কখন ভাত খেয়ে গেছি......

চন্দ্রমণি রামেশ্বরের মাথায় পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে মিনতি ক'রে বলে, বৌমার কাছে চাও গে। সে খেতে দেবে'খন!

রামেশ্বর মুখ ভার ক'রে বলে, বৌদি ঘুমিয়েছে। তুমি ওঠো। ব'লে গলা ছেড়ে দিয়ে হাত ধ'রে টানতে থাকে।

চন্দ্রমণি নিরুপায় হ'য়ে উঠে দাঁড়ায়। একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বিরক্তি-ভরে বলে, চলো। ব'লে ঘরে ঢুকে একটা টেকোয় ক'রে চারটি মুড়ি এনে ছেলের হাতে দিয়ে বলে, নাও হোলো তো? বাবা, বাবা! একটু-খানি যদি সুস্থির হ'য়ে ব'সতে দেয়।

রামেশ্বর খুশীমনে মুড়ি নিয়ে দাওয়া থেকে নেমে আসে।

চন্দ্রমণি আবার যথাস্থানে গিয়ে ব'সে সেলাইটা তুলে নেয়। কিন্তু মনোনিবেশ ক'রতে না ক'রতে ধনী ও প্রসন্ন বাড়ীর ভিতর ঢোকে। দরজা নাড়ার শব্দে চন্দ্রমণি বিস্মিত দৃষ্টিতে মুখ তুলে চায়। ওদের দেখে সেলাই বন্ধ ক'রে খুশীর সঙ্গে বলে, আয় আয়! ব'লে উঠে দাঁড়ায়। ঘরে ঢুকে একখানা মাদুর এনে পেতে দিয়ে আবার বলে, আয়, বোস।

রামেশ্বর ওদের দিকে একবার কৌতূহলী দৃষ্টিতে চায়। তারপর বাড়ীর এক কোণে শায়িত তাদের কুকুরটার দিকে একগাল মুড়ি বাড়িয়ে ধ'রে বলে, বামা! তু—আয়!

বামা লেজ নাড়তে নাড়তে ছুটে আসে। রামেশ্বর মুড়িতে মুষ্টিবদ্ধ হাতখানা তার দিকে বাড়িয়ে রেখে প্রলুব্ধ ক'রে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে যায়।

ধনী আর প্রসন্ন দাওয়ার উপর উঠে আসে।

চন্দ্রমণি ধনীর দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করে, তুই বুঝি প্রসন্নকে ডেকে নিয়ে এলি?

চন্দ্রমণির কথা শুনে ধনী চোখ দুটো বিস্ফারিত ক'রে গালে আঙ্গুল দিয়ে বিস্মিত কণ্ঠে বলে, ওমা! শোন কথা—আমি ডাকতে যাব কেনে গো! তোমাদের সদরের কাছে ওর সঙ্গে দেখা। ব'লে মাদুরের উপর এসে বসে।

প্রসন্ন ওর পাশে ব'সে। চন্দ্রমণির দিকে চেয়ে বলে, না বামুনখুড়ি, আমি তো রোজই একবার ক'রে আসি। আজ একটু দেরী হ'য়ে গেল তাই আর কি……প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে, হুঁ, ভাল কথা—বামুন কাকার কোন চিঠি-পত্তর এলো?

ক্ষুদিরামের কথায় চন্দ্রমণির মনটা উদাস হ'য়ে যায়। বিষণ্ণ কণ্ঠে বলে, না। তারপর একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে উৎকণ্ঠার সঙ্গে বলে, একমাসের উপর হ'ল গেছে, একখানা চিঠি পর্য্যন্ত দিল না। কেমন আছে কে জানে!

প্রসন্ন সান্ত্বনা দিয়ে বলে, ভেবো না গো, ভেবো না। ভালই আছে। কাজকর্ম্মের ঝঞ্চাটে হয়তো চিঠি দিতে পারছে না।

ধনী প্রসন্নের কথার জের টেনে বলে, আর যে মানুষ, ঠাকুর দেবতা পেলে আর তো কিছু মনে থাকে না। সংসারের কথা ভুলে যায়।

চন্দ্রমণি ধনীর কথার জবাবে বলে, তা' যা' বলেছিস্ ধনী! দেবতা ব'লতে একেবারে অজ্ঞান। এই গত বছর ফাল্গুন মাসে ভাগ্নে রামচাঁদের অনেকদিন কোন সংবাদ না পেয়ে ভোরবেলা মেদিনীপুরে যাচ্ছি ব'লে রওনা হ'লেন। ওমা, দুপুর গড়িয়ে গেছে, খেতে বসবো, এমন সময় সে মানুষ দেখি—এক ঝুড়ি কচি কচি বেলপাতা ভিজে গামছা ঢাকা দিয়ে মাথায় ক'রে নিয়ে গলদ্‌ঘর্ম্ম হ'য়ে বাড়ী এসে হাজির। আমি তো দেখে অবাক! জিজ্ঞেস করলাম, ওমা! একি গো! তুমি ফিরে এলে যে?

প্রসন্ন ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, উত্তরে তিনি কি বললেন?

চন্দ্রমণি ঈষৎ তাচ্ছল্যের সঙ্গে বলে, কি আবার বলবে। ব'ললে—ফাল্গুন মাস প'ড়ে পর্য্যন্ত বেলপাতা দিয়ে আর শিবপূজো ক'রতে পারি নি।

তাই যেতে যেতে এক গাঁয়ে একটা গাছে এই নতুন পাতা দেখে আর লোভ সম্বরণ ক'রতে পারলাম না। ভাবলাম, রামচাঁদের বাড়ী কাল গেলেও চ'লবে, আজ তো বেলপাতা নিয়ে গিয়ে শিবপূজো করি গে।

ধনী জিজ্ঞাসা করে, তা কি তখনি পূজো ক'রতে বসলেন ?

চন্দ্রমণি চোখ দুটো বিস্ফারিত ক'রে বলে, আবার ব'সবে না! যে মানুষ দশ ক্রোশ পথ এগিয়ে গিয়ে শিবপূজোর জন্যে দুটো বেলপাতা নিয়ে ফিরে আসে, সে আবার পূজোয় না ব'সে ছাড়ে!

প্রসন্ন উদাস কণ্ঠে বলে, তবে! সে মানুষ গদাধরকে দেখে তোমাদের কথা যদি ভুলে গিয়ে থাকে তাতে আর আশ্চর্য্য হবার কি আছে ?

চন্দ্রমণি বিষণ্ণ কণ্ঠে বলে, আশ্চর্য্য আমি হচ্ছি নে লো, তবে ভাবনা তো হয়। বিদেশ-বিভুঁই, যদি কিছু হয়...ব'লতে ব'লতে কণ্ঠ রোধ হ'য়ে আসে। চোখ দুটো ছল ছল ক'রে ওঠে।

ধনী সান্ত্বনা দিয়ে বলে, ভেব না গো, ভেব না। ওসব মানুষকে দেবতা রক্ষা করেন। ব'লেই দাঁড়িয়ে ওঠে। প্রসন্নও ধনীর সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ায়।

চন্দ্রমণি ব্যস্ত হ'য়ে বলে, ওমা! উঠ্‌লি কেন লো ? ব'স ব'স।

ধনী যাবার জন্যে প্রস্তুত হ'য়ে বলে, আর ব'সবো না বৌদি! আমায় আবার দীঘি থেকে খাবার জল আনতে হবে।

প্রসন্ন বলে, বেলা প'ড়ে এল, আমিও যাই খুড়ি। ব'লে উভয়ে বেরিয়ে আসে।

দশ

দেখতে দেখতে গয়ায় ক্ষুদিরামের মাস প্রায় পূর্ণ হ'য়ে আসে। সেও অবশ্য নিষ্ক্রিয় হ'য়ে ব'সে থাকে না। ক্ষেত্রকর্ম্মাদি শেষ ক'রে নেয়। বিষ্ণুপাদপদ্মে পিণ্ডদান শুধু বাকী থাকে।

সেদিন নীলপূজো। বাংলাদেশে গাজনের উৎসব শুরু হ'য়ে গেছে। বিষ্ণুপাদপদ্মে পিণ্ডদানের জন্য ক্ষুদিরাম অতি প্রত্যুষেই স্নান ইত্যাদি সেরে প্রস্তুত হ'য়ে যায়।

ক্ষুদিরাম প্রস্তুত হ'য়ে নিজেই পাণ্ডাঠাকুর ঘরে ঢুকে বলে, ক্যা বাবুজী! আপ্ বিষ্ণুজীকা মন্দিরমে যানে কে লিয়ে তৈয়ার হো গেয়ী তো?

এই পাণ্ডাটির বিনম্র ব্যবহারে ক্ষুদিরামের মনটা আগে থেকে মুগ্ধ হ'য়ে আছে। মানুষটা ধর্ম্মকে শুধু ব্যবসা হিসাবেই গ্রহণ করে নি। এটাকে সে কর্ম্মরূপ যোগ ব'লে গ্রহণ করেছে। তাই ফাঁকি বা প্রবঞ্চনা তার কাজে বা কথায় কোথাও নেই। এবং ক্রিয়া-কর্ম্মাদি সম্বন্ধে জ্ঞানও প্রচুর। শ্রাদ্ধ, সপিণ্ডকরণ, ফল্গুতীরে পিণ্ডদান থেকে আরম্ভ ক'রে বিভিন্ন যোনিতে পিণ্ডদান নিখুঁতভাবে করিয়েছে। অন্যান্য পাণ্ডাদের মত দেনা-প্রাওনা নিয়ে কোন রকম গোলমাল করেনি। শুধু তাই নয়, তার বাড়ীতে আশ্রয় দিয়ে সব সময় খোঁজ নেওয়া, এমনকি বাড়ীর লোককে দিয়ে উচ্ছিষ্ট বাসন মাজিয়ে, জল পর্য্যন্ত তুলিয়ে দিয়েছে।

পাণ্ডার কথায় ক্ষুদিরাম ঘাড় নেড়ে প্রশান্ত কণ্ঠে বলে, হ্যাঁ আমি প্রস্তুত।

পাণ্ডা যাবার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে বলে, তব আইয়ে। নেহী তো মন্দির মে আচ্ছা জায়গা মিলনেমে তকলিফ্ হোগা।

ক্ষুদিরাম পাণ্ডাকে অনুসরণ ক'রে যেতে যেতে বলে, বিষ্ণুপাদপদ্মে পিণ্ড দিতে যা' যা' লাগবে সে সব নিয়েছেন তো ?

পাণ্ডা এগিয়ে যেতে যেতে বলে, সব লে লিয়া। ব'লে তার হস্তস্থিত পুঁটলিকরা গামছাটা ক্ষুদিরামকে দেখায়।

পাণ্ডার পিছু পিছু ক্ষুদিরাম মন্দিরের দরজায় এসে দাঁড়ায়। মনটা এক অপূর্ব্বভাবে সমাহিত হ'য়ে যায়।

গদাধরের পাদপদ্মে পূজা দিবার জন্য তখন পুণ্যালোভাতুরের বেশ সমাগম হ'য়েছে এবং স্থানটাও কোলাহলে মুখর হ'য়ে উঠেছে। ক্ষুদিরামের কাণে সে কোলাহল আর ঢোকে না। সে ভাব-সমাহিত চিত্তে পাণ্ডার পিছু পিছু মন্দির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে।

পাণ্ডা গদাধরের ঠিক সম্মুখে বিষ্ণুপাদ কুণ্ডের ধারে গিয়ে বসে ও ক্ষুদিরামকেও বসায়। তারপর গামছাস্থিত জিনিসগুলো সব বার করে। পিণ্ডাদি ক্রিয়ার জন্য প্রস্তুত হ'তে হ'তে ক্ষুদিরামকে বলে, আপ পূজা উজা সার লিজিয়ে।

ক্ষুদিরাম আর দ্বিরুক্তি না ক'রে আচমন ক'রে নিয়ে আপন ইষ্টদেবতার পূজায় বসে ও ধ্যানস্থ হ'য়ে যায়।

পাণ্ডা একটা কলাপাতায় আটা, দুধ, কলা, তিল, মধু, ঘৃত ইত্যাদি সাজিয়ে রাখে। অন্য একটি পাতায় ফুল, তুলসী, বিল্বপত্র, কুশও গুছিয়ে রাখে ও দুটি কুশাঙ্গুরী তৈয়ার ক'রতে থাকে।

ক্ষুদিরামের পূজা শেষ হ'য়ে গেলেও ধ্যান ভাঙ্গে না। জনসমাগম দেখে পাণ্ডা চঞ্চল হ'য়ে ওঠে! একটু ইতস্ততঃ ক'রে ডাকে, বাবুজী, বাবুজী!

পাণ্ডার আহ্বানে ক্ষুদিরামের ধ্যান ভেঙ্গে যায়। আঁখি উন্মোচন ক'রে সলজ্জ কণ্ঠে বলে, এ্যাঁ...

পাণ্ডা ঈষৎ কুণ্ঠার সঙ্গে বলে, আপ্‌কা পূজা হো গেয়ী ? হামভি তৈয়ার হো গেয়ী। ব'লে পিণ্ডটা মাখার নির্দ্দেশ দেয়। ক্ষুদিরাম দুধ,

কলা ইত্যাদি দিয়ে আটার পিণ্ড মেখে নেয় ও পূর্ব্বপুরুষের জন্য কয়েকটা ভাগও করে।

পাণ্ডা ক্ষুদিরামকে একটা ভাগ তুলে নিতে বলে। ক্ষুদিরাম তুলে নেয়। পাণ্ডা ভাবগম্ভীর কণ্ঠে বলে, কহিয়ে—ওঁ—বিষ্ণু বিষ্ণু তৎসত্ব্যদ চৈত্র মাসে শুক্ল পক্ষে পূর্ণিমা তিথোও কাশ্যপ গোত্রস্থ ৺মাণিকরাম দেব-শর্ম্মণঃ ন্যাস্ততে শুপকরণঃ পিণ্ডং সদা। ব'লে পিণ্ডটা কুণ্ডের ভিতর বিষ্ণুপাদপদ্মে নিক্ষেপ করার নির্দ্দেশ দেয়।

পাণ্ডার কথামত ক্ষুদিরাম বিষ্ণুপাদপদ্মে নিক্ষেপ করে। একে একে প্রপিতামহের ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ নরহরি মণ্ডলের আত্মার উদ্দেশে পর্য্যন্ত পিণ্ড দেয়।

পিণ্ড দিতে দিতে ভাবে সমাহিত হ'য়ে যায়। যেন স্পষ্ট দেখতে পায় ছায়ামূর্ত্তিতে তার পিতা থেকে প্রপিতামহ সবাই প্রশান্ত মূর্ত্তিতে এসে দাঁড়িয়েছে এবং হাত তুলে তাকে আশীর্ব্বাদ ক'রছে।

ক্ষুদিরাম বার বার পিতৃপুরুষদিগের উদ্দেশ্যে মাথা নত ক'রে প্রণাম করে। একটা অভূতপূর্ব্ব আনন্দ ও তৃপ্তিতে অন্তরটা ভ'রে যায়। মনে হয় তার যেন সব কাজ এবং কর্ত্তব্য আজ শেষ হ'ল। এখন মৃত্যুতেও আর কোন দুঃখ বা ক্ষোভ নেই।

ক্ষুদিরামকে প্রায় সমাধিস্থ হ'য়ে যেতে দেখে পাণ্ডা নীরবে উঠে আসে। ক্ষুদিরাম জানতেও পারে না—ভাবসমাহিত চিত্তে ব'সে থাকতে থাকতে সহসা দেখে, গদাধরের মন্দির আলোয় উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠ্‌ছে। সেই সঙ্গে পূর্ব্বপুরুষদিগের ছায়ামূর্ত্তিগুলি সম্ভ্রম শ্রদ্ধায় করজোড়ে মন্দিরাভ্যন্তরে গদাধরের উদ্দেশ্যে প্রণাম ক'রছে। আর প্রস্তরনির্ম্মিত গদাধর যেন জীবন্ত হ'য়ে উঠছে। ক্ষুদিরামের সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হ'য়ে ওঠে। বাহ্যজ্ঞানলুপ্ত হবার মত হয়। নয়ন বিগলিত হ'য়ে ধারা নামে। বার বার গদাধরের উদ্দেশ্যে প্রণাম করে, আর ক্রন্দন-বিজড়িত কণ্ঠে বলে, প্রভু, তোমার অসীম করুণা। জীবন আমার ধন্য হ'ল।

কিন্তু ক্ষুদিরামকে আরো বিস্মিত ও রোমাঞ্চিত ক'রে মূর্ত্তিটা মৃদু মৃদু হাসতে হাসতে কাছে এসে বলে, ক্ষুদিরাম, তোমার পূজায় আমি পরম তুষ্ট হ'য়েছি। আমার একান্ত বাসনা পুত্ররূপে তোমার ঘরে জন্মগ্রহণ করি এবং প্রতিদিন তোমার সেবা নিই।

বিস্ময়ে, আনন্দে, ব্যথায় ক্ষুদিরাম স্তম্ভিত হ'য়ে যায়। বাক্‌শক্তি হারিয়ে ফেলে। কি যে ক'রবে আর কি যে ব'লবে ভেবে পায় না। বিশ্বাস ক'রতে পারে না—দেবতা নররূপে জন্মগ্রহণ ক'রবে! আর তারই গৃহে! একি সম্ভব! না গদাধর ছলনা ক'রছে!

তাকে নীরব দেখে গদাধর আবার বলে, তোমার সম্মতি আছে তো?

ক্ষুদিরাম আর আত্মসম্বরণ ক'রতে পারে না। আনন্দ ও আবেগে হাউ হাউ ক'রে কেঁদে ফেলে। কাঁদতে কাঁদতে বলে, প্রভু, আমি দীন দরিদ্র। আমারই দু'বেলা অন্নের সংস্থান হয় না। কি দিয়ে তোমার সেবা ক'রব?

গদাধর তেমনি প্রশান্ত কণ্ঠে মধুর হাসি দিয়ে যেন বলে, তুমি অমত ক'রো না ক্ষুদিরাম। যা দিয়েই আমার সেবা কর না কেন আমি তাতেই তুষ্ট হব।

ক্ষুদিরাম আনন্দে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে, প্রভু, তোমার অসীম করুণা, অসীম করুণা।

ক্ষুদিরামের স্বীকৃতির সঙ্গে সঙ্গে গদাধরের অঙ্গ থেকে একটা আলোর জ্যোতিঃ ঘূর্ণাবর্ত্তাকারে মন্দির থেকে বেরিয়ে যায়। আর সেই জীবন্ত মূর্ত্তি আবার শিলায় রূপান্তরিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদিরামের সম্বিত ফিরে আসে। আঁখি উন্মোচন ক'রে ব্যাকুল দৃষ্টিতে চায়। মন্দিরে তখন দর্শনার্থীদের কোলাহল থেমে এসেছে। বিরাজ ক'রছে মধ্যাহ্নের স্তব্ধতা। শিলামূর্ত্তি নিশ্চল হ'য়ে সিংহাসনে দাঁড়িয়ে আছে।

ক্ষুদিরাম শুধু বিহ্বল হ'য়ে ভাবে, স্বপ্ন না সত্য!

এগার

চন্দ্রমণি তুলসীতলায় সন্ধ্যাপ্রদীপ দিয়ে প্রণাম সেরে উঠতেই ধনী বাড়ীর ভিতর ঢুকে বলে, বৌদি, আমায় ডেকেছ কেনে গো ?

চন্দ্রমণি গলার আঁচলটা নামিয়ে দিয়ে বিস্মিত কণ্ঠে বলে, ওমা ! শোন কথা, তোকে আমি পর্‌শুদিনই বলেছি, ধনী, তোকে নিয়ে নীলের ঘরে বাতি দিতে যাব।

চন্দ্রমণির কথায় ধনী কুণ্ঠিত হ'য়ে ওঠে। সলজ্জকণ্ঠে বলে, ওমা ! তাই তো···আমি একেবারে ভুলে গেছি, তা এখনই যাবে নাকি ?

চন্দ্রমণি প্রদীপ নিয়ে ঠাকুরঘরের দিকে এগুতে এগুতে বলে, আবার কখন যাব লো ? সন্ধ্যেবেলায় তো নীলের ঘরে বাতি দেয়।

ধনী একটু ইতস্ততঃ ক'রে কুণ্ঠার সঙ্গে বলে, আমার তো মনে ছিল না বৌদি। তাই উনুনে ধান সিদ্ধ ক'রতে দিয়ে এসেছি, যাই—হাড়িটা নামিয়ে রেখে আসি। বলার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়ায়।

চন্দ্রমণি প্রদীপটা ঠাকুরঘরে রেখে রঘুবীরকে প্রণাম করে। তারপর দাওয়ায় এসে ধনীকে লক্ষ্য ক'রে বলে, বেশী দেরী করিস্‌নে যেন।

ধনী বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে যেতে যেতে ঈষৎ চীৎকার ক'রে বলে, যাব আর আসবো।

ধনী চ'লে যায়। চন্দ্রমণি আবার ঠাকুরঘরে এসে ঢোকে। রঘুবীরের সন্ধ্যারতির আয়োজন যদিও ইতিপূর্ব্বে ক'রে রেখেছে তবু আর একবার ভাল ক'রে দেখে। তারপর রন্ধনরতা পুত্রবধূর উদ্দেশ্যে বলে, বৌমা, রামকুমার পূজায় ব'সলে তুমি এসে একটু দাঁড়িও। আমি নীলের ঘরে বাতি দিতে যাচ্ছি !

পুত্রবধূ রান্নাঘর থেকে সাড়া দিয়ে বলে, আচ্ছা মা।

চন্দ্রমণি আর কিছু না ব'লে নীলপূজার জন্য ফলমূল একটা রেকাবিতে সাজিয়ে রাখে। তারপর নীলের ঘরে বাতি দিবার জন্যে একটা ঘৃতের প্রদীপ তৈয়ারী করে।

ইতিমধ্যে রামেশ্বর কৌতূহলী হ'য়ে ঠাকুরঘরের দরজায় এসে দাঁড়ায়। মার উপর ডাগর আঁখি ফেলে আব্দারের সুরে বলে, মা, আমি তোমার সঙ্গে যাব।

রামেশ্বরের কণ্ঠস্বরে চন্দ্রমণি চমকে ওঠে। তন্ময়তা টুটে যায়। পুত্রের দিকে স্নেহকরুণ দৃষ্টিতে চেয়ে অনুরোধ ক'রে বলে, না বাবা, সন্ধ্যে হ'য়ে গেছে, এখন আর যায় না।

মার কথায় রামেশ্বরের মুখখানা ভার হ'য়ে ওঠে। ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলে, সন্ধ্যে হ'য়ে গেছে তাই কি?

চন্দ্রমণি সান্ত্বনা দিয়ে বলে, আমার ফিরতে হয়তো দেরী হবে। সারাদিন উপোস ক'রে আছি। তা ছাড়া ঠাকুরের আরতি হয় নি। তোমার দাদা এখনি হয়তো আরতি ক'রতে ব'সবে। তুমি আমার সঙ্গে গেলে কাঁসর বাজাবে কে?

রামেশ্বরের সঙ্গে কথা ব'লতে ব'লতে ধনী ঘুরে আসে। উঠানে দাঁড়িয়ে চন্দ্রমণির উদ্দেশ্যে বলে, কৈ গো বৌদি, হ'ল?

ধনীর সাড়া পেয়ে চন্দ্রমণি ব্যস্ত হ'য়ে ওঠে। ফলের রেকাবিটা নিয়ে তাড়াতাড়ি দাওয়ায় বেরিয়ে আসে। ধনীকে লক্ষ্য ক'রে বলে, ফলের রেকাবিটা তুই নে। আমি দুধ গঙ্গাজল নিয়ে আসি। ধনী রেকাবিটা ধরে। চন্দ্রমণি ঘরে ঢুকে কমণ্ডলুতে গঙ্গাজল, দুধ ও ঘৃতের প্রদীপ নিয়ে বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে আসে। আর রামেশ্বর অভিমানে ছল ছল চোখে আবার পাঠ্যপুস্তকে মনোনিবেশ করে।

সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে। তবে পূর্ণিমা রাত। চাঁদের আলো অন্ধকারকে নিবিড় হ'তে দেয়নি। পথ-প্রান্তর বেশ দেখা যাচ্ছে, সেই সঙ্গে ঝির্ ঝির্ ক'রে ব'য়ে চ'লেছে বসন্তের স্নিগ্ধ শীতল মৃদু বাতাস।

কোকিল তাই মুখর হ'য়ে উঠেছে। তার আর্ত্তকণ্ঠের ডাকে চন্দ্রমণির মনে কি যেন একটা ভাব ঘনিয়ে ওঠে। অন্তরটা সেই ভাবে বিভোর হ'য়ে যায়। সংসার, পুত্র, কন্যা, ভাবনা চিন্তা সব যেন লুপ্ত হ'য়ে আসে। মনটা আনন্দ ও বেদনার অতীতে চ'লে যায়। জন্ম আর মৃত্যু সব যেন কি এক ভাব এসে গ্রাস করে। সেই মুহূর্ত্তে মনে হয় তার যেন কোন দুঃখ নেই, সুখ নেই, কামনা নেই, বাসনা নেই, চাওয়া নেই, পাওয়া নেই— অনুভূতিগুলি পর্য্যন্ত লুপ্ত হ'য়ে গেছে। সারা জীবন সে বারব্রত পূজা-পাঠ ক'রে আসছে, বার মাসে তের পার্ব্বণ লেগেই আছে এবং সব কিছুই নিষ্ঠা ও বিশ্বাস নিয়ে করে, আর সেই বিশ্বাসের জন্য মাঝে মাঝে দু' একটা অলৌকিক ঘটনাও তার জীবনে ঘ'টে গেছে। গত আশ্বিন মাসে কোজাগরী পূর্ণিমার দিন স্বয়ং মা লক্ষ্মী রামকুমারের জন্য ব্যাকুল হ'তে দেখে মানবীর বেশে তাকে রামকুমারের কুশল দিয়ে চ'লে গেছে। রামকুমার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হ'য়ে যখন সে অপরূপ বিবিধ অলঙ্কারে ভূষিতা যুবতী মেয়েটির খোঁজ নিতে গেছে তখন লক্ষ্মী তাকে ছলনা ক'রে হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য হায় হায় ক'র্‌ছে। অনুতাপ করছে। কিন্তু আজিকার মত এইভাবে তার চিত্ত বিভোর হ'য়ে ওঠে নি। স্থূল অনুভূতির উপর এমন আর কোনদিন বিস্মৃতির যবনিকা নামে নি। এ যেন এক অভূতপূর্ব্ব ভাব, যা ইতিপূর্ব্বে সে কোনদিন অনুভব করেনি।

চন্দ্রমণিকে নীরবে যেতে দেখে ধনীও কিছু বলে না। ভাবে, মানুষটা সারাদিন উপোস ক'রে আছে তাকে আর না বকানোই ভাল।

যুগীদের শিবমন্দির বাড়ী থেকে বেশী দূর নয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই শিবমন্দিরের সম্মুখে এসে পড়ে। কিন্তু আর এগুতে পারে না। সেখান থেকেই চন্দ্রমণি দেখে, মন্দিরাভ্যন্তর থেকে একটা আলোর জ্যোতিঃ ঘূর্ণাবর্ত্তাকারে বেরিয়ে তার দিকে ছুটে আসছে। ভয়ে আর বিস্ময়ে শিউরে ওঠে, ধনীকে ব'লতে যাবে কিন্তু আর ব'লতে পারে না! মুখ

ব্যাদন করার সঙ্গে সঙ্গে সেই আলোর জ্যোতিঃ জলোচ্ছ্বাসের মত এসে তাকে অভিভূত ক'রে ফেলে। নিঃশ্বাস যেন রোধ হ'য়ে আসে। চৈতন্য বিলুপ্ত হয়, জ্ঞান হারিয়ে সেখানে লুটিয়ে পড়ে।

চন্দ্রমণিকে পথিমধ্যে এমন ভাবে অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়ে যেতে দেখে ধনীও ভয়ে বিহ্বল হ'য়ে যায়। কি যে ক'রবে ভেবে পায় না। কয়েক মুহূর্ত্ত কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর চন্দ্রমণির উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি ফেলে আর্ত্ত কণ্ঠে ডাকে, বৌদি, ও বৌদি!

ডাকে বটে কিন্তু সাড়া পায় না। ধনী আর ইতস্ততঃ না ক'রে সেই ধূলার উপরেই ব'সে পড়ে। চন্দ্রমণির মাথাটা কোলের উপর তুলে নেয়। শিবপূজোর জন্য আনীত কমণ্ডলুর জল নিয়ে চোখেমুখে ঝাপ্‌টা দেয়। আঁচল দিয়ে হাওয়া করে।

দু'চারবার জলের ঝাপটা দিতে ও হাওয়া ক'রতে ক'রতে চন্দ্রমণির জ্ঞান হয়। আঁখি উন্মোচন ক'রে কাতর কণ্ঠে বলে—মা!

চন্দ্রমণির জ্ঞান ফিরতে দেখে ও মাতৃ আহ্বান শুনে ধনী উৎফুল্ল হ'য়ে উঠে। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে, ও বৌদি! হঠাৎ এমন বেহুঁস হ'য়ে প'ড়লে কেন বলো তো? আমি তো বাপু ভয়ে মরি।

চন্দ্রমণি কোন জবাব না দিয়ে ধীরে ধীরে উঠে বসে। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ক্লান্তিভরে বলে, দাঁড়া সব ব'লছি।

ধনী পথের উপর থেকে উঠে দাঁড়ায়। চন্দ্রমণির দিকে চেয়ে বলে, তোমার আর মন্দিরে গিয়ে কাজ নেই বাপু। তুমি এখানে ব'স। মন্দিরে আমি তোমার পূজো দিয়ে আসছি। চন্দ্রমণিকে আর কোন কথা বলার অবকাশ না দিয়ে ফলের রেকাবী ও জলের কমণ্ডলু নিয়ে মন্দিরের দিকে এগিয়ে যায়।

চন্দ্রমণি একই ভাবে ব'সে থাকে। ক্লান্তি আর অবসাদে উঠে দাঁড়াতে পারে না বা ইচ্ছাও করে না। কি যেন একটা ভাবে মনটা নিষ্ক্রিয় হ'য়ে

যায়। সব ভাবনায় বিলুপ্তি ঘনায়। তবে চন্দ্রমণি বেশ বুঝতে পারে—সেই আলোর জ্যোতিটা তার উদরের মধ্যে প্রবেশ ক'রে আছে এবং পুত্র-সম্ভাবনা হ'লে স্ত্রীলোকের দেহের ও মনের যেরূপ অবস্থা হয় তার অবস্থা সেইরূপ।

ধনীর পদধ্বনি শুনে চন্দ্রমণি স্থূল জগতে ফিরে আসে। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। কিন্তু বেশ দুর্ব্বল বোধ করে। পা দু'খানা ট'লতে থাকে। মনে হয় একটা অবলম্বন পেলে ভাল হয়।

চন্দ্রমণিকে দাঁড়িয়ে ট'লতে দেখে ধনী তাড়াতাড়ি এসে সাপটে ধরে। ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, শরীর কি খুব খারাপ লাগছে ?

ধনীর কথায় চন্দ্রমণি লজ্জা পায়। দুর্ব্বলতা ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করে। ক্ষীণ কণ্ঠে বলে, হ্যাঁ—কিন্তু এমন তো কোনদিন হয় না।

ধনী সান্ত্বনা দিয়ে বলে, শরীরগতিক কি আর সবদিন সমান থাকে। তা হঠাৎ কি হ'ল বলো দেখি ? পথের মাঝখানে এমন বেহুঁস হ'য়ে প'ড়লে কেন ?

চন্দ্রমণি বাড়ীর পথে পা বাড়িয়ে দিয়ে বলে, চ' যেতে যেতে সব ব'লছি।

ধনী আর কোন কথা না ব'লে চন্দ্রমণিকে ধ'রে নিয়ে এগিয়ে চলে।

চন্দ্রমণি যেতে যেতে বলে, মন্দিরের কাছে আসতেই একটা আশ্চর্য্য জিনিষ দেখলাম ধনী।

চন্দ্রমণির কথা শুনে বিস্ময়ে আর উৎকণ্ঠায় ধনীর চোখ দুটো ডাগর হ'য়ে ওঠে। ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, কি—কি ?

চন্দ্রমণি একটু হাঁপ নিয়ে বলে, মন্দিরের কাছে যেই গেছি সেই দেখি কি—মন্দিরের ভিতর থেকে একটা আলোর জ্যোতিঃ ঝড়ের বেগে ঘুরতে ঘুরতে এসে আমাকে ছেয়ে ফেললো। তোকে ঘটনাটা ব'লতে যাব কিন্তু তার আগেই বেহুঁস হ'য়ে গেলাম।

চন্দ্রমণির কথা শুনে ধনীর বিস্ময় কেটে যায়। তাচ্ছল্যের সঙ্গে বলে, ও কিছু না। আমার মনে হ'চ্ছে কোন অপদেবতার হাওয়া টাওয়া লেগেছে। একটু দম নিয়ে আবার বলে, যাই হোক বাপু, আজ অবশ্য উপোস, খাওয়া দাওয়ার বালাই নেই। কিন্তু একটা রোজা-টোজা দেখানো ভালো। বলা তো যায় না, কি থেকে কি হয়।

চন্দ্রমণি সে কথার কোন জবাব না দিয়ে বলে, কিন্তু আমার কি মনে হ'চ্ছে জানিস ধনী! ঐ আলোটা যেন আমার পেটের মধ্যে ঢুকে আছে। আর……কথাটা শেষ না ক'রে সহসা চুপ ক'রে যায়।

ধনীর কৌতূহল আবার বেড়ে ওঠে। উৎকণ্ঠার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে, আর কি ?

চন্দ্রমণি একটু ইতস্ততঃ করে। তারপর সলজ্জ কণ্ঠে বলে, আর ছেলেপুলে পেটে এলে মেয়েদের যেমন দেহের ও মনের অবস্থা হয় আমারও ঠিক তাই হ'চ্ছে।

চন্দ্রমণির কথা শুনে ধনীর কৌতূহল কমে বটে কিন্তু উৎকণ্ঠা বেড়ে ওঠে। তাই চন্দ্রমণির কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বলে, আমি যা' ভেবেছি ঠিক তাই। যাই হোক বাপু, এ কথা আর কাউকে ব'ল না। আর একটা রোজা-টোজা দেখাও। ব'লতে ব'লতে উভয়ে বাড়ীর ভিতর ঢোকে। ধনী রামকুমারের স্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলে, বৌমা! তোমার শাশুড়ীকে ধ'রে ঘরে নিয়ে যাও গো।

ধনীর চীৎকারে রামকুমার ও তার স্ত্রী উভয়েই ছুটে আসে। রামকুমার গভীর উৎকণ্ঠার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে, কেন কি হ'য়েছে ?

ধনী চন্দ্রমণিকে রামকুমারের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, শিব মন্দিরের সমুখে প'ড়ে গিয়ে অজ্ঞান হ'য়ে গেছিল। সারাদিন উপোস ক'রে আছে। তার উপরে সংসারের খাটাখাটুনী……

রামকুমার ব্যস্ত হ'য়ে মাকে জড়িয়ে ধরে। ঘরের দিকে নিয়ে যেতে যেতে জিজ্ঞাসা করে, ক'ব্‌রেজ মশায়কে কি খবর দেবো ?

চন্দ্রমণি উপেক্ষা ভরে বলে, না বাবা, একটা ঘুম দিলেই শরীর ঠিক হ'য়ে যাবে। তারপর নিজের মনেই যেন বলে, কেন যে এমন হ'ল!

রামকুমার সে কথার কোন জবাব না দিয়ে মাকে নিয়ে শোবার ঘরে ঢুকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে বলে, চুপ ক'রে শুয়ে ঘুমোও দেখি। ব'লে চন্দ্রমণিকে আর কোন কথা বলার অবকাশ না দিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে। আর ধনী রামকুমারের স্ত্রীর কাছে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে আসে।

বার

চন্দ্রমণি শোয় বটে কিন্তু ঘুমাতে পারে না। বার বার শুধু আজকের ঘটনাটা নানা ভাবনা নিয়ে মনের মধ্যে জটলা পাকাতে থাকে। তবে সে যে আবার পুত্রবতী হ'তে চলেছে এ চিন্তাটা কিছুতেই মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারে না। বেশ বুঝতে পারে ভ্রূণের অস্তিত্ব, সে যে সন্তানের জননী। পুত্র-সম্ভাবনার অনুভূতিগুলো তার অজানা নেই। উপবাসে সে কোনদিনই কাতর হয় নি বা হয় না। আর ইদানীং একবেলা উপবাস তো নিত্য নৈমিত্তিকের ঘটনা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। প্রায় দিনই মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় অতিথি, ফকির, কেউ না কেউ এসে দাঁড়ায়, আর সেও তার মুখের ভাতগুলো ধ'রে দেয়। এই নিয়ে পুত্রবধূ বেশ অসন্তুষ্টও হয়। অনুযোগ করে। এমন কি রামকুমারকে পর্য্যন্ত জানিয়েছে। তাই নিয়ে রামকুমারও অনুযোগ ক'রে ব'লেছে, মা, তুমি নাকি প্রায়দিনই দুপুর বেলা খাও না। মুখের ভাত একে ওকে ধ'রে দাও! না না—এ ভাল নয়। এমন ক'রলে কদিন বাঁচবে। সে আবোল তাবোল কৈফিয়ৎ দিয়ে পুত্রকে শান্ত ক'রেছে। তা ছাড়া ষষ্ঠীপূজা, লক্ষ্মীপূজা, অমাবস্যা-পূর্ণিমা,

বার-ব্রত এই নিয়ে উপবাস তো তাকে প্রায়ই ক'রতে হয়। আর এই উপবাসে সে কষ্ট বোধও করে না বা গৃহকর্ম্মে ক্লান্তিও অনুভব করে না। কিন্তু আজকে···প্রথম সন্তান-সম্ভবা যেদিন সে হ'য়েছিল তেমনি ক্লান্ত এবং অবসাদগ্রস্ত বোধ করে, সেই সঙ্গে বোধ করে মাতৃত্বের রোমাঞ্চ ও শিহরণ। অবশ্য এই অনুভূতিব মধ্যে কোন যুক্তি বা আস্থা খুঁজে পায় না। তবু ভুলতেও পারে না বা চিন্তাটাকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলতেও পারে না। বরং মন্দির থেকে ফিরে এসে এই পর্য্যন্ত ঐ ভাবটা তাকে একেবারে আচ্ছন্ন ক'রে আছে ও বদ্ধমূল হ'য়ে আসছে। ধনীর কথায় কিছুতেই আস্থা স্থাপন ক'রতে পারছে না। অপদেবতা তার দেহে প্রবেশ ক'রবে একি কখনও হ'তে পারে! বিশেষ আজকের দিনে। কোন অনাচার তো সে করেই নি! তার উপর উপবাসে শুদ্ধ দেহ ও মনে, আর এমন জ্যোৎস্না প্লাবিত সন্ধ্যায়। তা ছাড়া যে জ্যোতিঃ সে দেখেছে ও তাকে অভিভূত ক'রে চৈতন্য হরণ ক'রেছে, সে জ্যোতিঃ কোন অপদেবতার হ'তে পারে না। আর হ'লেও দেবালয় থেকে ঝড়ের বেগে ছুটে আসতো না। তবে কি···যেমন সে তার স্বামীর মুখে শুনেছে কোন অবতার গর্ভে আসার পূর্ব্বে বিবিধ অলৌকিক ঘটনার মধ্য দিয়েই আসে। তবে কি তার গর্ভে কোন অবতার প্রবেশ ক'রলে? পরমুহূর্ত্তেই আবার ভাবে—না না, এ হ'তে পারে না—দেবতা তার গর্ভে আসবে কেন? কি এমন পুণ্যকাজ ক'রেছে যে সে দেবতার জননী হবে? আর তাদের মতন দরিদ্রের ঘরে, যাদের নিজেদেরই দু'বেলা নির্ভাবনায় দু'মুঠো অন্নের সংস্থান হয় না, এমন ঘরে আসবে কেন? ভাবনা বেড়েই চলে কিন্তু রহস্য আর উদঘাটন হয় না।

পরিশেষে ভাবে—যাক্ গে, স্বামী গয়া থেকে ফিরে এলে তাঁকে সব ব'লবে। তিনি হয় তো শুনে আদি রহস্যটা উদঘাটন ক'রে দিতে পারবেন। এবার ঘুমোনো যাক। ঘুমালে শরীরও সুস্থ হবে, আর ভাবনাও দূর হবে। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে পাশ ফিরতেই রামেশ্বর

ঘরে এসে ঢোকে। চন্দ্রমণি আবার ঘোরে। রামেশ্বরের দিকে চেয়ে ক্লান্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করে, খাওয়া দাওয়া হ'য়েছে বাবা ?

রামেশ্বরের অভিমান তখনও যায় নি। তাই সাধ্যমত গম্ভীর ভাবে বলে, হ্যাঁ।

রামেশ্বরের কথা বলার ধরণ দেখে চন্দ্রমণির অধরে একটু মৃদু হাসির রেখা ফুটে ওঠে। তাই সান্ত্বনার ছলে বলে, বাবা! ছেলের রাগ দেখছি এখনও যায় নি। তা বাবা, আমার সঙ্গে যাওনি ভালই ক'রেছ। গিয়ে আমায় বেহুঁস হ'য়ে প'ড়ে যেতে দেখে কেঁদে কেটে একটা অনাছিষ্টি কাণ্ড ক'রে ব'সতে। শেষে তোমাকে সামলানো দায় হ'ত।

রামেশ্বর শয্যার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বলে, এখন তো ঐ সব কথা ব'লবেই। ব'লে শয্যায় উঠে বসে।

চন্দ্রমণি ব্যস্ত হ'য়ে অনুরোধ ক'রে বলে, দরজাতে একেবারে খিল দিয়ে আর আলোটা নিভিয়ে দিয়ে শোও বাবা। আমি আর উঠতে পাচ্ছিনে।

রামেশ্বর আবার শয্যা থেকে নেমে দরজার কাছে আসে। খিল দিতে যাবে এমন সময় রামকুমার আহার সেরে মার খোঁজ নিতে আসে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ডাকে, মা!

চন্দ্রমণি ব্যস্ত হ'য়ে উঠে বসে। ক্লান্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করে, কি বাবা ?

চন্দ্রমণিকে উঠে ব'সতে দেখে রামকুমার ব্যস্ত হ'য়ে বলে, উঠলে কেন ? শোও শোও। আমি এমনি জানতে এলাম—এখন কেমন বোধ ক'রছ ?

রামেশ্বরের আর খিল দেওয়া হয় না, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে।

রামকুমার তার দিকে চেয়ে গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করে, তুই এখানে দাঁড়িয়ে আছিস্ কেন ?

রামেশ্বর জবাব দিবার আগেই চন্দ্রমণি বলে, ও দরজায় খিল দিতে যাচ্ছিল এমন সময়······

রামকুমার মার কথায় বাধা দিয়ে বলে, আচ্ছা আচ্ছা। আমি শুধু জানতে এলাম···যাক্ গে—কোন কষ্ট-টষ্ট হ'চ্ছে না তো ?

চন্দ্রমণি বলে, না বাবা।

মার কথায় রামকুমার আশ্বস্ত হ'য়ে রামেশ্বরের দিকে চেয়ে বলে, নে --দরজা বন্ধ কর। ব'লে চ'লে যায়।

রামেশ্বর দরজায় খিল দিয়ে ও প্রদীপ নিভিয়ে আবার বিছানায় এসে ওঠে।

চন্দ্রমণি আগের কথার জের টেনে এবং রামেশ্বরের অভিমান ভেঙ্গে দিবার জন্য প্রলুব্ধ ক'রে বলে, এবার যেদিন বিশালাক্ষীর মন্দিরে যাবো সেদিন তোমাকে নিয়ে যাবো।

রামেশ্বর শয্যায় দেহ এলিয়ে দিয়ে ঘুমকাতর কণ্ঠে বলে, ব'ল তো, কিন্তু নিয়ে যাবার বেলায় নানা ধানাই-পানাই কর।

চন্দ্রমণি বেশ জোর দিয়েই বলে, না না—ঠিক নিয়ে যাবো।

রামেশ্বর আর কোন জবাব দেয় না।

চন্দ্রমণি বুঝতে পারে রামেশ্বরের ঘুম পেয়েছে। তাই সেও আর কিছু বলে না। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চোখ বুজে ঘুমাবার চেষ্টা করে। কিন্তু ঘুম সহসা আসে না। বাহিরে পুত্রবধূর চলাফেরার শব্দ বেশ শুনতে পায়। ছেলেমানুষ, তার উপরে একা হাতে সব কাজ ক'রতে হ'চ্ছে। তাই এখনও সেরে উঠতে পারে নি। ও বেচারার শুতে শুতে রাত অনেক হবে। চন্দ্রমণির একবার ইচ্ছে হয় বৌমাকে একটু সাহায্য ক'রে আসে। উঠেও বসে। কিন্তু পারে না। শরীর তখনও বেশ ক্লান্ত। আবার জোর ক'রে কিছু ক'রতে গেলে হিতে বিপরীতও হ'তে পারে। তাই সে চিন্তা ছেড়ে আবার শুয়ে পড়ে ও আবোল আবোল ভাবতে ভাবতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ে।

মধ্যরাত্রে কি একটা স্বপ্ন দেখে চন্দ্রমণির ঘুম ভেঙ্গে যায়। চোখ মেলে দেখে—তার শয্যাপার্শ্বে দীর্ঘাকৃতি প্রিয়দর্শন এক জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ

শুয়ে আছে। প্রথমে ভাবে—সে বুঝি তখনও স্বপ্ন দেখছে। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই সে ভাব কেটে যায়। ধড়মড় ক'রে উঠে বসে। চোখ ড'লে আবার দেখে—শয্যাধিকার ক'রে তখনও মানুষটা শুয়ে আছে। তবে কি তার স্বামী ? সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়—তার স্বামী কি ক'রে হবে ? তিনি তো গয়ায়। চন্দ্রমণি আর ভাবতে পারে না। ভয়ে বিস্ময়ে শয্যা ছেড়ে লাফিয়ে পড়ে। চীৎকার ক'রতে গিয়ে লজ্জায় চুপ ক'রে যায়। ভাবে তার চীৎকারে রামকুমার ও তার স্ত্রী ছুটে আসবে। সেই সঙ্গে পাড়া-প্রতিবেশীরাও দু'চারজন আসবে। দেখবে তার শয্যায় কে একজন অপরিচিত পুরুষ শুয়ে আছে। বিস্ময়ে আর ঘৃণায় একবার তার দিকে আর একবার সেই পুরুষটার দিকে চাইবে। জিজ্ঞাসা মনেই থাকবে। হয়তো একটু মৃদু হেসে সব বোঝার ভাণ ক'রে উপেক্ষা ভরে চ'লে যাবে।

চন্দ্রমণি তাড়াতাড়ি ক'রে প্রদীপ জ্বালে। প্রদীপের আলোয় ঘরের অন্ধকার দূর হয়! আঁখি বিস্ফারিত ক'রে শয্যার উপর ফেলে। দেখে—রামেশ্বর ব্যতীত শয্যায় আর কেউ নেই। বিস্ময় শেষে উৎকণ্ঠায় এসে দাঁড়ায়। ভয়ে সর্ব্বশরীর ঠক ঠক ক'রে কাঁপতে থাকে। গলা শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে আসে। তার কি মাথা খারাপ হ'ল ? সে কি তবে ভুল দেখেছে ? না না—তার ভুল হ'তে পারে না। সে যে স্পষ্ট দেখেছে। তবে কি প্রদীপ জ্বালার অবসরে মানুষটা খাটের তলায় গিয়ে লুকিয়েছে ? সন্দেহ নিরসন করার জন্য প্রদীপ ধ'রে খাটের তলায় উঁকি মেরে দেখে—না খাটের তলায়ও নেই। তবে কি খিল খুলে পালালো ? দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ক'রে দরজার দিকে চায়। দেখে—খিল যেমন বন্ধ ছিল তেমনি বন্ধই আছে। আশ্বস্ত হয়। ভয়টা কিছু কমে। সেই সঙ্গে শরীরের কাঁপনও থেমে আসে। কিন্তু সন্দেহটা যায় না। আবার ভাবে—যেমন কৌশল ক'রে খিল খুলে ঘরে ঢুকেছিল আবার তেমনি কৌশলেই দরজা বন্ধ ক'রে পালায় নি তো ? দরজা খুলে প্রদীপ নিয়ে দাওয়ায় এসে দাঁড়ায়। সতর্ক দৃষ্টিতে চারিদিকে দেখে—না, জনমানবের কোন চিহ্ন নেই। সাড়া পর্য্যন্ত নেই।

পৃথিবী যেন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, প্রাণের স্পন্দনটুকুও শোনা যায় না। তবে ঝিল্লী আর কয়েকটা রাতজাগা পাখী—শিশু যেমন তার নিদ্রিত মাকে কেঁদে কেঁদে ডাকে তেমন ক'রে স্তব্ধতাকে ভেঙ্গে ডেকে চ'লেছে।

ফুটফুটে জ্যোৎস্না। যত দূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি চলে চন্দ্রমণি চেয়ে চেয়ে দেখে, নিকটে দূরে, আসেপাশে প্রহরীর মত দৃষ্টি ঘুরে আসে। জনমানবের চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখতে পায় না। ঝির ঝির ক'রে এক ঝলক হাওয়া এসে শরীরটাকে জুড়িয়ে দেয়। ভয়টাকেও দূর করে। কি যেন একটা ভাবে মনটা আবার আচ্ছন্ন হ'য়ে যায়। দূর দিগন্তে বিহ্বল দৃষ্টি ফেলে সব ভয় ও ভাবনা ভুলে দাঁড়িয়ে থাকে।

অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ একটা কালপেঁচার ডাকে চন্দ্রমণি চ'ম্‌কে ওঠে। তন্ময়তা টুটে যায়। আবার স্থূল জগতে ফিরে আসে। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে পুনরায় ঘরে এসে ঢোকে। দরজার অর্গল বন্ধ করে। রামেশ্বরের দিকে একবার স্নেহকরুণ দৃষ্টিতে চায়। তারপর প্রদীপ নিভিয়ে শয্যায় উঠে দেহটাকে এলিয়ে দেয়। কিন্তু ঘুম আসে না। আবার ঐ ভাবনা এসে মনটাকে তোলপাড় ক'রে তোলে। ভাবে···চোরের মত কে তার ঘরে এসে ঢুকলো ? তার সঙ্গে তো গ্রামের কোন লোকের ঝগড়া নেই। কেবল সেদিন মধু যুগীর সঙ্গে একটু কথা কাটাকাটি হ'য়েছিল। সেই কি তবে শত্রুতা ক'রে চোরের মত ঘরে ঢুকেছিল ? কিন্তু গেল কোথায় ? পালালো কি ক'রে ? তা ছাড়া মধু যুগীর দেহ ঐ রকম জ্যোতির্ম্ময় হ'ল কি ক'রে ? ভাবনা শুধু বেড়েই চলে। সেই সঙ্গে রাত্রিও। ভাবতে ভাবতে দিগন্তে ভোরের সূচনা দেখা দেয়। আর তাই দেখে পাখীর দল মুখর হ'য়ে ওঠে। চন্দ্রমণি আর ঘুমাতে পারে না। দুর্গা দুর্গা ব'লে উঠে পড়ে। খিল খুলে বাইরে বেরিয়ে আসে।

●

তের

ক্ষুদিরামের গয়ার কাজ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর জন্য মনটা আবার চঞ্চল হ'য়ে ওঠে। বিশেষ ক'রে বিষ্ণুপাদপদ্মে পিণ্ডদান কালে ভাবাবেশে সে যা দেখেছে ও শুনেছে তার সত্যাসত্য নিরূপণ করার জন্যই মনটা গৃহাভিমুখে ছুটে চলে। যদিও সে শুনে এসেছে দেবালয়ে দেবস্বপ্ন মিথ্যা হয় না, তবুও এ শোনা কথা বাড়ী না যাওয়া পর্য্যন্ত এ রহস্য উদঘাটন হবে না। দেবতা তাকে ছলনা ক'রেছে; না সত্যই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ ক'রবে ? আর এই জানার আগ্রহেই পবিত্র তীর্থভূমি ছেড়ে গদাধরকে ছেড়ে পাণ্ডার কাছে বিদায় চেয়ে বলে, গয়ার কাজ তো শেষ হ'ল, এবার আমায় বিদায় দিন।

বিদায়ের কথা শুনে পাণ্ডার মনটা বিচ্ছেদে কাতর হ'য়ে ওঠে। পাণ্ডা হ'য়ে সে বহু তীর্থযাত্রীর সংস্রবে এসেছে, বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষ দেখেছে, আর দেখতে দেখতে যৌবন অতিক্রম ক'রে বার্দ্ধক্যে এসে প'ড়েছে। বিচিত্র মানুষের সংস্পর্শে এসে মনের সহজ ও সরল ভাবপ্রবণতা প্রায় বিনষ্ট হ'য়ে গেছে। কঠিন বাস্তবের সঙ্গে সংগ্রাম ক'রতে ক'রতে মনটা আজ হ'য়ে এসেছে কঠোর। কারো আসা আর যাওয়ায় আনন্দও পায় না, ব্যথাও বোধ করে না। তার জীবনটাকে সে পান্থশালা ব'লে জেনেছে। কত পথিক এসেছে আর গেছে। আরো কত আসবে ও যাবে। দণ্ড কয়েকের পরিচয় তাও দেনা-পাওনা নিয়ে। হিসাব নিকাশ নিয়ে। এখানে প্রাণের বিনিময়ও হয় না, প্রেমও হয় না, আর তা করাও মূর্খতা। সে তা করেও না; পাণ্ডা আর যজমানে যতটুকু সম্পর্ক থাকা উচিৎ তার ঊর্দ্ধে সে যায় না। তাই কারো বিরহে মনে কোন ভাবান্তর ঘটে না। কিন্তু এই

মানুষটা মনে একটা রূপান্তর ঘটিয়েছে। জীবনে যত লোকের সংস্রবে এসেছে—এ লোকটা তাদের ব্যতিক্রম। এমন সহজ, সরল, অনাড়ম্বর, নিষ্ঠাবান, স্বল্প ও সদালাপী আদর্শ মানুষের সংস্রবে পাণ্ডা জীবনে সে বোধ হয় প্রথম এলো। মানুষটার কাছে এলেই কি যেন একটা ভাবে মনটা ভ'রে থাকে। কোথা দিয়ে যে সময় কেটে যায় তা টেরও পায় না। গল্প ক'রতে ক'রতে দেশ-কাল-পাত্র সব ভুলে যায়। ভুলে যায়—সে পাণ্ডা ও যজমান। বাঙ্গালী ও বিহারী। তাই ক্ষুদিরাম বিদায় চাইতেই পাণ্ডার মুখের প্রশান্তিটা মিলিয়ে যায়। ব্যথিত কণ্ঠে বলে, কা কুছ্ তকলিফ্ হোতা ?

পাণ্ডার কথা শুনে ক্ষুদিরাম জিব কেটে হাত জোড় ক'রে সলজ্জ কণ্ঠে বলে, না না, সেকি কথা! আপনার ব্যবহার জীবনে ভুলব না। নিজের বাড়ীর মতনই একটা মাস কাটিয়ে গেলাম। এতটুকু কষ্ট বা অসুবিধা হয়নি।

পাণ্ডা আশ্বস্ত হ'য়ে উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে, তব ?

ক্ষুদিরাম বিনীতভাবে বলে, এক মাসের উপর হয় বাড়ী থেকে এসেছি, আর এসে পর্য্যন্ত কোন খবর পাইনি। তাই আর কি......

পাণ্ডা এ কথার কোন জবাব দিতে পারে না। মনে মনে বিশ্লেষণ ক'রে দেখে—বিদায় চাওয়া অযৌক্তিক নয়। হ'তে পারেন তিনি সৎ স্বভাব সাধু সজ্জন ব্যক্তি, কিন্তু গৃহী তো বটে। আজ যদি তার বাড়ীর জন্য, পুত্র-পরিবারের জন্য চিত্ত ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। তা ছাড়া তার মনে যে ভাব ও অনুরাগ জেগেছে ওর মনে তার ছায়া নাও প'ড়তে পারে, যুক্তি দিয়ে বুঝলেও মন কিন্তু মানে না। আত্মীয় নয়, স্বজন নয়, একেবারে ভিন্‌দেশী। অনুরোধ করাও শোভন নয়। তাই একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ব্যথিত কণ্ঠে বলে, আউর হাম্ কিয়া ব'লেগা। কভি আপ ইধার আয়েগা তো হামরা ঘরমে আকে দর্শন দিজিয়েগা। যদি কসুর হই তো মাপ করিয়ে।

ক্ষুদিরাম ব্যাগ ও বিছানাটা তুলে নিয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ব্যথিত কণ্ঠে বলে, নিশ্চয় আসবো। তবে বয়স হ'য়েছে, আর হয়তো আসা হবে না···

পাণ্ডা চুপ ক'রে থাকে।

ক্ষুদিরাম ধীর পদে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে। তারপর পাণ্ডার দিকে আর একবার চেয়ে ব্যাগ ও বিছানাটা পায়ের কাছে নামিয়ে রেখে হাত তুলে নমস্কার ক'রে বিনীত ভাবে বলে, আচ্ছা এবার তাহ'লে আসি।

পাণ্ডাও নমস্কার বিনিময় ক'রে জোড়হস্তে বলে, আইয়ে, লেকেন ইয়াদ রাখ্না।

ক্ষুদিরাম ম্লান হেসে ব্যাগ ও বিছানাটা তুলে নিয়ে বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে আসে। পথে এসে দেখে বেলা বেশ বেড়ে গেছে। রৌদ্রও প্রখর হ'য়ে উঠেছে। নগর কোলাহলে মুখর। কোনদিকে দৃক্পাত না ক'রে হন্ হন্ ক'রে এগিয়ে যায়। পবিত্র তীর্থভূমি ছেড়ে যাবার আগে আর একবার গদাধরকে প্রণাম ক'রে বিদায় নিয়ে যেতে হবে। তাই ব্যাগ ও বিছানা নিয়ে একেবারে মন্দিরে এসে ওঠে। গদাধরের মূর্ত্তির সম্মুখে স্থির নেত্রে দাঁড়ায়। মনে মনে বলে, প্রভু, বিদায় নিতে এসেছি।

শিলামূর্ত্তি নিশ্চল হ'য়ে সিংহাসনে দাঁড়িয়ে থাকে। কথার কোন জবাব দেয় না।

ক্ষুদিরাম একদৃষ্টে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পর ভূমিষ্ঠ হ'য়ে ভক্তিভরে প্রণাম করে। ইতোপূর্ব্বে সে আরো কয়েকটা তীর্থদর্শন ক'রে এসেছে,কিন্তু সেখান থেকে বিদায় বেলায় এই ব্যথা ও বিচ্ছেদ বেদনা অনুভব করেনি, আজ গদাধরকে ছেড়ে যেতে সে ব্যথা ও বেদনা বোধ করে।

পিণ্ডদান কালে সেই অনুভূতির পর থেকে গদাধরকে আর দেবতা বলে মনে হয় না। মনে হয় সে যেন বড় আপনার, প্রাণের জিনিষ। ভক্তি আর নিষ্ঠার বাঁধ ভেঙ্গে মনের কূলে এসে উঠেছে, ভুলিয়ে দিয়েছে মানুষ আর দেবতার ব্যবধান। গুঁড়িয়ে দিয়েছে ফুলতুলসীর আড়াল। চূয়া চন্দনের

আড়ম্বর। কিন্তু কেন যে তার এ ভাবান্তর তা সে জানে না। যুক্তিতর্ক দিয়ে বিশ্লেষণ করে নি বা ক'রতে চায় না। সূক্ষ্ম অনুভূতি দিয়ে বুঝেছে, তাই পাষাণের কাছে বিদায় নিতে দুটি আঁখি জলে ভ'রে আসে। চাদরের প্রান্তভাগ দিয়ে চোখের জল মুছে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মন্দির ছেড়ে বেরিয়ে আসে।

আবার সেই পথ। যে পথ বেয়ে একদিন সে এসেছিল এই গয়াধামে। সেদিন পথ ছিল অজানা। চিত্ত ছিল বিচ্ছেদকাতর। তার সঙ্গে ছিল সংশয় ও শঙ্কা। তাই সেদিন পথ চলা ছিল অনুরাগহীন, আর এই গদাধর ছিল অচিন পাষাণ দেবতা। আজ আবার সেই পথ। দু'ধারে ধূসর প্রান্তর। উন্মুক্ত দিগন্তরেখায় সবুজ পাহাড়ের সীমান্ত। আর সেই ধূসর প্রান্তরে কোথাও কোথাও সবুজের স্বাক্ষর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মহুয়া তরু। সেদিন তার চোখে এই শোভা ছিল বড় অকরুণ। শ্রীহীন। আজ কিন্তু তা আর মনে হয় না। মনের সঙ্গে প্রকৃতির রূপ পরিবর্ত্তন হ'য়ে গেছে। সবই অপরূপ ও সুন্দর লাগে। হৃদয় যে আজ ভাবে বিভোর। গদাধর তাকে কৃপা ক'রেছে নীলাঞ্জন টেনে দিয়েছে তার দুই চোখে। মনে দিয়েছে আশা আর উদ্দীপনা। বৈশাখের প্রখর তাপকে উপেক্ষা ক'রে তাই সে হন্ হন্ ক'রে এগিয়ে যায়।

যদিও গদাধরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসার সময় একটা ইঙ্গিত পাবার আশা ক'রেছিল। ভেবেছিল…গদাধর হয়তো আর একবার তাকে ভাবাবেশে অভিভূত ক'রে জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিতে দেখা দেবে। দূর ক'রে দেবে সব সংশয় ও সন্দেহ। কিন্তু তা কিছুই করে নি। স্থির নেত্রে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেও গদাধরের কোন ভাবান্তর দেখে নি বা তারও কোন ভাবান্তর ঘটে নি। তবু বিশ্বাসটা শিথিল হয় নি। গদাধর তাকে যা' ব'লেছে তা হবেই। কিন্তু বিস্ময় জাগে দেবতার এই অযাচিত করুণাতে। স্বপ্নের স্বর্গলোক ছেড়ে এমন নিষ্ঠুর হিংসাদ্বেষপূর্ণ ধূলার ধরণীতে আসবেন কেন? আর তারই মতন এক দীন দরিদ্রের ঘরে।

যেখানে লালসা আর বাসনার হবে না পরিতৃপ্তি। জুটবে না ক্ষুধার অন্ন। প্রতিনিয়ত দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে বেঁচে থাকতে হবে। হয় তো হ'তে হ'বে সত্যভ্রষ্ট। সেখানে তিনি আবির্ভাব হ'তে চান কেন? ভাবতে ভাবতে তন্ময় হ'য়ে যায়। মনে থাকে না পথের দূরত্ব। ফেলে-আসা গৃহের কথা। পুত্র-পরিজনের বিচ্ছেদ। সব বিলুপ্ত ক'রে গদাধর তার চিত্ত জুড়ে ব'সেছে। ভাবনা কেড়ে নিয়ে ভাব দিয়েছে।

জীবনের দীর্ঘ যাট বৎসরের মধ্যে অনেক...অনেক অলৌকিক ঘটনা তার জীবনে ঘটেছে। গৃহদেবতা রঘুবীরই তন্দ্রা ঘোরে দেখা দিয়ে এসে-ছিলেন তার গৃহে। বেশ মনে পড়ে—এমনি এক মধ্যাহ্নে পথশ্রান্ত হয়ে ক্লান্তি নিবারণ ক'রতে আম্রতলে শুয়েছে। চোখের পাতায় নেমে এসেছে ঈষৎ তন্দ্রা। তন্দ্রাঘোরে দেখে বালক বেশে শ্রীরামচন্দ্র এসেছেন। শ্যামল বরণ, হাতে ধনুর্ব্বাণ কিন্তু মুখখানি ব্যথা-কাতর। মিনতি ক'রে ব'লছেন—আমি দীর্ঘদিন এই প্রান্তরে অভুক্ত হ'য়ে প'ড়ে আছি। আমাকে তোমার গৃহে নিয়ে চল। তোমার সেবা গ্রহণে বড় অভিলাষ হ'য়েছে। এই কথা ব'লে মূর্ত্তি মিলিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তারও তন্দ্রা টুটে গেল। ধড়মড় ক'রে উঠে বসলো। প্রথমে মনে হ'ল স্বপ্ন। কিন্তু দৃষ্টি ফিরাতেই চ'মকে উঠলো। স্বপ্নে আর জাগরণে প্রান্তরের মিল দেখে। সংশয় ও সন্দেহ দূর ক'রতে উঠে এল। সজাগ ও তীক্ষ্নদৃষ্টি নিয়ে ধান্য-ভূমিতে এসে দাঁড়ালো। জাগরণে স্বপ্নের সত্যতা দেখে স্তম্ভিত হ'য়ে গেল। সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠলো। দেখল—একটা বিষধর সর্প একখণ্ড শিলার উপর ফণা ধ'রে আছে। সন্দেহের আর অবকাশ থাকলো না। "জয় রঘুবীর" ব'লে আনন্দে চীৎকার ক'রে সেই শিলামূর্ত্তিকে বুকে তুলে নিয়েছিল। গৃহদেবতা হ'য়ে তিনি আজও বিরাজ ক'রছেন তার গৃহে। অযাচিত করুণা ক'রেই এসেছেন তার পর্ণকুটিরে। তবু তিনি দেবতা। গদাধরের মতন ভেঙ্গে দেননি ভক্তি আর নিষ্ঠার বাঁধ। নিয়ে যাননি প্রেমের বন্যায় ভাসিয়ে। বলেন নি—নররূপে জন্মগ্রহণ করবো তোমার ঔরসে।

মিশিয়ে দেব নিজেকে তোমার রক্ত-কণিকায়, ভাব ও ভাবনায়, এক আত্মায়। ভুলিয়ে দেব—আমি দেবতা আর তুমি মানুষ। ভক্ত আর ভগবান। তোমার আমার মাঝে থাকবে না কোন আড়াল। সূক্ষ্ম অনুভূতির সপ্তলোক থেকে নেমে আসবো তোমার স্থূল ভাবনার মধ্যে। ভালবাসার গণ্ডীতে, আমায় তুমি দুই বাহুর মধ্যে জড়িয়ে ধ'রতে পারবে। শুনতে পাবে বুকের স্পন্দন। রক্তের কম্পন। অনুভব ক'রবে আমার দেহের তাপ। বিরক্ত হ'য়ে উঠবে আদরে আর আব্দারে। ক্ষুদিরাম আর ভাবতে পারে না। আনন্দে আর আবেগে সর্ব্বশরীর কাঁপতে থাকে। সন্দেহ যায় বহুদূরে। স্থির বিশ্বাস বুকে বাঁধে দানা। দেবতার জনক হবে সে। যেমন হ'য়েছিল দশরথ। যেমন বসুদেব। ভাবতে ভাবতে বাহ্যজ্ঞান প্রায় হারিয়ে ফেলে।

●

চৌদ্দ

চন্দ্রমণি ঠাকুর প্রণাম সেরে বাইরে এসে মুখ ধুতে বসে। কাল থেকে উপোস ক'রে আছে। তার উপরে এই সব অলৌকিক ঘটনায় বুকের ছাতি শুকিয়ে গেছে। সকাল সকাল স্নান ও পূজা-আহ্নিক সেরে নিয়ে একটু জল খেতে না পেলে সে মরে যাবে। কিন্তু গত কল্যকার গভীর রাত্রের ঘটনাটা কিছুতেই মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারে না। বরং সব ভাবনা ম্লান ক'রে ঐ চিন্তাটা মনটাকে তোলপাড় ক'রে চ'লেছে। মুখ ধুতে ধুতে ভাবে—ধনী আর প্রসন্নকে ঘটনাটা ব'লতে হবে। তারা হয়তো সব শুনে এই রহস্য উদ্‌ঘাটন ক'রতে পারে। রামেশ্বর ঘুম থেকে উঠলেই ধনী আর প্রসন্নকে ডাকতে পাঠাবে। দেখি—তারা কি বলে।

চন্দ্রমণির সাড়া পেয়ে রামকুমার ও তার স্ত্রী উভয়েই শয্যা ছেড়ে উঠে পড়ে ও ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে। রামকুমার চন্দ্রমণির দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করে, মা, কেমন আছ? শরীর আর খারাপ লাগছে না তো?

চন্দ্রমণি চোখেমুখে জল দিতে দিতে বলে, না বাবা, ভালই আছি।

রামকুমার আশ্বস্ত হ'য়ে স্ত্রীর দিকে চেয়ে বলে, তুমি তাড়াতাড়ি ক'রে মার জলখাবারের ব্যবস্থা ক'রে দাও। কাল থেকে উপোস ক'রে আছেন।

স্ত্রী নীরবে ঘাড় নেড়ে সম্মতি দেয় ও ব্যস্ত হয়ে গৃহকর্ম্মে মনোনিবেশ করে। আর রামকুমার প্রাতঃকৃত্য ও স্নান সারতে বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে যায়। কারণ সে জানে যে রঘুবীর ও অন্যান্য গৃহদেবতার পূজা না হ'লে মা জল গ্রহণ ক'রবেন না।

এদের কথোপকথনে রামেশ্বরের ঘুম ভেঙ্গে যায়। সে চোখ ড'লতে ড'লতে বেরিয়ে দাওয়ায় এসে দাঁড়ায়।

চন্দ্রমণি মুখ ধোওয়া শেষ ক'রে উঠে রামেশ্বরকে জাগা দেখে ব্যগ্র ভাবে অনুরোধের সুরে বলে, বাবা রামেশ্বর, চোখে মুখে জল দিয়ে ধনী আর প্রসন্নকে একবার ডেকে আন তো। ব'ল গে—মা তোমাদের এখনি ডাকছে।

রামেশ্বর একটা হাই তুলে আড়মোড়া ভেঙ্গে কৌতূহলী হ'য়ে জিজ্ঞাসা করে, কেন মা?

চন্দ্রমণি গম্ভীর ভাবে বলে, অত খোঁজে তোমার দরকার কি? যা ব'ললাম তাই কর।

মার কথা বলার ধরণ দেখে রামেশ্বরের মুখখানা ভার হ'য়ে যায়। সে আর দ্বিরুক্তি না ক'রে বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে যায়। আর চন্দ্রমণি বাড়ীর এক কোণে অবস্থিত ঝাঁটাগাছটা নিয়ে উঠানে ঝাঁট দিতে সুরু করে।

পুত্রবধূ উচ্ছিষ্ট বাসনের গোছা নিয়ে রান্নাঘর ছেড়ে বেরিয়েই শাশুড়ীকে

উঠান ঝাঁট দিতে দেখে বিস্মিত কণ্ঠে বলে, ওমা! ওকি করছ। কাল থেকে তুমি উপোস ক'রে আছ—আবার ঐ সব ক'রতে গেলে কেন ? আমি সব ক'রে নিচ্ছি। তুমি নেয়ে এসো গে।

চন্দ্রমণি পুত্রবধূর দিকে চেয়ে সস্নেহে বলে, তা হোক মা, এটুকু আমি ক'রে দিয়ে যাই। তুমি ছেলেমানুষ—একহাতে আর কত ক'রবে।

পুত্রবধূ বাসনের গোছাটা উঠানের একধারে নামিয়ে রাখে। তারপর হাত ধুয়ে চন্দ্রমণির কাছে এসে ঝাঁটাগাছটা হাত থেকে টেনে নিয়ে কপট গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে বলে, না তুমি যাও। নেয়ে এসো গে। কাল থেকে উপোস ক'রে আছ....আমি সব ক'রে নিচ্ছি।

চন্দ্রমণি পুত্রবধূর রাগ দেখে একটু মৃদু হাসে। তারপর সস্নেহে বলে, আচ্ছা মা, তবে নেয়েই আসি। তোমার কষ্ট হবে ব'লে···কথাটা আর শেষ না ক'রেই দাওয়ায় উঠে আসে। ঘরে ঢুকে মাথায় একটু তেল দিয়ে ঘড়া গামছা নিয়ে বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে আসে।

চন্দ্রমণি স্নান সেরে ঘুরে এসে দেখে—পুত্রবধূ ইতিমধ্যে সংসারের বাসি কাজ সেরে নিয়েছে। পুত্রবধূর কর্ম্মতৎপরতায় চন্দ্রমণি বেশ খুশী হয়। তাই উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে, বাঃ এর মধ্যে বাসন মাজা, ঘরে গোবর দেওয়া পর্য্যন্ত হ'য়ে গেছে!

শাশুড়ীর কথায় পুত্রবধূর মুখখানা গর্ব্বে ফুলে ওঠে। কণ্ঠস্বরে তার আভাস দিয়ে বলে, তাড়াতাড়ি সেরে না নিলে তোমার জলখাবার গুছিয়ে দেব কি ক'রে ? তুমি আহ্নিক সেরে উঠতে উঠতে আমার সব হ'য়ে যাবে। আমি এবার নাইতে চললাম। এমন সময় রামেশ্বর ঘুরে আসে। রামেশ্বরকে দেখে তার বৌদি বলে, ঠাকুরপো, আমাকে একটু তেল বার ক'রে দাও তো—আমি আর ঘরে ঢুকবো না।

রামেশ্বর ঘরের দিকে এগুতে এগুতে মাকে লক্ষ্য ক'রে বলে, আমি সব ব'লে এসেছি। ব'ললে, তোমার মাকে বলোগে—বাসি পাট সেরে যাচ্ছি।

চন্দ্রমণি "আচ্ছা" ব'লে জলের ঘড়াটা রান্নাঘরের দাওয়ায় নামিয়ে রাখে। তারপর শোবার ঘরে ঢুকে কাপড় ছেড়ে ফুলের সাজি নিয়ে ফুল তুলতে বেরিয়ে যায়। আর পুত্রবধূ যায় ঘাটে। রামেশ্বর পাঠ্যপুস্তক নিয়ে বসে।

স্তোত্র পাঠ ক'রতে ক'রতে এর কিছু পরে রামকুমার স্নান সেরে বাড়ী এসে ঢোকে। ভিজে কাপড়খানা বাইরের আল্‌নায় মেলে দেয়। ঘরের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে রামেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করে, মা নেয়ে এসেছেন ?

রামেশ্বর পাঠ্যপুস্তক থেকে মুখ তুলে দাদার দিকে চেয়ে বলে, হ্যাঁ, ফুল তুলতে গেছেন।

রামকুমার আর কিছু না ব'লে ঘরে এসে ঢোকে। কাপড় ছাড়ে। তারপর ঠাকুরঘরে এসে বসে। সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রমণিও ফুল নিয়ে ঘুরে আসে ও একেবারে ঠাকুরঘরে প্রবেশ করে।

পূজা আহ্নিক সেরে জল খেয়ে উঠতেই ধনী গভীর উৎকণ্ঠা নিয়ে বাড়ীর ভিতর ঢুকে ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, কৈ গো বৌদি! বলি কি খবর বল তো ? সাত-সকালে ডেকে পাঠিয়েছ কেনে ? আমি তো বাপু ভাবনায় মরি। ব'লতে ব'লতে ঘরের দিকে এগিয়ে আসে।

চন্দ্রমণি কপট অভিমানের সঙ্গে বলে, তাই এই বেলা তেপ'রের সময় এলে খবর নিতে !

চন্দ্রমণির কথায় ধনী লজ্জায় ম্লান হ'য়ে যায়। ঘরের দাওয়ায় উঠতে উঠতে গভীর কুণ্ঠার সঙ্গে বলে, জানো তো—ধান ভেনে, চিড়ে মুড়ি ভেজে—তবে আমার দিন চলে। আর লোকে ধান ভানতে দিয়েই তাগাদা স্থরু করে। তাই আর কি—একটু দেরী হ'য়ে গেল। তা' কি খপর বল তো ? ব'লতে ব'লতে দাওয়ায় উঠে আসে।

চন্দ্রমণি মাদুর বিছাতে বিছাতে সস্নেহে বলে, আয় ঘরে আয়। ব'লবো ব'লেই তো ডেকেছি।

৫

চন্দ্রমণির কথায় ধনীর কৌতূহল বেড়ে ওঠে। ঘরের ভিতর প্রবেশ ক'রে মাদুরে ব'সে আগ্রহ ভরে জিজ্ঞাসা করে, কাল রাত্রে আরো কিছু হ'য়েছে নাকি ?

চন্দ্রমণি বাইরের দিকে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে চাপা স্বরে ফিস্ ফিস্ ক'রে বলে, হ্যাঁ, তুই তো চ'লে গেলি, আমাকেও রামকুমার ধ'রে নিয়ে ঘরে শুইয়ে দিয়ে এল। ঘুম আর আসে না……

—কি গো বামুন খুড়ি ? এই সকাল বেলায় হঠাৎ ডেকে পাঠালে কেন বল তো ? ব'লতে ব'লতে প্রসন্ন ঘরে এসে ঢোকে।

চন্দ্রমণি ধনীর উপর থেকে দৃষ্টি তুলে প্রসন্নর উপর ফেলে। বিদ্রূপ ক'রে বলে, তা এই তোমার সকাল হ'ল মা ?

চন্দ্রমণির কথা শুনে প্রসন্ন লজ্জায় ম্লান হ'য়ে যায়। কুণ্ঠার সঙ্গে বলে, সকালে কি আর আসতে পারি খুড়ি, কত কাজ……

চন্দ্রমণি বাধা দিয়ে বলে, জানি বাছা! তা' কথাটা শুনে গিয়ে কি আর কাজ ক'রতে পারতে না ? আর খুব জরুরী না হ'লে সকাল বেলায় ডাকতে পাঠাতাম না।

ধনী অধৈর্য্য হ'য়ে ওঠে। কণ্ঠস্বরে তার আভাস দিয়ে বলে, ঝগড়া পরে ক'রো। এখন যা ব'লছ তাই বল, শুনি। তারপর প্রসন্নর দিকে চেয়ে বলে, প্রসন্ন, আয় ব'স।

প্রসন্ন মাদুরে এসে বসে।

চন্দ্রমণি ধনীর দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করে, কি ব'লছিলাম বল তো ?

ধনী সূত্র ধ'রিয়ে দিয়ে বলে, ঘুম আর আসে না…

প্রসন্ন বাধা দিয়ে বলে, আমি তো কিছুই শুনলাম না।

চন্দ্রমণি জবাব দিবার আগে ধনী বলে, এইতো সবে ব'লতে আরম্ভ ক'রেছে। তবে হ্যাঁ, তুই তো কালকের ঘটনাও কিছু জানিস নে।

প্রসন্নর কৌতূহল বেড়ে ওঠে। আগ্রহ ভরে জিজ্ঞাসা করে, কাল আবার কি হ'য়েছিল ?

ধনী চোখ দুটো সাধ্যমত বিস্ফারিত ক'রে কপাল কুঁচকে গম্ভীর ভাবে বলে, বাবা! কাল সন্ধ্যের সময় নীলের ঘরে বাতি দিতে গিয়ে যুগীদের শিব মন্দিরের সমুখে ভির্‌মি লেগে প'ড়ে গিয়ে একেবারে বেহুঁস!

ধনীর কথা শুনে বিস্ময় আর উৎকণ্ঠায় প্রসন্নর চোখ দু'টোও ডাগর হ'য়ে ওঠে! বিস্মিত কণ্ঠে বলে, এ্যাঁ, বল কি গো!

ধনী একই ভাবে বলে, আমি তো বাপু ভয়ে মরি। একে সন্ধ্যে, তার উপরে কেউ কোথাও নেই। শেষকালে কমণ্ডুলের জল নিয়ে চোখে-মুখে ঝাপ্‌টা দিই। কাপড়ের আঁচল দিয়ে বাতাস করি, তবে জ্ঞান হয়। জ্ঞান হ'য়ে বলে কি—শিবের গা থেকে একটা আলো এসে আমার পেটের মধ্যে ঢুকেছে। আর সেই থেকে মনে হ'চ্ছে—আমার যেন ছেলেপুলে হবে। আবার রাতেও নাকি কি হ'য়েছে। তাই ব'লবে ব'লে ডেকে পাঠিয়েছে।

ধনীর কথায় প্রসন্নর নিঃশ্বাস রোধ হ'য়ে আসার মত হয়। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে জিজ্ঞাসা করে, রাতে আবার কি হ'ল?

এবার চন্দ্রমণি বলে, কাল মাঝরাত্রে ঘুম ভেঙ্গে দেখি—আমার পাশে কে একজন শুয়ে আছে। প্রথমে ভাবলাম—বুঝি স্বপ্ন দেখ্‌ছি। তারপর ভাবলাম—কর্ত্তা। সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ল...তিনি তো গয়ায়। যেই মনে হওয়া সেই ভয়ে হাত পা ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপতে লাগ্‌লো। বিছানা থেকে নেমে তাড়াতাড়ি প্রদীপ জ্বাললাম। জ্বেলে দেখি—কেউ কোথাও নেই।

চন্দ্রমণির কথা শুনতে শুনতে ধনীর ও প্রসন্নর চোখ দুটো ভয়ে বিস্ময়ে ড্যাবা ড্যাবা হ'য়ে ওঠে। যেন ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসতে চায়, নিঃশ্বাসও যেন রোধ হ'য়ে আসে। রুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, তারপর তারপর?

চন্দ্রমণি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বলে, তারপর আর কি। প্রথমে ভাবলাম, খাটের তলায় লুকিয়েছে। উঁকি দিয়ে দেখি, না! তারপর

ভাবলাম, দরজা খুলে পালিয়েছে। কিন্তু দেখি দরজায় যেমন খিল দেওয়া ছিল তেমনিই আছে। ভাবলাম, যেমন ক'রে খিল খুলে ঢুকেছিল তেমনি ক'রে বন্ধ ক'রে পালিয়েছে। প্রদীপ নিয়ে খিল খুলে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

প্রসন্ন আগ্রহ ভরে জিজ্ঞাসা করে, বাইরে এসে কাউকে দেখতে পেলে ?

চন্দ্রমণি একই ভাবে বলে, না, জনমানবের সাড়া পর্য্যন্ত পেলাম না। অথচ খাটের উপর আমি স্পষ্ট শুয়ে থাকতে দেখেছি। তবে হ্যাঁ, অমন সুন্দর চেহারা আর রং আমি জীবনে দেখি নি। দেহ দিয়ে যেন আগুন ঠিক্‌রে বেরুচ্ছে। কথাগুলো ব'লে চন্দ্রমণি একটু দম নেয়।

ধনী ও প্রসন্ন নির্ব্বাক বিস্ময়ে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চায়ি করে।

চন্দ্রমণি আবার বলে, আমি তো বাপু কিছুই বুঝতে পাচ্ছি নে, তাই তোদের ডেকে পাঠিয়েছি। আচ্ছা, মানুষটা কে বল দিকি ? ঘরে ঢুকলোই বা কি ক'রে আর গেলোই বা কি ক'রে ? তা ছাড়া আমার তো গাঁয়ে কারো সঙ্গে কোন মন কষাকষি নেই। তবে হ্যাঁ, মধু যুগীর সঙ্গে সেদিন সামান্য একটু বচসা হ'য়েছিল। সেই কি আড়ি ক'রে ঘরে ঢুকেছিল······

চন্দ্রমণি কথাটা শেষ না ক'রতেই ধনী ও প্রসন্ন প্রায় একসঙ্গে খিল খিল ক'রে হেসে ওঠে।

চন্দ্রমণি অপ্রস্তুত হ'য়ে যায়। বোকার মত দৃষ্টিটা ওদের মুখের উপর ফেলে রাখে।

ধনী হাসি থামিয়ে গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে বলে, ছিঃ ছিঃ! এ কথা কাউকে ব'লো না। লোকে শুনলে মুখে চূন কালি দেবে।

প্রসন্ন ধনীর কথায় সায় দিয়ে বলে, হ্যাঁ খুড়ি, এসব কথা আর কাউকে ব'ল না।

চন্দ্রমণি ঈষৎ অপ্রস্তুত হ'য়ে বলে, তা নয় নাই ব'ললাম। কিন্তু ব্যাপারটা কি ? তোরা কি কিছু বুঝতে পাচ্ছিস্ ?

প্রসন্ন জবাব দেবার আগে ধনী উপেক্ষা ভরে বলে, তোমার বাপু বায়ু রোগ হ'য়েছে। একটা ভাল ক'বরেজ দেখাও। নয়তো শেষে পাগল হ'য়ে যাবে। তারপর দৃষ্টিটা প্রসন্নর উপর ফেলে বিজ্ঞের মত বলে, আচ্ছা, তুই বল প্রসন্ন ? একই সঙ্গে তু'জনে মন্দিরে যাচ্ছি, ফুট্-ফুটে জ্যোছনা রাত্তির, তার মধ্যে মন্দির থেকে একটা আলো এসে উনার পেটের মধ্যে ঢুকলো। আর সঙ্গে সঙ্গে উনার মনে হ'ল গব্য হ'য়েছে। অথচ আমি কিছুই দেখতে পেলাম না। তা এ বায়ুরোগ ছাড়া আর কি ?

ধনীর কথা শুনে প্রসন্ন একটু চিন্তা করে। তারপর তার কথার সমর্থনে বলে, আমারও তাই মনে হ'চ্ছে। বাবার কাছে শুনেছি, বায়ু গুল্ম রোগ হ'লে নাকি এই সব ঘটে।

ধনী উঠে দাঁড়ায়। চন্দ্রমণির দিকে চেয়ে বলে, আমি এখন যাই বৌদি, সব কাজ প'ড়ে আছে। ব'লে বাইরের দিকে এগুতে থাকে।

ধনীর দেখাদেখি প্রসন্নও উঠে দাঁড়ায়। চন্দ্রমণিকে বলে, আমিও যাই খুড়ি।

ধনী দরজার কাছে এসে আবার ঘুরে দাঁড়ায়। চন্দ্রমণির উপর দৃষ্টি ফেলে আর একবার সাবধান ক'রে বলে, যাই হোক বাপু, একটা কবরেজ দেখাও। নয় তো কি থেকে কি হয় বলা যায় না।

চন্দ্রমণি চিন্তিত হ'য়ে উদাস কণ্ঠে বলে, দেখি, উনি বাড়ী আসুন।

ধনী আর কিছু না ব'লে বেরিয়ে আসে। আর প্রসন্নও ধনীকে অনুসরণ করে।

পোণের

কয়েকদিন পরের কথা। নীলপূজোর দিন রাত্রে ঐ সব দর্শনের পর যদিও চন্দ্রমণি আর কিছু দেখেনি, কিন্তু মনে যে ভাবান্তর ঘ'টেছে তা সে বেশ বুঝতে পারে, এবং এই ভাবের পরিবর্ত্তন সহজ ও সরল ভাবেই ঘ'টেছে আর তার অজ্ঞাতেই। ধীরে ধীরে কোন এক সময়ে ভক্তি আর নিষ্ঠার সাগর পেরিয়ে গৃহদেবতা রঘুবীর, রামেশ্বর বাণলিঙ্গ ও শীতলা দেবীর অতি কাছে এসে প'ড়েছে। এখন আর তাদের দেবতা ব'লে মনে হয় না। মনে হয় না তারা প্রাণশূন্য কঠিন পাষাণ মূর্ত্তি। নির্ব্বাক, অনুভবহীন, ধ্যান আর পূজার বস্তু, ভাবে আর কল্পনায় গড়া, সূক্ষ্ম অনুভূতির সপ্তলোক বিহারী। আজ মনে হয় তারা বড় আপনার। যেন রক্তের জিনিষ। রামকুমার, রামেশ্বর, কাত্যায়নীর মতন। তাই ভক্তি গিয়ে এসেছে ভালোবাসা। নিষ্ঠা গিয়ে অপত্য স্নেহ। ঠাকুরঘর ছেড়ে এখন আর বেরুতে ইচ্ছা করে না। আহ্নিক ক'রতে ব'সলে ভাবে প্রায় অভিভূত হ'য়ে যায়। বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হ'য়ে আসে। আর তখন দেখে—রঘুবীর কখন সিংহাসন ছেড়ে তার কোলে এসে ব'সছে। কখন পিঠের উপর ঝুঁকে প'ড়ে আদরে আর আব্দারে অতিষ্ঠ ক'রে তুলছে। আবার কখনো কখনো অন্যান্য দেবদেবীকেও দেখে, যা সে ইতিপূর্ব্বে কোনদিন দেখেনি বা কল্পনাও করে নি। আর এ সব দর্শন ও অনুভব এখন নিত্য নৈমিত্তিকের ঘটনাতে দাঁড়িয়েছে। আগে হ'লে সে ধনী বা প্রসন্নকে ব'লত। কিন্তু এখন আর বলে না। ব'ললেই তারা বায়ুরোগ জনিত এই সব হ'চ্ছে ব'লে উড়িয়ে দেবে এবং ডাক্তার বোদ্দি দেখাবার নির্দ্দেশ দেবে। অথচ ব্যাধির লক্ষণ সে কিছুই বুঝতে পারে না। কোন জ্বালা-যন্ত্রণা তো নেই,

এমন কি কোন সময়ের জন্য মনেও হয় না যে, সে পীড়িতা বা পীড়াক্রান্ত হ'তে চ'লেছে, বরং ঐ ঘটনার পর থেকে মনটা সব সময়ের জন্য এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দে ভ'রে থাকে। আগের মতন আর কোন কিছুর জন্য অহেতুক ভয়ও হয় না, ভাবনাও হয় না। এমন কি স্বামীর জন্যও এখন আর কোন দুশ্চিন্তা হয় না। সে যেন তার কুশল সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হ'য়েছে।

আগে তার পূজোর একটা নির্দ্দিষ্ট সময় ছিল। এখন আর তা' নেই। কতক্ষণ যে সে তন্ময় হ'য়ে ব'সে থাকে তা খেয়ালই হয় না। প্রায় দিনই পুত্রবধূ এসে ডাকলে তবে ধ্যান ভাঙ্গে। লজ্জিত হ'য়ে উঠে পড়ে। বাইরে এসে দেখে, মধ্যাহ্ন গড়িয়ে গেছে। ঈষৎ কুণ্ঠার সঙ্গে বিস্মিত কণ্ঠে বলে, ওমা! বেলা যে গড়িয়ে গেছে! আমার একেবারে হুঁস নেই। তারপর পুত্রবধূর দিকে চেয়ে অনুযোগের সঙ্গে বলে, এতক্ষণ আমায় ডাক নি কেন বৌমা? দেখতো—বেলা গড়িয়ে গেল। আর তোমারও বোধ হয় খাওয়া হয় নি। ছিঃ ছিঃ—ব'লতে ব'লতে ব্যস্ততা দেখিয়ে রান্নাঘরে এসে ওঠে।

সেদিন পূজায় ব'সেছে এবং সেই অনির্ব্বচনীর ভাবে অভিভূত হ'য়ে গেছে। আর সেই ভাবাবেশে দেখে, এক অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যবতী নারী হাঁসের উপর চ'ড়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে। রৌদ্রে ও ক্লান্তিতে মুখখানা আগুনে পোড়া কাঞ্চনের মত লাল হ'য়ে উঠেছে। ঘন ঘন নিঃশ্বাস প'ড়ছে। তাই দেখে চন্দ্রমণির মমতা হয়। স্নেহ করুণ কণ্ঠে বলে, তুমি কে গো বাছা? এই দুপুর রোদে কোথায় চ'লেছ? আহা! এই রোদের ঝাঁজে মুখখানা একেবারে টকটকে লাল হ'য়ে উঠেছে।

হাঁসে চড়া মূর্ত্তি নির্ব্বাক হ'য়ে মৃদু মৃদু হাসে।

চন্দ্রমণি আবার সহানুভূতির সঙ্গে বলে, তা যেও বাছা, রোদ প'ড়লে যেও। আমার ঘরে চারটি পান্তা আছে। ও ক'টি নেবু মেখে খেয়ে যাও। খেলে শরীরটা ঠাণ্ডা হবে।

হংসারূঢ়া মূর্ত্তি তার কথার কোন জবাব দেয় না। চন্দ্রমণিকে বিস্ময়ে স্তম্ভিত ক'রে তেমনি হাসতে হাসতে দূর দূরান্তে মিলিয়ে যায়।

আর ঠিক সেই সময় পুত্রবধূ ঠাকুরঘরের দরজায় এসে ডাকে, মা!

চন্দ্রমণির ধ্যান ভেঙ্গে যায়। আঁখি মেলে পুত্রবধূর মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চায়। সে চাহনিতে না আছে জিজ্ঞাসা, না আছে কৌতূহল। কি এক ভাবে দৃষ্টি উদাস। যেন তন্দ্রা ভাঙা।

পুত্রবধূ শাশুড়ীর অপলক দৃষ্টির দিকে চেয়ে আবার বলে, মা, বাবা এসেছেন।

এবার চন্দ্রমণির সম্বিত ফেরে। ভাব বিলীন হয়। চ'মকে উঠে বলে, এ্যাঁ! ধড়মড় ক'রে উঠে পড়ে। মনে হয়, হাঁসে-চড়া দেবী বোধ হয় তার জীবন দেবতাকে পোঁছে দিয়ে চ'লে গেল।

বাইরে বেরিয়ে দেখে, ক্ষুদিরাম দাওয়ার উপর ব'সে আছে। রোদের ঝাঁজে মুখখানা ইতিপূর্ব্বে দেখা সেই হংসারূঢ়া দেবীর মতনই টক্‌টকে লাল। চোখ দুটিও জবা ফুলের মতন। তার উপরে খোঁচা খোঁচা গোঁফ দাড়িতে আরো শুষ্ক ও শীর্ণ দেখাচ্ছে। যেন রোগাক্রান্ত। সারা অঙ্গ দিয়ে দর দর ক'রে ঘাম বেরুচ্ছে। ঘন ঘন নিঃশ্বাসে ক্লান্তি প্রকট হ'য়ে উঠছে।

স্বামীর দিকে চেয়ে চন্দ্রমণি শিউরে ওঠে। ব্যথায় বুকটা মোচড় দেয়। আবেগ আর উচ্ছ্বাসে চোখ দুটো সজল হ'য়ে আসে। দ্রুতপদে কাছে এসে গলায় আঁচল তুলে দিয়ে ভক্তি ভরে প্রণাম করে।

ক্ষুদিরাম মনে মনে আশীর্ব্বাদ ক'রে ক্লান্ত আঁখি মেলে চন্দ্রমণির দিকে চায়। দেখে বিস্মিত হয়। দেহে বিগত দিনের রূপলাবণ্য যেন ফিরে এসেছে। চোখে মুখে কি একটা ভাব ফুটে উঠেছে। চেহারাটা আগের তুলনায় জ্যোতির্ম্ময়ী হ'য়েছে। চন্দ্রমণির মুখের ও দেহের পরিবর্ত্তন দেখে ক্ষুদিরামের মনটা রোমাঞ্চিত হ'য়ে ওঠে। মনে পড়ে গয়ার কথা। গদাধরের মর্ম্মর মূর্ত্তি! স্বপ্ন তা হ'লে মিথ্যা নয়। গদাধর সত্যই আসবেন।

তা' না হ'লে এই ৪৪।৪৫ বৎসর বয়সে চন্দ্রমণি ষোড়শ বর্ষীয়া যুবতীর মত রূপলাবণ্যের অধিকারিনী হয় কি ক'রে? আবার ভাবে, হয়তো তার দৃষ্টিভ্রম। দীর্ঘদিন পরে দেখছে ব'লে একটু অস্বাভাবিক ও অসাধারণ মনে হ'চ্ছে।

ক্ষুদিরামকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকতে দেখে চন্দ্রমণি বিস্মিত ও লজ্জিত হয়। তাই সলজ্জ কণ্ঠে বলে, কি দেখছ বল তো? ব'লে আসে-পাশে চেয়ে দেখে—স্বামীর এই নির্লজ্জতা আর কেউ দেখছে কি না।

চন্দ্রমণির প্রশ্নে ক্ষুদিরামও চ'মকে ওঠে। দৃষ্টিটা তুলে নিয়ে উদাস কণ্ঠে বলে, না এমনি···তারপর প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করে, কেমন আছ?

চন্দ্রমণি স্বাভাবিক হ'য়ে ওঠে। উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে, ভাল আছি। কিন্তু তোমার কি হাল হ'য়েছে বল তো? চেনা যায় না। একেবারে যেন রোগে ভুগে উঠেছ।

ক্ষুদিরাম ক্লান্ত স্বরে বলে, হ্যাঁ, অনেকটা সেই রকমই বটে। তা' পথ তো একটুখানি নয়। আর এই বয়সে অনিয়ম···অত্যাচার···

চন্দ্রমণি কথাটা কেড়ে নিয়ে বলে, সেই জন্যই তখন ব'লেছিলাম গিয়ে কাজ নেই। হঠাৎ ঐ প্রসঙ্গে ছেদ টেনে রান্নাঘরের দিকে চেয়ে পুত্রবধূর উদ্দেশ্যে বলে, বৌমা, একখানা পাখা দিয়ে যাও তো। তোমার শ্বশুরকে একটু হাওয়া করি।

ক্ষুদিরাম জিজ্ঞাসা করে, রামকুমার ও রামেশ্বর কোথায়? সব ভাল আছে তো?

চন্দ্রমণি বলে, হ্যাঁ, সব ভাল আছে। রামেশ্বর পাঠশালায় গেছে—আর রামকুমার···

এমন সময় পুত্রবধূ পাখা এনে দাঁড়ায়। চন্দ্রমণি তার হাত থেকে পাখাটা নিয়ে জিজ্ঞাসা করে, রামকুমার কোথায় গেছে জানো?

পুত্রবধূ নীরবে ঘাড় নাড়ে।

চন্দ্রমণি স্বামীকে হাওয়া ক'রতে ক'রতে আবার পুত্রবধূকে জিজ্ঞাসা করে, খাওয়া-দাওয়া ক'রে বেরিয়েছে ?

পুত্রবধূ মৃদুকণ্ঠে বলে, না। ব'লে পুনরায় রান্নাঘরে এসে ওঠে।

চন্দ্রমণি একই ভাবে স্বামীকে হাওয়া ক'রতে ক'রতে একসঙ্গে জিজ্ঞাসা করে, সেখানে কবে গিয়ে পৌঁছুলে ? শরীর ভাল ছিল ? কাজকর্ম্ম সব নির্ব্বিঘ্নে শেষ হ'য়েছে তো ? একমাস কোথায় ছিলে ? খাওয়া দাওয়ার কষ্ট হয় নি তো ?

ক্ষুদিরাম একে একে সব কথার জবাব দেয়।

চন্দ্রমণি আবার বলে, তা এই দুপুর রোদে বেরুলে কেন বল তো ? একটু কোথাও অপেক্ষা ক'রতে পারলে না ? দেখো দেখি···রোদের ঝাঁজে মুখ চোখ একেবারে লাল হ'য়ে উঠেছে। তারপর শঙ্কিত কণ্ঠে নিজের মনে বলে, আবার সর্দ্দিগর্ম্মি না হয়....

চন্দ্রমণির সেবায় ক্ষুদিরাম ক্রমে সুস্থ হ'য়ে ওঠে। গায়ের জামা চাদর ইত্যাদি খুলতে খুলতে বলে, অবশ্য কোথাও একটু আশ্রয় নিয়ে দুপুর বেলাটা কাটিয়ে আসতে পারতাম, কিন্তু আর ইচ্ছে ক'রলো না। ভাবলাম···একটু কষ্ট হয়তো হবে। কিন্তু তা হোক, তবু আজ রঘুবীরের পূজো না ক'রে আর জলগ্রহণ ক'রবো না। তাই আর কি····কথাটা অসমাপ্ত রেখে সদরের দিকে চায়।

এমন সময় রামকুমার বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করে। পিতাকে দেখে বিস্মিত ও পুলকিত হয়। কিন্তু আবার ব্যথিতও হয় শুষ্ক শীর্ণ চেহারা দেখে। দ্রুত পদে নিকটে এসে চরণ স্পর্শ ক'রে ভক্তিভরে প্রণাম করে, সেই সঙ্গে মাকেও প্রণাম করে।

ক্ষুদিরাম মনে মনে আশীর্ব্বাদ করে, আর চন্দ্রমণি ওষ্ঠ স্পর্শ ক'রে চুম্বন করে।

রামকুমার পিতার দিকে চেয়ে বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করে, ভাল আছেন ?

ক্ষুদিরাম সস্নেহে উত্তর দিয়ে বলে, হ্যাঁ, ভালই আছি। পরে পাল্টা জিজ্ঞাসা করে, তুমি ভাল আছ তো? গ্রামের খবর সব ভালো?

রামকুমার বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার চরণ আশীর্ব্বাদে ভালই আছি। আর গ্রামেরও সব কুশল।

ক্ষুদিরাম একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে, যাক, ভাল থাকলেই ভালো।

চন্দ্রমণি পাখাটা নামিয়ে রেখে জামা চাদর ইত্যাদি ক্ষুদিরামের হাত থেকে নিয়ে ঘরে গিয়ে রেখে আসে।

ক্ষুদিরাম রামকুমারের দিকে স্নেহকরুণ দৃষ্টিতে চেয়ে জিজ্ঞাসা করে, তা এই দুপুর বেলা খাওয়া দাওয়া না ক'রে কোথায় গেছিলে?

রামকুমার পিতার পাশে খালি মেঝের উপরই বসে। তারপর একটু ইতস্ততঃ ক'রে বলে, ধর্ম্মরাজের পূজোর একটা ফর্দ্দ দিতে গিয়েছিলাম, তাই আর কি...

ক্ষুদিরাম সস্নেহে বলে, ও আচ্ছা, এখন খাওয়া দাওয়া ক'রে নাও। বেলা অনেক হ'য়েছে।

রামকুমার সঙ্গে সঙ্গে বলে, এখনো ঠাকুরের ভোগ দেওয়া হয় নি। তাছাড়া আজ এক সঙ্গেই খেতে ব'সবো।

ক্ষুদিরামকে আর কথা বলার অবকাশ না দিয়ে চন্দ্রমণি ব্যস্ত হ'য়ে ব'লে ওঠে, তবে আর তুমি ব'স না। যাও নেয়ে এসো গে।

ক্ষুদিরামও চঞ্চল হ'য়ে বলে, তাই যাই। তেল আর গামছা দাও।

চন্দ্রমণি ঘরে ঢুকে তেল ও গামছা এনে দেয়।

ক্ষুদিরাম তেল মেখে গামছা নিয়ে স্নান ক'রতে যায়।

ষোল

ক্লান্ত ও পথশ্রান্ত ব'লে ৺রঘুবীরের সন্ধ্যারতির পরই চন্দ্রমণি স্বামীকে খাইয়ে দাইয়ে শুতে পাঠিয়ে দেয়। ক্ষুদিরামও ক্লান্ত বোধ করে। তাই আর ইতস্ততঃ না ক'রে শুতে আসে এবং শয্যাও নেয়। কিন্তু ঘুমাতে পারে না। নানা চিন্তা ও ভাবনা এসে তন্দ্রাহরণ করে। বিশেষ ক'রে গয়া থেকে যে উদ্বেগ ও সংশয় নিয়ে সে বাড়ী এসেছে এখনও পর্য্যন্ত কিছুই তার নিরসন হয় নি। একমাত্র চন্দ্রমণির কিঞ্চিৎ শারীরিক ও মানসিক উন্নতি বা পরিবর্ত্তন ছাড়া, শরীরটা পূর্ব্বের তুলনায় ঈষৎ পুষ্ট ও লাবণ্যযুক্তা হ'য়েছে বটে—তবে অন্তর্ব্বত্নী হবার জন্যই যে হ'য়েছে, তা নাও হ'তে পারে। হয়তো ঋতু পরিবর্ত্তনে হ'য়েছে। আর এমন তো হয়-ই। শীতের পর অনেকেরই স্বাস্থ্যের উন্নতি দেখা যায়। তবে ইতিমধ্যে মনের যে পরিবর্ত্তন লক্ষ্য ক'রেছে সেটা ক্ষুদিরামকে খানিকটা আশান্বিত ক'রে তোলে। রঘুবীরের সন্ধ্যারতির আয়োজন করার কালে সে গভীর ভাবে লক্ষ্য ক'রেছে তার তন্ময়তা। যেন রঘুবীরের অতি কাছে এসেছে। দেবতা আর মানুষের ব্যবধান ভুলে গেছে। ভক্তি ভালবাসায় রূপান্তরিত হ'য়েছে। কিন্তু এসব হয় তো কিছুই নয়। তার আশাবাদী মন আকাশ-কুসুম কল্পনা ক'রছে। আলেয়াকে আলো ভাবছে। দেবতা তার এই জীর্ণ কুটিরে আসবেন কেন?

এমন সময় রামেশ্বর শয্যা নিতে ঘরে আসে। পিতাকে জাগ্রত দেখে বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, বাবা, এখনও ঘুমোও নি?

ক্ষুদিরাম উদ্গত নিঃশ্বাসটা চেপে নিয়ে রামেশ্বরের দিকে চেয়ে সস্নেহে বলে, না বাবা, ঘুম আসছে না।

রামেশ্বর শয্যার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে আগ্রহ ভরে জিজ্ঞাসা করে, পা টিপে দেব ?

ক্ষুদিরাম ব্যস্ত হ'য়ে বলে, না না, তুমি শোও।

রামেশ্বর আর কোন কথা না ব'লে শয্যায় উঠে যথাস্থানে গিয়ে শুয়ে পড়ে।

ক্ষুদিরাম এবার দীর্ঘ নিঃশ্বাসটা ছেড়ে পাশ ফিরে ঘুমাবার চেষ্টা করে। নয়নও মুদে, কিন্তু ঘুম আসে না—আসে ভাবনা। আশা আর নিরাশা নিয়ে আবার জাল বুনে চলে। বিগত দিনের ফেলে-আসা পথে দৃষ্টি ফেরায়। দেখে—কোথাও কোন কালিমার চিহ্ন রেখে আসে নি। দুঃখ বরণ ক'রেছে তবু আত্মবিক্রয় করে নি। মিথ্যাচার গ্রহণ করে নি। শির উন্নত ক'রেই জীবনের এই দীর্ঘ ষাট বৎসরে চ'লে এসেছে। আনন্দ আর বেদনা যখন যা পেয়েছে সবই অর্পণ ক'রেছে দেবতাকে। তার মনের উপর কোন প্রভাব বিস্তার হ'তে দেয় নি। জীবনের প্রথম থেকেই জেনে নিয়েছে এও প্রকৃতির লীলার মতন। কখনও রৌদ্র কখনও ছায়া। এই নিয়ে যারা আনন্দে অধীর হয় বা বেদনায় কাতর হয় তারা সার্থক মানব জীবনের অপচয় করে। শুধু দেনা আর পাওনা, হিসাব আর নিকাশ নিয়ে সত্যিকারের আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তা সে করে নি। সংসার অনিত্য ব'লে জেনেছে। অথচ সবই করে, কিন্তু সংসার চিন্তা করে না। চিন্তা করে ভগবানের। তাই ভগবানও তাকে দয়া ক'রেছেন। দিয়েছেন অপার্থিব সুখাস্বাদ। সময়ে সময়ে নিয়ে গেছেন আনন্দ ও বেদনার অতীতে। সেখানে পৌঁছে সে জেনেছে—আনন্দ কোথায়! সুখ কি!

ভাবতে ভাবতে সহসা মনে হয় ভগবানই এই দরিদ্রতা দেন তার প্রতি অনুরক্ত করার জন্য। তাই দরিদ্র লোকই তাঁর কৃপা লাভ করে। রাজার তনয় হ'য়েও গৌতম বুদ্ধ সব ভোগৈশ্বর্য্য ছেড়ে হ'য়েছিলেন ভিখারী শুধু তাঁর কৃপা লাভের জন্যে। রাজার দুলাল শ্রীরামচন্দ্রকেও

যেতে হ'য়েছিল বনবাসে, নিতে হ'য়েছিল বল্কলবাস। কৃষ্ণকেও গোচারণ ক'রে ফিরতে হ'য়েছিল দরিদ্রের কুটিরে। ঈশ্বরের বিকাশ আর প্রকাশ তাই দরিদ্রতার মধ্যে, দরিদ্রের ঘরে। সত্য আর নিষ্ঠার মাঝে। তাঁরা ভোগৈশ্বর্য্যের জন্য পৃথিবীতে আসেন না। আসেন দুঃখের মাঝে দুঃখকে উপেক্ষা ক'রতে, জয় ক'রতে। হয় তো এমন একটা ভাব নিয়েই আসছেন গদাধর তার জীর্ণ কুটিরে। তবে কি লীলা ক'রতে যে আসছেন—ক্ষুদিরাম সেটা ভাবতে পারে না। আবার ভাবে—তার ঘরে যে আসবেন এমন কোন নিশ্চিত প্রমাণ এখনও পর্য্যন্ত সে পায় নি। আসার পর এমন একটু অবসর বা নির্জ্জনতা মেলে নি যে, চন্দ্রমণিকে জিজ্ঞাসা করে, গয়া থাকা কালীন সে কিছু দেখেছে বা শুনেছে কি না।

ভাবতে ভাবতে চন্দ্রমণি এসে ঘরে ঢোকে। দরজাটা বন্ধ ক'রে দেয়। প্রদীপটা নিভিয়ে দিতে গিয়ে শয্যার দিকে একবার তাকায়। স্বামীকে জেগে থাকতে দেখে বিস্মিত হয়। শঙ্কিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, কি এখনও ঘুমাও নি যে? শরীর খারাপ হয় নি তো? ব'লতে ব'লতে দ্রুতপদে এসে শয্যাপার্শ্বে দাঁড়ায়। প্রবল উৎকণ্ঠা নিয়ে কপালে, বুকে হাত দিয়ে দেখে। দেহে কোন উত্তাপ না পেয়ে আশ্বস্ত হ'য়ে বলে, না গা ঠাণ্ডা।

চন্দ্রমণির উৎকণ্ঠা দেখে ক্ষুদিরামের অধরে একটু মৃদু হাসির রেখা ফুটে ওঠে। উপেক্ষা ভরে বলে, না না, অসুখ বিসুখ কিছু হয় নি।

চন্দ্রমণি শয্যায় উঠে বসে। রামেশ্বরের দিকে স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার চায়। তারপর বলে, তা' হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। যে রোদের ভিতর এসেছ! আর এই বোশেখের রোদ!

ক্ষুদিরাম একই ভাবে বলে, সেই জন্যই বোধ হয় ঘুম আসছে না। অত্যধিক পরিশ্রম হ'লে এমন হয়। তারপর চন্দ্রমণিকে ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করে, তোমাদের সব খাওয়া দাওয়া হ'য়েছে?

চন্দ্রমণি বিছানার উপর ব'সে একটা ক্লান্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে, হ্যাঁ,

এই সবে সারা হ'ল। উত্তর পাবার আগে আবার জিজ্ঞাসা করে, গরম হ'চ্ছে ? হাওয়া ক'রবো ?

ক্ষুদিরাম নির্লিপ্ত ভাবে বলে, ক'রবে, তা কর।

চন্দ্রমণি উঠে দাঁড়ায়। দেওয়ালের গা থেকে পাখাটা পেড়ে নেয়। পুনরায় শয্যার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে জিজ্ঞাসা করে, প্রদীপটা কি নিভিয়ে দেব ?

ক্ষুদিরাম স্বাভাবিক ভাবেই বলে, না থাক, তোমার সঙ্গে একটু গল্প করি, ঘুম যখন আসছেই না···

চন্দ্রমণি আবার স্বামীর পাশে এসে বসে। পাখা নাড়তে নাড়তে গভীর আগ্রহ ভরে বলে, দেখ, তোমাকে কয়েকটা কথা ব'লবো ব'লে ভেবে রেখেছি। কিন্তু দিনে আর তো সময় পেলাম না। আর এক রাত্রে—তা' তোমার ক্লান্ত শরীর···আমি তো ভেবেই এসেছি যে তুমি ঘুমিয়ে প'ড়েছ।

ক্ষুদিরামের উৎকণ্ঠা ও আগ্রহ তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। কিন্তু তার অভিব্যক্তি না দিয়ে নির্লিপ্ত ভাবে বলে, বল।

চন্দ্রমণি চোখ দুটো বিস্ফারিত ক'রে ভয়-বিহ্বল কণ্ঠে বলে, সবাই ব'লছে আমার নাকি বায়ুগুল্ম ব্যাধি হ'তে পারে।

চন্দ্রমণির কথা শুনে ক্ষুদিরামের মুখখানা ম্লান হ'য়ে ওঠে। এ সংবাদ সে জানতে চায় না। শুনতে চায় গদাধরের আসার কোন ইঙ্গিত সে পেয়েছে কিনা ? অলৌকিক কিছু দেখেছে কি না ? তাই একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, ও—কিন্তু রোগের লক্ষণটা কি দেখল ?

চন্দ্রমণি আগ্রহ ভরে বলে, তবে শোন। এই নীলপূজোর দিন ধনীকে সঙ্গে নিয়ে সন্ধ্যের সময় যুগীদের শিবমন্দিরে নীলের বাতি দিতে যাচ্ছি। যেই মন্দিরের সমুখে এসে প'ড়েছি সেই দেখি কি···মন্দিরের ভিতর একটা আলো—যেন বিদ্যুতের মত ! ঐ রকম আলো আমি জীবনে দেখি নি।

সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদিরামের মনে পড়ে···বিষ্ণুমন্দিরে আলোর বন্যা। আর

বিষ্ণুর-অঙ্গ থেকে আলোর জ্যোতিকে ঘূর্ণাবর্ত্তাকারে বেরিয়ে যেতে। আনন্দে আর আবেগে ক্ষুদিরামের সর্ব্বাঙ্গ থর থর ক'রে কাঁপতে থাকে, শয্যা থেকে উঠে বসে। আঁখি বিস্ফারিত হ'য়ে ওঠে। পলক হারিয়ে পড়ে চন্দ্রমণির মুখের উপর। আর নিঃশ্বাস হ'য়ে আসে রুদ্ধ। মুখ আর বুক হয় আরক্তিম।

স্বামীকে অকস্মাৎ শয্যার উপর উঠে ব'সতে ও অপলক নেত্রে তার দিকে চেয়ে থাকতে দেখে চন্দ্রমণি আগের কথার ছেদ টেনে ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, ওকি! উঠে ব'সলে কেন? কি হ'ল?

ক্ষুদিরাম রুদ্ধকণ্ঠে আবেগের সঙ্গে বলে, কিছু হয় নি, কিছু হয় নি। তুমি বল···বল।

ক্ষুদিরামের কথা শুনে চন্দ্রমণি আশ্বস্ত হয়। আবেগের সঙ্গে চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে বলে, সেই আলো ঝড়ের বেগে ঘুরতে ঘুরতে এসে আমাকে একেবারে ছেয়ে ফেললো। ভয়ে ভাবনায় আমি তো পথের উপরেই বেহুঁস হ'য়ে প'ড়লাম। কি ভাগ্যিস ধনীকে সঙ্গে নিয়ে গেছিলাম, তাই আর কি···আবার বাড়ী ফিরে আসতে পারি। ও-ই আর কি কমণ্ডুলের জল নিয়ে চোখে মুখে ঝাপ্‌টা দেয়, আঁচল দিয়ে হাওয়া করে, তবে আমার হুঁস হয়। ধনীর কাঁধে ভর দিয়ে কোন রকমে বাড়ী ফিরে আসি। ব'লে চন্দ্রমণি একটু চুপ করে।

ক্ষুদিরাম রুদ্ধ আবেগের সঙ্গে বলে, তারপর? তারপর?

চন্দ্রমণির চোখ দুটো স্তিমিত হ'য়ে আসে। খানিকটা উপেক্ষা ভরে বলে, হুঁস হবার পরেই আমার মনে হ'ল সেই আলোটা যেন আমার পেটের মধ্যে ঢুকে আছে। আর ছেলেপুলে পেটে এলে মেয়েদের যেমন শরীর ও মনের অবস্থা হয় আমারও তাই মনে হ'তে লাগলো।

ক্ষুদিরাম আনন্দে অধীর হ'য়ে ওঠে। ভুলে যায় তার বয়সের কথা। স্থান, কাল, পাত্র। মনে পড়ে অবতার-চরিত। মহাপুরুষদিগের মাতৃগর্ভে প্রবেশের অলৌকিক কাহিনী। তাঁরা আসেন না দৈহিক আনন্দ সম্ভোগের

ভিতর দিয়ে। কামনার সুরত মধুর পথ বেয়ে। ঘৃণ্য লালসা ও বাসনার সুতীব্র অনুভূতির মধ্যে। তাঁরা বিশেষ লগ্নে ও ক্ষণে পৃথিবীতে আসেন— আসেন মাতৃগর্ভে, যখন সে নারীর দেহ ও মন থাকে শুদ্ধ এবং পবিত্র। আর সেইদিনই চন্দ্রমণির উদরে আলোর জ্যোতিঃ প্রবেশ করেছে, যেদিন সে বিষ্ণুপদে শেষ পিণ্ডদান ক'রে ভাবভূত হ'য়ে তাঁকে দর্শন ক'রেছে আর শুনেছে তাঁর অমৃতময় বাণী, "আমার একান্ত বাসনা পুত্ররূপে তোমার ঘরে জন্মগ্রহণ করি।" তা' হ'লে তো অলীক স্বপ্ন নয়। মিথ্যা আকাশ-কুসুম সে রচনা করে নি। তাকে ধন্য ক'রে, বংশোজ্জ্বল ক'রে সত্যই আসছেন গদাধর—এই ধূলির ধরণীতে, তার জীর্ণ কুটীরে।

ক্ষুদিরাম আর ভাবতে পারে না! আনন্দে ও আবেগে সর্ব্বশরীর থর থর ক'রে কেঁপে ওঠে। নয়ন বিগলিত হ'য়ে ধারা নামে। আর সেই সজল চোখ দুটি চন্দ্রমণির উপর পলক হারিয়ে নির্ব্বাক হ'য়ে প'ড়ে থাকে।

চন্দ্রমণি স্বামীর ভাবান্তর দেখে বিস্মিত হয়। যদিও সে জানে স্বামী তার ঋষিতুল্য, সুখে আর দুঃখে তাঁর কোন ভাবান্তর ঘটে না, সব কিছুই প্রশান্ত মনে গ্রহণ করেন। রঘুবীরকে অর্পণ ক'রে নিশ্চিন্ত হন। সেই স্বামীর আজ এই ভাবান্তর কেন? তবে কি সত্যই তার বায়ুগুল্ম ব্যাধি হ'য়েছে···এবং তারই পরিণাম দর্শন ক'রে চিত্ত শঙ্কিত ও চক্ষু অশ্রুসজল হ'ল···চন্দ্রমণি উদ্বিগ্ন হ'য়ে ওঠে। শঙ্কিত মনে জিজ্ঞাসা করে, তবে কি সত্যই আমার রোগ হ'ল? আজকেও তুমি আসার আগে দেখলাম—একটি সুন্দরী মেয়েকে হাঁসে চড়ে আসতে। লাল টকটকে গায়ের রং, তার উপরে রোদের ঝাঁজে একেবারে রক্তবর্ণ হ'য়েছে। দেখে আমার বড় কষ্ট হ'ল! বললাম—ওগো হাঁসে চড়া মেয়ে! এই দুপুর রোদে কোথায় চ'লেছ? কিন্তু কোন উত্তর দিল না। মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগলো। আমি তবুও বললাম, তা বেশ বাছা, রোদ প'ড়লে যেও। বরং ঘরে চারটি আমানি পান্তা আছে, সে কটি খেয়ে ঠাণ্ডা হও। তা'

কোন জবাব না দিয়ে চ'লে গেল। আর তারপরই বৌমা এসে ব'ললো —তুমি এসেছ। ব'লে চন্দ্রমণি চুপ করে।

ক্ষুদিরাম তখন ভাবে অভিভূত। তাই নির্ব্বাক হ'য়ে চন্দ্রমণির দিকে চেয়ে থাকে।

স্বামীকে নিরুত্তর দেখে চন্দ্রমণির শঙ্কা বেড়ে ওঠে। ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, হ্যাঁগা, এ সব কি তবে ঐ বায়ুরোগ হ'তেই দেখছি? তবে কি সত্যই আমার ঐ রোগ হ'ল? শেষে আমি কি পাগল হ'য়ে যাবো?

চন্দ্রমণির আকুল কণ্ঠে জিজ্ঞাসায় ক্ষুদিরামের হুঁস হয়। স্থান, কাল ভুলে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে, চন্দ্রা! তুমি ধন্য, গদাধর তোমাকে কৃপা ক'রেছেন। আর কৃপা ক'রে যখন যা দেখান তা' আর কাউকে ব'লো না।

চন্দ্রমণি স্বামীর কথা কিছুই বুঝতে পারে না। তাই বোকার মত মুখের দিকে চেয়ে অসহায়ের মত বলে, হ্যাঁগা, তুমি কি ব'লছ? আমি তো কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।

ক্ষুদিরাম শান্ত কণ্ঠে একে একে গয়াধামে ভাবাবেশে যা দেখেছে ও শুনেছে বিস্তারিত সব ব'লে যায়।

শুনতে শুনতে চন্দ্রমণি অভিভূত হ'য়ে যায়। আনন্দে আর আবেগে আঁখি বেয়ে ধারা নামে। বার বার যুক্ত কর কপালে ঠেকায় আর ক্রন্দন-বিজড়িত কণ্ঠে বলে, আমি কি সে কপাল ক'রেছি যে, ভগবানের জননী হবো?

ক্ষুদিরাম স্থির বিশ্বাসের সঙ্গে বলে, হবে হবে। আর কোন সংশয় নেই চন্দ্রা! প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে আবার বলে, যাক রাত্তির অনেক হ'য়েছে, এবার শোও।

চন্দ্রমণি কোন জবাব না দিয়ে নীরবে উঠে প্রদীপ নিভিয়ে শুয়ে পড়ে।

●

সতের

ক্ষুদিরামের বাড়ী ফেরার সংবাদ পেয়ে পরের দিন সকাল বেলায় গ্রামের অনেকেই একে একে এসে দেখা ক'রে যায়। ক্ষুদিরাম প্রশান্ত কণ্ঠে সকলকেই নিজের কুশল দেয় ও নেয়। এরা চ'লে গেলে প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে আসে। কাল রাত্রে চন্দ্রমণির কাছে কথাগুলো শোনার পর থেকে তার সব সংশয় ও সন্দেহ শেষ হ'য়ে গেছে। আর তার জন্য মনে বেশ একটা পুলকও অনুভব করে। যদিও বয়স হ'য়েছে, আর এই বয়সে কোন মানুষই সন্তান হওয়াটা বাঞ্ছনীয় ব'লে মনে করে না। বাণপ্রস্থ নেবার বেলায় এই আসক্তি লোকের মনে একটা ঘৃণারই উদ্রেক করে। কামাসক্ত ব'লে জনসমাজে পরিগণিত হয়। আর যদি কারও এই বয়সে সন্তান হয়ই···সে বরং অনুতপ্ত হয়। কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হ'য়ে সমাজে বিচরণ করে। বিশেষ ক'রে তার মতন লোক। যাকে গ্রামের আপামর সাধারণ শ্রদ্ধা করে, ভক্তি করে, তার এই বয়সে পুত্র হওয়ার সংবাদ শুনে হয়তো বিরূপ ধারণাই ক'রবে। ভাববে, ক্ষুদিরাম ঠাকুরের সব বিট্‌লেমী। এত পূজা-পাঠ ক্রিয়া-কর্ম্মাদি করে বটে, কিন্তু সংসারে আসক্তিটা আছে ষোল আনা। তা না হ'লে এই ষাট বছর বয়সে বুড়ো বাম্‌নার আবার ছেলে হ'চ্ছে। তবে তাতে আর আমাতে তফাৎ কোথায় ? কামিনী আর কাঞ্চনে এখনো সমান অনুরাগ। প্রভেদ শুধু বাহ্যিক অনুষ্ঠানে। তিনি সব সময় পূজা-পাঠ নিয়ে থাকেন, ভগবচ্চিন্তায় থাকেন, অন্ততঃ তার ভাণ করেন। আর আমরা থাকি হিসাব-নিকাশ, দেনা-পাওনা নিয়ে। তবে আমরা যা ভাবি তাই করি। তার মত নিজেকে বা অপরকে বঞ্চনা করি না।

এই সব চিন্তা এলেও মন কিন্তু তার জন্য কুণ্ঠিত বা লজ্জিত হয় না, বরং আসে তার বিপরীত ভাব। প্রথম সন্তানের জনক হবার সম্ভাবনাতেও এই আনন্দ আর শিহরণ মনকে এত দোলা দেয় নি, আজ ষাট বছর বয়সে যা সে অনুভব করে। এরূপ করার কারণও মনে মনে বিশ্লেষণ করে। গৃহী মাত্রেই পুত্রসন্তান কামনা করে। আর সুসন্তানই চায়—শুধু যে জলগণ্ডুষ পাবার জন্য···তা নয়, চায় তার অতৃপ্ত বাসনার রূপ দানের জন্য। বংশের গৌরব বৃদ্ধির জন্য। মরণের পরেও তাকে জীবিত রাখার জন্য। অবশ্য ভগবান তার সে সাধ ইতিপূর্ব্বেই পূর্ণ ক'রেছেন। দুটি পুত্র-সন্তানের জনক সে। তার মধ্যে জ্যেষ্ঠ রামকুমার কৃতবিদ্য এবং সুসন্তানও বটে। আর কনিষ্ঠ রামেশ্বর বালক। তবে স্বভাব-চরিত্র খুবই মধুর। তাদের দ্বারা তার বংশের গৌরব বৃদ্ধি হবে বৈ ক্ষুণ্ণ হবে না। আর সে চিন্তা কোনদিন তার মনে স্থানও পায় নি। হুগলী জেলার এক অখ্যাত গ্রামের দরিদ্র ব্রাহ্মণ সে। সহরের সঙ্গে, সভ্য জগতের সঙ্গে তার পরিচয় হয় নি ব'ললেই হয়। আর সে তা চায়ও নি। ইংরাজী শিক্ষার মাহাত্ম্য ও কার্য্যকারিতা শুনলেও মন তার কোনদিন মুগ্ধ বা প্রলুব্ধ হয় নি, বরং পরিণাম দর্শন ক'রে শঙ্কিতই হ'য়েছে। সে আশাতীত কল্পনা ক'রবে কি ক'রে ?

আজ কিন্তু গদাধরের আসার সুস্পষ্ট ইঙ্গিতে মনের এক কোণে কি যেন আশাতীত কল্পনা অতি ধীরে ধীরে দানা বেঁধে ওঠে। বয়সের গণ্ডী ভুলিয়ে নিয়ে যায় দূর নীলিমায়। রামকুমার আর রামেশ্বর তাদের জীবিত কাল পর্য্যন্ত ক্রিয়া-কর্ম্মে তার নামটা নেবে। কেউ পিতৃ-পরিচয় জিজ্ঞাসা ক'রলে বলবে, ৺ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়। তাদের অবর্ত্তমানে কেউ আর ভুলেও ক'রবে না। কিন্তু গদাধরের জন্য হয়ত চির স্মরণীয় হ'য়ে যেতে পারে। মানব জনম সার্থক হ'তে পারে। সর্ব্বকালের সর্ব্বজনের নমস্য হ'তে পারে। আর তাকে ধন্য ক'রতে, মহিমান্বিত ক'রতেই হয়তো গদাধর আসছে তার এই জীর্ণ কুটিরে। এই রকম সুসন্তান যে কোন বয়সেই

আসুক না কেন তা গৌরবের। তার জন্য লজ্জিত বা কুণ্ঠিত হওয়া মূঢ়তা মাত্র। আজ হয়তো লোক বিরূপ সমালোচনা ক'রবে, নাসিকা কুঞ্চিত ক'রবে, কিন্তু একদিন ব'লবে, ক্ষুদিরাম ঠাকুর ধন্য। এমন পুত্রের জন্ম দান ক'রে গেছে···যে পুত্র হ'তে শুধু তার মুখোজ্জ্বল হয় নি বা বংশের গৌরবই বৃদ্ধি হয় নি; সেই ছেলে হ'তে আমাদের গাঁয়ের পর্য্যন্ত মুখোজ্জ্বল হ'য়েছে। হয় তো এদদিন বাংলা দেশের, সারা ভারতবর্ষের·········

ক্ষুদিরাম আর ভাবতে পারে না। সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চিত হ'য়ে ওঠে। যৌবন যেন ফিরে আসে। চোখের পাতায় সবুজের স্বপ্ন নামে। ফেলে-আসা দিনের তিক্ত অভিজ্ঞতা বিলীন হ'য়ে যায়। হিসাব নিকাশ সব গুলিয়ে ফেলে। অবাস্তব আর অবান্তর ব'লে কিছু মনে হয় না। নেতি বিচার সমাধি নেয়। *শ্রীউমাশঙ্কর সরকার*

—কিগো, চুপচাপ বোসে আছ যে? ফুল তুলতে যাবে না?

চন্দ্রমণির কথায় ক্ষুদিরামের স্বপ্ন মিলিয়ে যায়। ভাবনায় ছেদ পড়ে। চ'মকে উঠে বলে, এঁ্যা, হঁ্যা, এই যে! কথাটা অসমাপ্ত রেখে ব্যস্ত হ'য়ে ঠাকুরঘরে এসে ঢোকে। ফুলের সাজিটা নিয়ে বেরিয়ে আসে।

চন্দ্রমণির কথায় যদিও ভাবনাগুলো মৌমাছির মত উড়ে যায়, কিন্তু ফুলবাগানে আসার সঙ্গে সঙ্গে আবার এসে মনে চাক বাঁধে। ফুল তুলতে তুলতে ভাবে—দেবতা ধরায় আসছেন নিশ্চয়ই কোন লীলা ক'রতে। আর কালের ইতিহাসে একটা দাগ না কেটে তিনি নিশ্চয়ই যাবেন না। সাধারণের মতন এসে দিনগুলো কোনমতে কাটিয়ে যাবার জন্য তাঁর এই দেহ ধারণ নয়। জন্ম আর মৃত্যু যাঁর ইচ্ছাধীন তিনি কোন ইচ্ছা না নিয়ে, কোন উদ্দেশ্য না নিয়ে স্বেচ্ছায় এই পঙ্কিলতায় আসছেন না। কালসমুদ্রে একটা তরঙ্গ তুলবেন। নিশ্চয় তুলবেন। অবিস্মরণীয় ক'রে রেখে যাবেন নিজেকে, সেই সঙ্গে আমাকেও।

ভাবতে ভাবতে ক্ষুদিরাম করবী ফুলের একটা শাখা নামিয়ে আনে। এক হাতে ফুলের সাজি নিয়ে আর অন্য হাতে ফুলের ডাল ধ'রে বিব্রত

হয়। আবার সাজিটা যেখানে সেখানে নামিয়েও রাখতে পারে না। দেবতার পূজার ফুল অপবিত্র জায়গায় নামিয়ে রাখতে মন যেন সায় দেয় না। অথচ ফুলের ডালটা ছেড়ে যেতেও পারে না। একবার ভাবে—যাই রামেশ্বরকে ডেকে আনি, ডালটা ছেড়ে দিয়ে ঘুরেও দাঁড়ায়। এমন সময় দেখে, একটি আট দশ বছরের ফুটফুটে মেয়ে হাসি মুখে সেই দিকে আসছে। যেমন সুন্দর মুখখানা, তেমনি ভাসা ভাসা টানা টানা চোখ। গায়ে অলঙ্কারও অনেক, এবং বেশ মানানসই। আর পরণে লাল চেলির শাড়ী। একে ফুটফুটে রং তার উপরে লাল শাড়ীখানা প'রে যা মানিয়েছে···যেন দেবী-প্রতিমা। ক্ষুদিরাম নেত্র বিস্ফারিত ক'রে মেয়েটিকে ইতিপূর্ব্বে দেখেছে কিনা মনে ক'রার চেষ্টা করে।

মেয়েটি তার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে কৌতুক ক'রে বলে, কি গো! অমন ক'রে চেয়ে আছ কেন? আমাকে চিনতে পারছ না?

মেয়েটির সপ্রতিভ ভাব ও মিষ্টি মধুর কণ্ঠস্বর শুনে ক্ষুদিরাম মোহিত হ'য়ে যায়। সেই সঙ্গে হয় অপ্রস্তুত। তেমনি কৌতূহলী আঁখি মুখের উপর ফেলে রেখে একটু অপ্রতিভ হ'য়ে বলে, না তো মা! তুমি কি সুখ-লালের······

ক্ষুদিরামের কথাটা শেষ হবার আগেই মেয়েটি খিল খিল ক'রে হেসে ওঠে। তারপর হাসি থামিয়ে প্রায় কাছে এসে বলে, দেখছি···দু' মাস গয়ায় থেকে সব ভুলে গেছ। ওমা! তোমার কি মন গো!

ক্ষুদিরামের বিস্ময় বেড়েই চলে। মেয়েটির মুখের উপর আঁখি দুটি রেখে মনের অন্তঃস্থলে ডুব দেয়, কিন্তু সন্ধান পায় না। অন্ধকারে হাত্‌ড়ে হাত্‌ড়ে ফেরে।

মেয়েটি তেমনি সপ্রতিভ ভাবে বলে, আচ্ছা, পরে ভেবো। এখন ফুলের ডালটা নামিয়ে দাও। আমি ধরি আর তুমি ফুলগুলো পেড়ে নাও।

ক্ষুদিরাম আবার ফুলের ডালটা নত করে। আর মেয়েটি ডালটা

খ'রে থাকে। ফুলগুলো ছিঁড়তে ছিঁড়তে ক্ষুদিরাম জিজ্ঞাসা ক'রে, তুমি কি ধর্ম্মদাসের...

—কি দাদা কি হচ্ছে ? ব'লতে ব'লতে ধর্ম্মদাস পিছনে এসে দাঁড়ায়।

ধর্ম্মদাসের কণ্ঠস্বর শুনে ক্ষুদিরাম চ'ম্‌কে ওঠে, কিন্তু সামলে নিয়ে ঘুরে দাঁড়ায়। প্রশান্ত কণ্ঠে বলে, তুমি অনেকদিন বাঁচবে। এই তোমার নাম ক'রছিলাম, ব'লে ঘাড় ফিরিয়ে মেয়েটির দিকে চাইতে গিয়ে দেখে, কেউ কোথাও নেই! বিস্ময়ে, উৎকণ্ঠায়, কৌতূহলে ক্ষুদিরামের চোখ দুটো শুধু বিস্ফারিতই হ'য়ে ওঠে না, যেন ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসতে চায়। আর সেই ডাগর আঁখি ফেলে আসে-পাশে, নিকটে-দূরে, তন্ন তন্ন ক'রে খোঁজে, কিন্তু কোন চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখতে পায় না। যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।

ক্ষুদিরামকে বিভ্রান্তের মতন এধার ওধার চাইতে দেখে ধর্ম্মদাস আশ্চর্য্য হয়। বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, কি খুঁজছো ?

ক্ষুদিরাম উদ্‌গত নিঃশ্বাসটাকে চেপে নিয়ে বলে, সে আর তোমার শুনে কাজ নেই, চলো বাড়ী চলো। ধর্ম্মদাসকে কথা বলার অবকাশ না দিয়ে বাড়ীর পথে পা বাড়ায়।

ধর্ম্মদাস ক্ষুদিরামকে অনুসরণ ক'রে আসতে আসতে ঈষৎ কুণ্ঠিত হ'য়ে বলে, কালকেই আসতাম। কিন্তু পথশ্রান্ত হ'য়ে এসেছ তাই আর এলাম না। আজ সকালে এলাম। তা শরীরগতিক বেশ ভাল আছে তো ?

ক্ষুদিরাম ধর্ম্মদাসকে নিয়ে বাড়ীর দিকে আসে বটে, কিন্তু ভাবে মেয়েটির কথা। মুখখানা তখনও চোখের উপর জ্বল্ জ্বল্ করে। একটা সংশয় ও সন্দেহ মনের মধ্যে জাল বিস্তার করে। তাই একটু অন্যমনস্ক ও উদাস হ'য়ে যায়। কিন্তু ধর্ম্মদাসের কথায় আবার সচেতন হ'য়ে ওঠে। এবং অন্যমনা হবার জন্য মনে মনে বেশ একটু লজ্জিতও হয়। তাই ব্যস্ত হ'য়ে বলে, হ্যাঁ হ্যাঁ, ভালই আছি। তারপর পাল্টা জিজ্ঞাসা করে, তুমি ভাল আছো ? বাড়ীর খবর সব ভালো ? ব'লতে ব'লতে বাড়ীর ভিতর

প্রবেশ করে। রামেশ্বরকে দাওয়ার উপর মাদুর বিছিয়ে প'ড়তে দেখে বলে, বাবা, একখানা মাদুর বিছিয়ে দাও তো। তোমার ধর্ম্মদাস কাকা ব'সবে। আর এক ক'ল্‌কে তামাকও সেজে দাও। ব'লে ঠাকুর ঘরে এসে ঢোকে ও ফুলের সাজিটা রেখে আবার দাওয়ায় এসে দাঁড়ায়।

রামেশ্বর পুস্তক ছেড়ে উঠে মাদুর বিছিয়ে দেয় ও তামাক সাজতে বসে।

ধর্ম্মদাস মাদুরের উপর ব'সে বলে, হ্যাঁ, তোমার চরণ আশীর্ব্বাদে ভালই আছি। আর বাড়ীর খবরও ভালো। তারপর ক্ষুদিরামের উপর তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি ফেলে বলে, তবে দাদা তোমার শরীরটা কিন্তু খুব খারাপ হ'য়ে গেছে।

ক্ষুদিরাম যথাস্থানে দাঁড়িয়েই বলে, তা আর হবে না। অনিয়ম আর অত্যাচার তো দেহের উপর কম হ'ল না। শুধু রঘুবীরের দয়ায় কোন রকমে প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছি।

রামেশ্বর হুঁকার উপর ক'ল্‌কে দিয়ে ধর্ম্মদাসের দিকে আসতেই ধর্ম্মদাস ব্যস্ত হ'য়ে বলে, আগে তোমার বাবাকে দাও।

ক্ষুদিরাম সঙ্গে সঙ্গে বলে, আমি আর পূজো না সেরে খাবো না। তুমি খাও।

ধর্ম্মদাস রামেশ্বরের হাত থেকে হুঁকাটা নিয়ে মৃদু মৃদু টানতে টানতে ঈষৎ কুণ্ঠিত হ'য়ে বলে, তবে আর বেশীক্ষণ ব'সবো না দাদা। বরং অন্য এক সময়ে আসবো। তারপর জিজ্ঞাসা করে, তা সেখানকার কাজকর্ম্ম সব নির্ব্বিঘ্নে সেরে এসেছ তো ?

ধর্ম্মদাসের কথায় ক্ষুদিরামের মনে পড়ে গয়ার কথা। গদাধরের মর্ম্মর মূর্ত্তি, অমৃতময় বাণী। তাই আবেগের সঙ্গে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে, হ্যাঁ, গদাধরের কৃপায় নির্ব্বিঘ্নে ও শান্তিতে সব কাজ শেষ ক'রে এসেছি। আর গয়ায় গিয়ে যে আনন্দ পেয়েছি তেমন আর কাশী, বৃন্দাবন, রামেশ্বর বা অযোধ্যাতে গিয়েও পাই নি।

ধর্ম্মদাস একটা দীর্ঘ টান দিয়ে হুঁকাটা দে'য়ালের গায়ে ঠেসিয়ে রেখে

বলে, আচ্ছা দাদা, এখন উঠি। তোমার আবার পূজো-পাঠ আছে। অন্য সময় এসে তোমার গয়ার কাহিনী শুনবো। ব'লে উঠে দাঁড়ায়।

ক্ষুদিরাম বলে, আমিই ভেবেছিলাম পূজো-পাঠ সেরে তোমার বাড়ী যাবো, তা আগেই তুমি এসে প'ড়লে।

ধর্ম্মদাস দাওয়া থেকে নামতে নামতে বলে, বেশ তো যদি সময় পাও যেও না, আমি বাড়ীতেই আছি। ব'লে বেরিয়ে আসে। আর ক্ষুদিরাম ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করে।

ঠাকুরঘরে ঢুকতে চন্দ্রমণি বলে, আজ বড় দেরী ক'রে ফেললে।

ক্ষুদিরামের মন তখন আবার সেই মেয়েটির সন্ধান ক'রে ফিরছে। তাই উদাস কণ্ঠে বলে, হ্যাঁ, একটু দেরী হ'ল। আবার ধর্ম্মদাস এসে··· কথাটা শেষ না ক'রে জিজ্ঞাসা করে, পূজোর গোছ সব হ'য়েছে ?

চন্দ্রমণি চন্দনপাটা তুলতে তুলতে বলে, হ্যাঁ, সবই হ'য়েছে।

ক্ষুদিরাম রঘুবীরের সম্মুখস্থ পূজোর আসনে বসে। কোশাকুশি থেকে আচমনের জল নেয়। তারপর চন্দ্রমণির দিকে চেয়ে বলে, তা হ'লে আমি পূজোয় ব'সছি।

চন্দ্রমণি ঘৃতের প্রদীপটা জ্বালতে জ্বালতে বলে, হ্যাঁ ব'স।

ক্ষুদিরাম আচমন ক'রে আঁখি নিমিলীত করে। আর চন্দ্রমণি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে।

চক্ষু নিমিলীত করার সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই মেয়েটির মুখখানি চোখের উপর ভেসে ওঠে। মনটাও রঘুবীরের চিন্তা ছেড়ে ব্যাকুল হ'য়ে ছুটে চলে বালিকার সন্ধান নিতে। নিঃসংশয় সে হ'য়েছে—মেয়েটা মানবী নয়। হ'লে চক্ষের পলকে এমন মিলিয়ে যেতে পারতো না। তা' ছাড়া ধর্ম্মদাসও দেখতে পেত। আর জীবনের এই ষাট বৎসরের মধ্যে কোন বালিকার দেহে ঐ রূপ ও লাবণ্য সে দেখে নি। তার উপরে যেমন মিষ্টি মধুর হাসি—তেমনি কণ্ঠস্বর। যেন বীণার ঝঙ্কার। চক্ষের পলকে তাকে অভিভূত ক'রে পরিচয়টা পর্য্যন্ত নিতে দিল না। হাসি দিয়ে

ভুলিয়ে দিল। অপ্রতিভ ক'রে ফেললো। আবার ব'ললে, দু'মাস গয়ায় থেকে আমাকে ভুলে গেলে ? যেন কত চেনা। গয়ায় যাবার আগে পর্য্যন্ত দেখা হ'য়েছে।

ভাবতে ভাবতে ক্ষুদিরাম তন্ময় হ'য়ে যায়। বুক আর মুখ রক্তিম হ'য়ে ওঠে। বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হ'য়ে আসে। আর সেই ভাবাবেশে দেখে—তার আরাধ্যা দেবী মা শীতলা যেন মিট্ মিট্ ক'রে হাসছে। আর বুঝতে বিলম্ব হয় না—কন্যারূপিনী আরাধ্যা দেবী মা শীতলাই তাকে ফুল তোলায় সহায়তা করেছে। সেই সঙ্গে অনুতপ্ত ও কুণ্ঠিত হয় তাঁর কথা মনে ক'রে—"দু'মাস গয়ায় থেকে আমায় ভুলে গেলে ?" অনুতাপে অনুশোচনায় মরমে মরে যায়। আঁখি বিগলিত হ'য়ে ধারা নামে। ক্রন্দন-বিজড়িত কণ্ঠে বলে, আমায় ক্ষমা কর মা। সত্যি গদাধর আমায় সব ভুলিয়ে দিয়েছে।

●

আঠারো

চন্দ্রমণি ও ক্ষুদিরামের উদ্বেগ এবং উৎকণ্ঠা বাড়িয়ে দিনগুলো চ'লে যায়। আর এই আশা-নিরাশার মধ্য দিয়ে আবার ফাল্গুন মাস ঘুরে আসে।

যদিও ধনী এবং প্রসন্ন চন্দ্রমণির মুখে নীলপূজোর দিন যুগীদের শিব মন্দিরের সম্মুখে উদরে জ্যোতিঃ প্রবেশের ও সঙ্গে সঙ্গে গর্ভসঞ্চারের কথা শুনে তাচ্ছল্য ভরে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল, এবং নানাপ্রকার ভয় দেখিয়ে শঙ্কিত ক'রে তুলেছিল, কিন্তু কয়েক মাস পরে তার শারীরিক পরিবর্ত্তন

দেখে শুধু অবাক হয় না—বিস্মিত কণ্ঠে বলে, সত্যি বৌদি, যা ব'ললে তাই হ'ল ! এমন ধারা তো বাপু বাপের জন্মে শুনিনি ! তা বাপু তুমি এবার বিয়'লে বাঁচবে না।

ধনীর কথা শুনে চন্দ্রমণি ও প্রসন্ন উভয়েই বিস্মিত হয়। চন্দ্রমণি চোখ দুটো বিস্ফারিত ক'রে শঙ্কিত কণ্ঠে বলে, কেন লো ?

ধনী চন্দ্রমণির উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে পরম বিজ্ঞের মত বলে, রূপ যেন ফেটে প'ড়েছে। কে ব'লবে বুড়ো মাগী, তিন ছেলের মা, ঘরে ব্যাটার বউ আছে।

প্রসন্ন ধনীর কথা সমর্থন ক'রে বলে, তা সত্যি খুড়ি ! তোমার যেন আবার যৌবন ফিরে এসেছে !

চন্দ্রমণিকে উত্তর দেবার অবকাশ না দিয়ে ধনী আবার বলে, সেই জন্যই তো ভয় হ'চ্ছে। আর সকলেই তাই বলাবলি ক'রছে।

ধনীর কথায় চন্দ্রমণি ভয়ে পাংশু হ'য়ে ওঠে। শঙ্কিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, তাই নাকি ! কে ব'লছে লো ?

ধনী চন্দ্রমণির বিবর্ণ মুখের দিকে চেয়ে সংযত হ'য়ে যায়। তাই উপেক্ষা ভরে বলে, তুমিও যেমন—ও কি আর সত্যিই ব'লেছে—ঠাট্টা ক'রেছে।

চন্দ্রমণির উৎকণ্ঠা তবুও দূর হয় না। তাই তেমনি আগ্রহ ভরে জিজ্ঞাসা করে, তবু শুনি না, কে ব'লছে ?

ধনী উপেক্ষা ভরে বলে, এই সুখলাল ঠাকুরের বউ ব'লছিল। তবে কি আর সত্যিই ব'লেছে—তোমার রূপ দেখে ঠাট্টা ক'রে ব'লেছে। তারপর চন্দ্রমণির মন থেকে ভয়টা দূর ক'রে দেবার জন্য বলে, তুমি বাপু ঠাট্টা বোঝ না। এমন ভয় পাবে জানলে কথাটা তুলতাম না।

চন্দ্রমণি জবাব দেবার আগে প্রসন্ন ঈষৎ গম্ভীর হ'য়ে বলে, তা বাপু—মানুষের জীবন মরণ নিয়ে ঠাট্টা করা উচিৎ নয়। বিশেষ ক'রে গর্ভ অবস্থায়।

প্রসবের কথায় ধনী কুণ্ঠিত হ'য়ে পড়ে। সলজ্জ কণ্ঠে বলে, বৌদি, এমন ভয় পাবে জানলে আমি ব'লতাম না। আর বৌদি তো প্রথম বিয়ুচ্ছে না যে ভয় পাবে। তারপর চন্দ্রমণির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে সান্ত্বনা দিয়ে হাত নেড়ে নেড়ে আবার বলে, তোমার ভয় নেই বাপু! আঁতুড় ঘরে আমি থাকবো, নির্ব্বিঘ্নে খালাস করিয়ে দেব। গায়ে এতটুকু আঁচড় লাগতে দেব না। তা' হ'লে হবে তো?

এইবার চন্দ্রমণির ভয়টা দূর হয়, ও মুখের প্রশান্তিটা ফিরে আসে। ধনীর উপর দৃষ্টি রেখে উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে, তবে আর কোন ভয় নেই। আমি মনে মনে ঠিকই ক'রে রেখেছিলাম আঁতুড় তুলতে তোকেই ডাকবো।

প্রসন্ন চন্দ্রমণিকে আরও উৎসাহ এবং সাহস দিয়ে বলে, তোমার কোন ভয় নেই খুড়ি, আমি আসবো। ব'লে উঠে দাঁড়ায়।

প্রসন্নর দেখাদেখি ধনীও উঠে পড়ে।

চন্দ্রমণি বিস্মিত কণ্ঠে বলে, ওমা! উঠলি কেন লো?

ধনী জবাব দিবার আগে প্রসন্ন বলে বেলা প'ড়ে এল, আর ব'সব না খুড়ি, অনেক কাজ আছে। চন্দ্রমণিকে উত্তর দিবার অবকাশ না দিয়ে ঘর ছেড়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে।

ধনীও প্রসন্নকে অনুসরণ ক'রে যেতে যেতে বলে, আর আমি তো একা মানুষ—ছিষ্টির কাজ প'ড়ে আছে।

চন্দ্রমণি উঠে ওদের অনুসরণ ক'রে আসতে আসতে বলে, তবে আয়। আমিও গা ধুয়ে এসে ঠাকুরের শীতলের জোগাড় ক'রে রাখি। ব'লে ওদের সদর দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে দেয়। ওরা চ'লে গেলে চন্দ্রমণি সংসারের দু' একটা কাজকর্ম্ম সেরে ঘড়া গামছা নিয়ে গা ধুতে বেরিয়ে আসে।

সেদিন সকাল বেলা। চন্দ্রমণি ঠাকুরঘরে পূজার গোছ ক'রছে। আর ক্ষুদিরাম সাজি নিয়ে যথানিয়মে ফুল তুলতে গেছে। চন্দ্রমণি পূজার

গোছ ক'রতে ক'রতে সহসা প্রসব বেদনা বোধ করে। পুত্রবতী সে। পুত্র সম্ভাবনার বেদনা তার অজানা নেই। তাই মনটা ভয়ে শঙ্কিত হ'য়ে ওঠে। কারণ পূজার গোছ তখনও শেষ হয় নি। তা ছাড়া ঠাকুরের ভোগ রান্নাও বাকী আছে। এখন যদি কিছু হয় তা হ'লে রঘুবীরকে উপবাসী থাকতে হবে। যদিও পুত্রবধূ আছে এবং সব কিছু ক'রতেও পারে বা জানে, কিন্তু দেবতার ভোগ তাকে দিয়ে রান্না করালে চ'লবে না। কারণ সে ইষ্ট-মন্ত্র নেয় নি। তাছাড়া এই সকাল বেলা প্রসব হ'য়ে প'ড়লে সকল দিকে একটা বিভ্রাট ঘ'টবে। স্বামী তার প্রাতঃকৃত্য সেরে পূজার ফুল তুলতে গেছে। এখনই এসে পূজায় ব'সবে। কিন্তু যেই শুনবে তার প্রসব বেদনার কথা তখনই মনটা বিষাদে ভ'রে যাবে। যদিও তার মানসপুত্র গদাধর আসছেন, তবুও রঘুবীরের পূজা থেকে বঞ্চিত হ'য়ে ক্ষুণ্ণই হবে। অথচ না ব'লেও উপায় নেই। কারণ প্রসব হ'য়ে প'ড়লে ঠাকুরকে তো আর উপবাসী রাখা চ'লবে না। তাঁর পূজাও ক'রতে হ'বে, এবং ভোগও দিতে হবে। আর সে ব্যবস্থা তার স্বামীকেই ক'রতে হবে। তাই ক্ষুদিরাম ফুল নিয়ে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ ক'রতেই চন্দ্রমণি পাংশু মুখে ঠাকুরঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে। গভীর উৎকণ্ঠার সঙ্গে বলে, ওগো শুনছ ?

চন্দ্রমণির আহ্বানে ক্ষুদিরামের তন্ময়তা টুটে যায়। চ'মকে উঠে দৃষ্টি তুলে বলে, অ্যাঁ!

ক্ষুদিরাম ঘরের দাওয়ার কাছে এগিয়ে আসতেই চন্দ্রমণি ঈষৎ চাপা স্বরে বলে, আমার যেন কেমন কেমন মনে হ'চ্ছে। তুমি বাপু ধনীকে খবর দাও। আর ঠাকুরের ব্যবস্থা কর। হ'য়ে প'ড়লে তোমাকে বা রামকুমারকে দিয়ে তো আর রঘুবীরের পূজা হবে না।

চন্দ্রমণির কথা শুনে ক্ষুদিরাম নির্ব্বাক হ'য়ে শুধু তার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে থাকে। যদিও কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে একটা আনন্দের শিহরণ ব'য়ে যায়। কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য। পর

মুহূর্ত্তেই মনটা বিষাদে এবং চিন্তায় আচ্ছন্ন হ'য়ে আসে। এখনই সে ফুল তুলতে তুলতে কত কি ভেবে এসেছে।

সে জানে স্ত্রী তার আসন্নপ্রসবা। আজই হোক কালই হোক প্রসূতি হবে। আর প্রসূতি হ'লে সমগ্র পরিবারেই অশুচি হ'য়ে যাবে। তাদের কারো দিয়ে তখন আর দেবসেবা হবে না। অন্য লোককে ডেকে এনে তার আরাধ্য দেবদেবীর পূজা করাতে হবে। ভোগ রাঁধাতে হবে। তারই আরাধ্য দেবদেবীকে স্পর্শ পর্য্যন্ত ক'রতে পারবে না। তাই অনেক ফুল সে তুলে এনেছে। মনের মত ক'রে সাজাবে তার দেব-দেবীকে। আপন হাতে মালা গেঁথে পরিয়ে দেবে গলায়। আর সেই আনন্দ নিয়ে বাড়ীর ভেতরে ঢুকেছে। কিন্তু একি! তার সকল আনন্দ বিষাদে পরিণত ক'রে, পূজার বিঘ্ন স্থষ্টি ক'রে, কল্পনা ধূলিস্যাৎ ক'রে বহু আকাঙ্ক্ষিত, বিনিদ্র রজনীর স্বপ্নে-রচা মানসপুত্র গদাধর আসবে এমন অসময়ে। এই কি দেবতার আবির্ভাবের সময়? শাস্ত্র সম্বন্ধে যতটুকু জ্ঞান তার আছে তাতে সে জানে—অসাধারণ হ'য়ে যারা এই পৃথিবীতে আসে, তারা এমন দিবা দ্বিপ্রহরে আসে না। আসে না, এমন বিশৃঙ্খলা স্থষ্টি ক'রে। অথচ স্ত্রী তাকে অকারণ ভাবিয়ে তোলে নি। তা ছাড়া সে প্রথম প্রসবা নয়। জাতকের আগমন সম্ভাবনার সূচনা সে নিশ্চয় বুঝতে পেরেছে। ভাবতে ভাবতে ক্ষুদিরাম বিহ্বল হ'য়ে যায়। সংশয় ও সন্দেহ এসে হৃদয়কে তোলপাড় ক'রতে থাকে। রেখায় রেখায় তার অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে মুখে। মুখখানা বজ্রাহত বৃক্ষের মত শুকিয়ে আসে। ভাবে—মিথ্যায় সে এতদিন আকাশ কুসুম রচনা ক'রে এসেছে। আর সেই সুখ-স্বপ্ন নিয়ে বহু বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছে। গগনচারী হ'য়ে চন্দ্রালোকে পরিভ্রমণ ক'রে ফিরছে। কিন্তু গদাধর তাকে ছলনা ক'রেছে। মিথ্যা আশা দিয়ে সান্ত্বনা দিয়েছে। কিন্তু এ ছলনা করার কি প্রয়োজন ছিল? দেবতাকে পুত্ররূপে পাবার কল্পনা ভুলক্রমেও কোনদিন সে করে নি, বরং গদাধর যখন তাকে বললে—"পুত্ররূপে তোমার ঘরে জন্মগ্রহণ ক'রবো।" সে

নিজের দারিদ্র্যের কথা ভেবে আপত্তিই ক'রেছিল। তা সত্ত্বেও তিনি তার কোন ত্রুটী নেবেন না ব'লে সম্মত করালেন। আর এই হ'ল তার পরিণাম। আরাধ্য দেবতা রঘুবীরের চরণ স্পর্শ করার সুযোগটুকু না দিয়ে—তাদের অভুক্ত রেখে হবে তাঁর আবির্ভাব। পৃথিবী যখন কর্ম্মব্যস্ত। স্বার্থ সুখানুসন্ধানে মানুষ যখন ছুটে চ'লেছে পঙ্কিলতার ভিতর দিয়ে—তখন আসবে গদাধর ; তার মানসপুত্র নররূপে, জাতক হ'য়ে, গৃহস্থের অকল্যাণ ক'রে ? কর্ম্মে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ক'রে জগতের কল্যাণকল্পে ? সঙ্গে সঙ্গে আবার মনে হয়—না না, গদাধর এমন অসময়ে পূজায় বিঘ্ন সৃষ্টি ক'রে আসবে না। আসতে পারে না। এ সময় তারাই আসে যারা অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে। তারা গৃহস্থের কল্যাণ, অকল্যাণ দেখে না, ভাবে না অপরের সুখ সুবিধার কথা।

স্বামীকে নীরবে ভাবতে দেখে এবং মুখের প্রশান্তিটা মিলিয়ে যেতে দেখে চন্দ্রমণি বেশ মর্ম্মাহত হয়। মনে মনে বোঝে—দেবসেবায় বঞ্চিত হবার জন্যই স্বামী তার ব্যথিত হ'য়েছে, কিন্তু সান্ত্বনা দেবার উপায়ও কিছু খুঁজে পায় না। তাই সলজ্জ কণ্ঠে বলে, তুমি ভেবো না। ঠাকুর কোন অপরাধ নেবেন না।

স্ত্রীর কথায় ক্ষুদিরামের ভাবনা মিলিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে নিঃসংশয় হয় নিজের ধারণা সম্বন্ধে। তাই দৃঢ়তার সঙ্গে বলে, তুমিও ভেব না। যিনি আসছেন তিনি পূজায় বিঘ্ন সৃষ্টি ক'রে আসবেন না।

স্বামীর কথায় চন্দ্রমণির উৎকণ্ঠা ও সংশয় দূর হয়। সঙ্গে সঙ্গে মুখ থেকে দুর্ভাবনার রেখাগুলো মিলিয়ে যায়। সে জানে স্বামী তার দেবতুল্য বাক্য তাঁর ঋষিবাক্যের মতন। তাঁর কথা মিথ্যা হ'তে পারে না। তাই হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠে বলে, তবে এস! আর দেরী ক'র না। তাড়াতাড়ি, পূজোটা সেরে নাও। এ বেলা না হই, ও বেলা নিশ্চয় হব।

ক্ষুদিরাম এবার দাওয়ায় উঠে আসে। ঠাকুরঘরের দিকে যেতে যেতে বলে, হ্যাঁ, আজ রাত্রেই প্রসব হবে।

উনিশ

সন্ধ্যার পর থেকেই চন্দ্রমণির প্রসব বেদনা প্রবল হ'য়ে ওঠে। আর সংসারের কাজ করা সম্ভব হয় না। সংবাদ পেয়ে ধনী ও প্রসন্ন উভয়েই এসে উপস্থিত হয়।

ইতিপূর্ব্বেই ক্ষুদিরাম ঢেঁকির থেকে ঢেঁকিটা সরিয়ে নিয়ে আঁতুড়ঘরে পরিবর্ত্তিত ক'রে রেখেছিল। যদিও ঘরখানার ইতিপূর্ব্বে কোন আব্রু ছিল না বা প্রয়োজনও হয় নি, কিন্তু প্রসূতিগারে রূপান্তরিত করার জন্য ও তখনো শীতের আমেজ থাকায় ছেঁড়া কাঁথা, কাপড় ইত্যাদি দিয়ে কোন মতে ঘিরে দেওয়া হ'য়েছিল।

ধনী এসে চন্দ্রমণিকে নিয়ে সেই ঘরে ঢোকে। ছেঁড়া কাঁথা কাপড় বিছিয়ে একটা বিছানা ক'রে দেয়। তারপর পুত্রবধূর উদ্দেশ্যে বলে, বৌমা! তোমরা সব তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া সেরে নাও গে। আর আমাকে এক গামলা গরম জল ক'রে দাও। একটু সেঁক-তাপ করি। ব্যথাটাও ক'মবে, আর যা হবার তাড়াতাড়ি হবে।

পুত্রবধূ রান্নাঘর থেকে সাড়া দিয়ে বলে, আচ্ছা!

প্রসন্ন রান্নাঘরের দাওয়ায় উঠে এসে পুত্রবধূর দিকে চেয়ে বলে, ও দিকের কোন কাজের জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না বৌমা, সে সব আমি ক'রে দিচ্ছি। তুমি খাওয়ার হাঙ্গামা চুকিয়ে নাও।

পুত্রবধূ নীরবে সায় দেয়।

প্রসন্ন আবার আঁতুড় ঘরের সম্মুখে এসে ভিতরে দৃষ্টি ফেলে ধনীকে উদ্দেশ্য ক'রে বলে, ধনী, এধারে যা কিছু করার আমাকে বলিস। বৌ ছেলেমানুষ, একা আর কত ক'রবে।

ধনী চন্দ্রমণির পেটে তেল মালিশ ক'রতে ক'রতে প্রসন্নর দিকে চেয়ে বলে, তুই কয়েকখানা চেঁচালি জোগাড় ক'রে এনে রাখ দেখি। নাড়ী কাটতে তো লাগবে।

প্রসন্ন কোন জবাব না দিয়ে নীরবে চ'লে যায়।

পুত্রবধূ অন্য দিনের তুলনায় তাড়াতাড়ি হেঁসেলের কাজ সেরে নেয়। সকলেই খাওয়া দাওয়া সেরে যে যার ঘরে শুতে আসে। প্রসন্ন পুত্র-বধূকেও শুতে পাঠিয়ে দেয়। পুত্রবধূ প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করে। কুণ্ঠিত হ'য়ে বলে, আমি শুতে যাব, যদি কিছু লাগে-টাগে...

পুত্রবধূকে কথাটা শেষ করার অবকাশ না দিয়ে প্রসন্ন বলে, আমি তো আছি বৌমা। আর সে রকম যদি কিছু দরকার হয়-ই তখন নয় তোমাকে ডাকবো। ছেলেমানুষ সারাদিন খাটা-খাট্নি ক'রেছ। আর এখন তো তোমাকে একা একাই সব কাজ ক'রতে হবে। তুমি একটু শোও গে।

পুত্রবধূ আর দ্বিরুক্তি না ক'রে শয়ন কক্ষে এসে ঢোকে।

রাত্রি বেড়ে চলে। ক্ষুদিরাম শয্যায় শুয়ে শুয়ে শোনে—পত্নীর কাতরোক্তি। ঘুমাবার চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। স্ত্রীর কাতরোক্তির সঙ্গে তারও উৎকণ্ঠা বেড়ে যায়। ব্যথাটা সেও মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করে, কিন্তু প্রতিকার করার উপায় খুঁজে পায় না। শুধু শয্যায় প'ড়ে ছট্ ফট্ করে। শেষ পর্য্যন্ত আর শুয়ে থাকতেও পারে না—উঠে বসে। রামেশ্বরের মাথার শিয়রে জানলাটা খোলা দেখে ব্যস্ত হ'য়ে শয্যা থেকে নেমে জানলার কাছে এসে দাঁড়ায়। বাইরে দৃষ্টি ফেলে। দেখে—চারিদিকে বিরাজ ক'রছে গভীর স্তব্ধতা। রাত্রি যেন ধ্যানমগ্না।

শুধু তার পত্নীর ব্যথাকাতর কণ্ঠস্বরের সঙ্গে ঝিল্লী আর দু'একটা নিশাচর পাখী সেই ধ্যান ভঙ্গের নিষ্ফল প্রচেষ্টা ক'রে চ'লেছে।

আজ শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া। বসন্তের মেঘমুক্ত নির্ম্মল আকাশ। তারায় তারায় জ্যোতির্ম্ময়। মনটা সব ভাবনা রেখে আকাশের দিকে ছুটে যায়। উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা মিলিয়ে আসে। মনে মনে ভাবে—দেবতার আবির্ভাবের এই তো লগ্ন। এমন শান্ত সমাহিত পরিবেশেই তো দেবতা অবতীর্ণ হবে ধরায়। মনটা শূন্য থেকে আবার মাটিতে নেমে আসে। তিথি আর লগ্নটা দেখার বাসনা জাগে প্রবল। নিদ্রিত পুত্রের মুখের দিকে চেয়ে জানলাটা বন্ধ ক'রে দেয়। সেখান থেকে স'রে এসে নিভানো প্রদীপটা জ্বালে। ঘরের কুলুঙ্গি থেকে পাঁজিখানা টেনে নেয়। দেবতার আবির্ভাব যে আজ নিশীথেই হবে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হ'য়েছে। তাই গভীর আগ্রহ নিয়ে পাঁজিখানা খোলে। সাগ্রহ দৃষ্টিতে দেখে—৬ই ফাল্গুন, ১৭ই ফেব্রুয়ারী, বুধবার, দ্বিতীয়া তিথি। তবে রাত্রি শেষ লগ্নটা হ'চ্ছে শুভ মুহূর্ত্ত সূচক। দ্বিতীয়া তিথি পূর্ব্ব ভাদ্রপদ নক্ষত্রের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে সিদ্ধি যোগের সূচনা ক'রেছে। আর রবি, বুধ, শুক্র একত্রে মিলিত হ'চ্ছে। সেই সঙ্গে শুক্র, শনি ও মঙ্গল তুঙ্গস্থান অধিকার ক'রেছে।

ইতিপূর্ব্বে সে আকাশের দিকে দৃষ্টি তুলেছিল বটে, কিন্তু রাত্রিটা মোটেই অনুমান করে নি। তাই পাঁজিটা উল্টে রেখে আবার জানলার কাছে এসে দাঁড়ায়। জানলাটা খুলে ঊর্দ্ধে দৃষ্টি তোলে। নিশি ভোর হ'তে তখনও দু'দণ্ড দেরী আছে। জানলাটা বন্ধ ক'রে পুনরায় প্রদীপের কাছে আসে। পাঁজিটা তুলে নেয়। সঙ্গে সঙ্গে নিজের অস্থিরতা ও উদ্বেগের জন্য লজ্জা বোধ করে। ভাবে—তার কি মাথা খারাপ হ'ল ? সে এ সব কি ভাবছে ? যে জীবনে বহু দুর্য্যোগময় রজনী দেবতার উপর নির্ভর ক'রে নির্ভয়ে অতিক্রম ক'রে এসেছে। একটি মুহূর্ত্তের জন্যে ব্যথা, বেদনা, অনুশোচনা, আক্ষেপ বা উৎকণ্ঠায় দুর্ব্বল ও কাতর হয় নি।

আর আজ ষাট বছর বয়সে……ছিঃ ছিঃ, তা ছাড়া এতো গদাধরকে অবিশ্বাস করা হ'চ্ছে। স্বেচ্ছায় যিনি তার কুটিরে আসছেন তাঁর সম্বন্ধে এত সব দেখার কি প্রয়োজন আছে ? যখন যে লগ্নে খুশী তিনি আসুন না। ভালমন্দ যাঁর ইচ্ছাধীন তাঁর জন্য এই উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ অর্থহীন।

ক্ষুদিরাম পাঁজিখানা যথাস্থানে রেখে প্রদীপটা নিভিয়ে দিয়ে শয্যায় উঠে দেহটা এলিয়ে দেয়। তারপর রঘুবীরের চিন্তা ক'রতে ক'রতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে—ঘরখানা আলোয় আলোয় উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠ্‌ছে। যেন আলোর বন্যা এসে লেগেছে তার জীর্ণ কুটীরে। সেই দ্যুতিতে চোখ ঝ'লসে ওঠে। দেখে…বিস্ময়ে অভিভূত হ'য়ে যায়। নিঃশ্বাস যেন্ রোধ হ'য়ে আসে। কৌতূহল আর উদ্বেগে চোখ দুটো বিস্ফারিত হ'য়ে ওঠে। আর সে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বিস্ফারিত নয়নে দেখে—এক জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি শূন্য থেকে নেমে আসছে তার কুটীরে। হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম। প্রশান্ত মুখে মধুর হাসি। কি যেন তাকে ব'লতে যাবে—আর ঠিক সেই সময়ে ধনী উৎফুল্ল কণ্ঠে চীৎকার ক'রে বলে, শাঁখ বাজাও গো, উলু দাও, ছেলে হ'য়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে প্রসন্ন উলু দিয়ে ওঠে।

হুলুধ্বনিতে ও ধনীর চীৎকারে ক্ষুদিরামের ঘুম ভেঙ্গে যায়। ধড়মড় ক'রে উঠে বসে। প্রবল কৌতূহল নিয়ে দোর খুলে বেরিয়ে আসে। দাওয়ায় দাঁড়িয়ে দূর আকাশে আঁখি তোলে। দেখে—নিশি ভোর হ'তে আর অর্দ্ধদণ্ড বাকী আছে। যে শুভলগ্নে সে তার মানস পুত্রের আবির্ভাব কামনা ক'রেছে সেই ক্ষণেই তার গদাধর এসেছে। আর এই জন্মক্ষণই নির্দ্দেশ ক'রেছে তার অসামান্যতার কথা। মনটা নবজাত পুত্র-গৌরবে আনন্দে অধীর হ'য়ে ওঠে। সব ভুলে একেবারে প্রসূতির ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ায়।

ক্ষুদিরামের সঙ্গে সঙ্গে সকলেরই ঘুম ভেঙ্গে যায়। পুত্রবধূ শাঁখে ফুঁ দিতে দিতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে। রামকুমার এবং রামেশ্বরও বাইরে

এসে দাঁড়ায়। সেই সঙ্গে শঙ্খ ও হুলুধ্বনি শুনে দু'চারজন প্রতিবেশিনীও কৌতূহলী হ'য়ে আসে। আগ্রহ ভরে কেউ জিজ্ঞাসা করে, কি হ'ল গো ?

ধনী দরজার কাছে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে নেড়ে বলে, ছেলে হ'য়েছে গো—ছেলে। যেন সোনার চাঁদ। যেমন রূপ তেমনি মোটা-সোটা। কে ব'লবে এই হ'য়েছে, যেন ছ' মাসের।

শুনতে শুনতে সকলেরই কৌতূহল ও আগ্রহ বেড়ে যায়। নবজাত শিশুকে দেখার বাসনা প্রবল হ'য়ে ওঠে। তাই প্রায় সকলেই অনুরোধ ক'রে বলে, একবার দেখাও না গো। দেখি কেমন হ'লো।

সকলের অনুরোধে ধনী ঘুরে ভিতরে আসে। প্রসূতির কোলের কাছ থেকে ছেলেকে নিতে গিয়ে দেখে শিশু নেই! ভয়ে, বিস্ময়ে, উৎকণ্ঠায় বুকখানা ধক্ ক'রে ওঠে। মুখখানা পাংশু হ'য়ে যায়। সর্ব্ব শরীর কাঁপতে থাকে। গলা শুকিয়ে আসে। কি যে ক'রবে, আর কি যে ব'লবে ভেবে পায় না। দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ও বিস্ফারিত ক'রে ঘরের চারিদিকে নিক্ষেপ করে, কিন্তু কোথাও শিশুর অস্তিত্ব দেখতে পায় না। ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে চন্দ্রমণিকে ডাকে, বৌদি! ও বৌদি!

চন্দ্রমণির আচ্ছন্নভাব তখনও কাটে নি। তাই কোন সাড়া দেয় না।

ধনী প্রদীপের শিখাটাকে বাড়িয়ে দিয়ে আবার ঘরের চারিদিকে চায়। কিন্তু না, কোথাও শিশুর চিহ্ন দেখতে পায় না। ভয়ে ভাবনায় মাথাটা ঘুরে ওঠে। চোখের পাতায় অন্ধকার নামে। মনে মনে ভাবে—তবে কি তার অসতর্ক মুহূর্ত্তে ছেলেকে কুকুর শিয়ালে টেনে নিয়ে গেল ? আর এ বিচিত্রও নয় বা অসম্ভবও নয়। কারণ ঘরখানা একরকম অরক্ষিত এবং রাত্রিও নিশুতি। যখন সে আনন্দে অধীর হ'য়ে শিশুর আগমন বার্ত্তা জানতে দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে সেই সময় হয়তো······বাইরে আকুল আগ্রহ নিয়ে যারা শিশুকে দেখার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে তাদেরই বা এখন কি ব'লবে, আর একটু পরে চন্দ্রমণি যখন আচ্ছন্ন ভাব কাটিয়ে

উঠে গভীর আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রবে, ধনী, কি হ'ল রে একবার দেখা তো······তখন কি কৈফিয়ৎ সে দেবে ? ভাবতে ভাবতে চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসে।

ধনীর নীরবতায় ও নিষ্ক্রিয়তায় সকলেই উৎসুক হ'য়ে ওঠে। ক্ষুদিরাম তার বয়স, স্থান, কাল, পাত্র ভুলে ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, কিরে ধনী, কি হ'ল ?

ক্ষুদিরামের কথায় ধনীর বুকখানা আবার কেঁপে ওঠে। নিজের অসতর্কতা ও নির্ব্বুদ্ধিতার জন্যে হায় হায় করে। লজ্জায়, ঘৃণায়, ভয়ে মরমে মরে যায়। মনে মনে মৃত্যু কামনা করে। জবাব আর মুখে আসে না। শুধু বিভ্রান্তের মত দৃষ্টি মেলে নির্ব্বাক হ'য়ে চেয়ে থাকে।

ধনীর নীরবতায় ক্ষুদিরামের মনটা শঙ্কিত হ'য়ে ওঠে। কৌতূহল ও উৎকণ্ঠা তীক্ষ্ণ ও তীব্র হ'য়ে বুকটাকে তোলপাড় ক'রে তোলে। ধৈর্য্য ও সংযম হারিয়ে ফেলে। ভুলে যায় শোভন এবং শিষ্টাচারের কথা। বয়সের ধর্ম্ম। নররূপী গদাধরকে দেখার বাসনায় মন তার প্রথম পুত্রমুখ দর্শনাভিলাষী যুবকের মত চঞ্চল ও উদ্দাম হ'য়ে ওঠে। ইতি-পূর্ব্বে দেখা স্বপ্নের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে চায় তার নবজাত শিশুকে। মূর্ত্তি তার জ্যোতির্ম্ময় কি না ? প্রশান্ত মুখে সেই হাসি আছে কি না ? কিন্তু ধনীকে স্থাণুর ন্যায় পাংশুমুখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আশা মরীচিকা হ'য়ে আসে। আনন্দ বেদনায় পর্য্যবসিত হ'য়ে মুখখানাকে হতাশ ক'রে তোলে। তবু সাধ্যমত সে ভাবটাকে দমন ক'রে দরজার কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করে, কি রে, চুপ ক'রে আছিস্ কেন ? কি হ'ল ?

ধনী আবার ব্যাকুল ও তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ঘরের চারিদিকে চাইতে চাইতে বিবর্ণ মুখে কম্পিত কণ্ঠে বলে, ছেলেকে তো দেখতে পাচ্ছি নে !

ধনীর কথা শুনে সকলেই চমকে ওঠে। বিহ্বল দৃষ্টিতে এ ওর মুখের দিকে চাইতে থাকে।

প্রসন্ন বিস্মিত কণ্ঠে বলে, ওমা ! সে কি কথা ! তারপর একটু চিন্তা

ক'রে বলে, আলো ধ'রে ঘরের চারিদিক একটু ভাল ক'রে খুঁজে দেখ না। হড়্‌কে যদি কোথাও গিয়ে পড়ে...

একজন বলে, যে ঘর বাপু—কোন আব্রু নেই কিছু না। শিয়াল কুকুরেও হয়তো টেনে নিয়ে যেতে পারে।

আর একজন ভয়ার্ত্ত ও বিস্মিত কণ্ঠে বলে, ওমা! সে কি কথা! মানুষজন ঘরে থাকতে শেয়াল কুকুরে টেনে নিয়ে যাবে কি গো!

কেউ বলে, তা বাপু চারিদিকে একবার দেখলে তো হয়।

রামকুমার ব্যস্ত হ'য়ে আলো নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। ধনী প্রদীপ নিয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টি ফেলতে ফেলতে ঘরের অন্য কোণে এগিয়ে যায়।

ঘরখানা ঢেঁকির ঘর ব'লে ধান সিদ্ধ বা চিঁড়ে ইত্যাদি ভাজার জন্যে একটা উনুন বরাবরই পাতা ছিল। ঘরখানা আঁতুড় ঘরে পরিবর্ত্তিত হ'লেও উনানটার কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নি বা আচ্ছাদন দিয়ে ঢেকেও দেওয়া হয় নি। কারণ প্রসবান্তে ঘরে আবার ঢেঁকিই পাতা হবে এবং উনানেরও প্রয়োজন হবে। তাই সেটাকে ভেঙে ফেলা বা সরিয়ে ফেলা হয় নি।

ধনী প্রদীপ নিয়ে উনানের কাছে আসতেই দেখে—নবজাত শিশু উনানের ভেতর ঢুকে হাত পা ছুঁড়ে খেলা ক'রছে। আর সারা অঙ্গ ভস্মে মাখামাখি হ'য়ে গেছে। চক্ষের পলকে ধনীর ভয় ও ভাবনা মিলিয়ে যায়। চোখে মুখে আনন্দ উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে। প্রদীপটা নামিয়ে রেখে ব্যগ্রভাবে উনানের ভিতর হাত ঢুকিয়ে দেয়। সযত্নে শিশুকে বুকে তুলে নিয়ে অধীর আনন্দে চীৎকার ক'রে ক্ষুদিরামের উদ্দেশ্যে বলে, এ ছেলে তোমার ঘরি হবে না দাদা। জন্মেই একেবারে ছাই মেখে উঠলো। বাবা, বাবা! ধন্যি ছেলে! ব'লতে ব'লতে ছেলেকে নিয়ে দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়।

নবজাত শিশুকে দেখে সকলেরই ভাবনা এবং উৎকণ্ঠা দূর হয়। দৃষ্টি বিস্ফারিত ক'রে অদম্য কৌতূহল নিয়ে চায়। সত্যিই নবজাত শিশু ব'লে

মনে হয় না। তার উপরে ভস্মাচ্ছাদিত হওয়ায় শিশু ভোলানাথের মত দেখাচ্ছে।

ক্ষুদিরাম দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ক'রে দেখে—হ্যাঁ, লক্ষণযুক্ত বটে। মুখে সেই প্রশান্তি এবং হাসি। নবজাতকের কোন আর্ত্তনাদ বা অস্থিরতা নেই, যেন সদা প্রসন্ন মূর্ত্তি। তার উপরে ভস্মাচ্ছাদিত হ'য়ে তাকে জানিয়ে দিল—হয় সে সংসার ত্যাগ ক'রে যাবে, নয় বাস ক'রবে আসক্তির উপর ভস্মের প্রলেপ দিয়ে। ভস্মাচ্ছাদিত জাতককে দেখে ক্ষুদিরাম নিঃসন্দেহ হয় নররূপে দেবতার আবির্ভাব সম্বন্ধে। সার্থক সৃষ্টির আনন্দে মনটা অধীর হ'য়ে ওঠে। হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠে ধনীকে বলে, যা যা, ছাই-টাই-গুলো মুছে দে। আর একটু ঢাকা-ঢুকি দিয়ে রাখ। ঠাণ্ডা-টাণ্ডা লাগবে। ব'লতে ব'লতে ঘুরে দাঁড়ায়।

ধনীও শিশুকে নিয়ে আবার ভিতরে ঢোকে।

●

কুড়ি

নবজাত শিশুর মুখদর্শন ক'রে ও জন্মগ্রহণের তিথি এবং ক্ষণ দেখে যদিও ক্ষুদিরাম তার অসামান্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়, অবতার বিশেষ ব'লে মনে করে, কিন্তু সে ভাব বেশীক্ষণ থাকে না। বিশেষ ক'রে চন্দ্রমণি যখন আঁতুড় ঘর থেকে তাকে ডেকে বলে, হ্যাগা, এখন এ ছেলের দুধের কি ব্যবস্থা ক'রছ ? কচি ছেলে—একটু দুধ না হ'লে কি খেয়ে বাঁচবে বলো দেখি ?

চন্দ্রমণির কথায় ক্ষুদিরামের মন থেকে সমস্ত দার্শনিক চিন্তা মুছে যায়। ভুলে যায়···দেবতা পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ ক'রেছে, স্বেচ্ছায় এই

দারিদ্র্য বরণ ক'রে নিয়েছে, ভালমন্দ তার ইচ্ছাধীন। অতএব তিনি যদি দেহ রাখতে চান তবে শুধু মাত্র জল আর বায়ুতেই রাখবেন, আর যদি না রাখতে চান তবে দুধ, ক্ষীর, নবনীতেও রাখবেন না।

মাটির মানুষ সে। হ'তে পারে উচ্চ চিন্তা ও ভাব নিয়ে থাকে, কিন্তু গৃহী তো বটে। সাংসারিক চিন্তা থেকে নিজেকে একেবারে মুক্ত ক'রতে পারে না। আর তা করা উচিতও নয়। কারণ সংসার যখন পেতেছে তখন তার ভাবনাও তাকে কিছু ভাবতে হবে বৈকি। ঋষি হ'য়ে রাজা জনককে যখন ভাবতে হ'য়েছে তখন সে তো ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র। তাই একটু চিন্তা ক'রে নিয়ে বলে, হুঁ, একটা কিছু ব্যবস্থা ক'রতে হবে বৈকি।

চন্দ্রমণি নবজাত পুত্রের মুখের দিকে একবার স্নেহকোমল দৃষ্টিতে চেয়ে ঈষৎ আগ্রহ ভরে বলে, আর একবার গণক ঠাকুরের বাড়ী যাবে না ? তিথি লগ্ন দেখে একটা নাম তো রাখতে হবে। আর বেঁচে-বর্ত্তে থাকবে কিনা··· ভবিষ্যৎ···আর ব'লতে পারে না। কি ভেবে চুপ ক'রে যায়।

চন্দ্রমণির কথায় ক্ষুদিরামের কৌতূহল আবার জেগে ওঠে। যদিও সে তার বিদ্যা এবং জ্ঞানানুযায়ী পাঁজি দেখে মোটামুটি জেনেছে— জাতক শুভ লগ্নেই জন্মেছে। কিন্তু সে তো জ্যোতিষী নয়। তা' ছাড়া তার মনটা পূর্ব্ব থেকেই পুত্র সম্বন্ধে সংস্কারান্ধ হ'য়ে আছে। অতএব সেই মন ও দৃষ্টি দিয়ে দেখেছে, ভাবাবেগে কল্পনা ক'রেছে—পুত্র তার অসামান্য। তবে জ্যোতিষ শাস্ত্রানুযায়ী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে একবার বিচার ক'রে দেখা দরকার, সত্যই সে অনন্য কিনা ? সাধারণের সঙ্গে তার কোন ব্যতিক্রম আছে কিনা ? কিন্তু সে আগ্রহ বা কৌতূহলের কোন রকম অভিব্যক্তি না দিয়ে বলে, হ্যাঁ, একবার যাব যাব মনে ক'রছি। আর ছেলের নাম আমি আগেই ঠিক ক'রে রেখেছি, তবে রাশনামটা জ্যোতিষ শাস্ত্রানুযায়ী রাখাটাই যুক্তিসঙ্গত।

ক্ষুদিরাম থামতেই চন্দ্রমণি আগ্রহ ভরে জিজ্ঞাসা করে, কি নাম ঠিক করে রেখেছ ?

ক্ষুদিরাম প্রশান্ত কণ্ঠে বলে, গদাধর।

চন্দ্রমণি উৎফুল্ল হ'য়ে বলে, বা বেশ নাম! হ্যাঁ, গদাধরই বটে। জন্মেই একেবারে ভস্ম মাখলো, এ গদাধর না হ'য়ে যায় না। ব'লে শিশুকে কোল থেকে বুকে নিয়ে গভীর স্নেহে জড়িয়ে ধরে। তারপর পুত্রবধূর উদ্দেশ্যে বলে, বৌমা, একটা বাটিতে ক'রে একটু সর্ষের তেল দিয়ে যাও তো, ছেলেটাকে বেশ ক'রে মাখাই।

ক্ষুদিরাম যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়ায়। চিন্তিত মনে কয়েক পা এগিয়েও যায়। সহসা কি ভেবে দাঁড়ায়। চন্দ্রমণির দিকে চেয়ে বলে, দেখ— ভাবছি রামচাঁদকে গদাধরের জন্ম সংবাদ দিয়ে আর একটা গাই গরু কেনার জন্যে কিছু সাহায্য চেয়ে পাঠাই। ঘরে যে বিচালি হয় তাতেই গরুর খোরাক হ'য়ে যাবে। শুধু সময় মত চারটি খেতে দেওয়া। আর একখানা চালা তুলে রাখার ব্যবস্থা করা।

চন্দ্রমণি স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে শোনে। কোন জবাব দেয় না।

ক্ষুদিরাম চন্দ্রমণির নিরুক্ত মুখের দিকে চেয়ে বলে, তা' না হ'লে তো আর কোন উপায় দেখছি নে। সংসারে আয় নেই অথচ ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে। রঘুবীরের দয়াতে লক্ষ্মী জলার ঐ সামান্য জমিতে যা হোক অন্নের সংস্থানটা হয়। কিন্তু অন্যান্য খরচা তো আছে।

চন্দ্রমণি এবার মাথা নাড়তে নাড়তে বিজ্ঞের মত বলে, তা' তো সত্যি, তবে তাই লেখ। রামচাঁদ এখন যা হোক দুটো পয়সা উপায় ক'রছে। আর মামা ব'লে তোমাকে ভক্তি শ্রদ্ধাও করে খুব। তোমার কথা ফেলতে পারবে না।

ক্ষুদিরাম সঙ্গে সঙ্গে বলে, তাই তো ভাবছি। নিজের সুবিধা দেখতে গিয়ে তাকে আবার অসুবিধায় না ফেলি।

এমন সময় পুত্রবধূ তেলের বাটি নিয়ে আঁতুড় ঘরের দিকে আসে। আর ক্ষুদিরাম চিন্তিত মনে ঘরের দিকে এগিয়ে যায়। ঘরে ঢুকে

একেবারে কাগজ কলম টেনে নিয়ে বসে। রামচাঁদের উদ্দেশ্যে লেখে—
কল্যাণবরেষু,

প্রাণাধিক রামচাঁদ! তুমি শুনিয়া অত্যন্ত সুখী ও আনন্দিত হইবে যে, গত ৬ই ফাল্গুন রাত্রি অৰ্দ্ধদণ্ড থাকিতে আমার আর একটী পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

তুমি তোমার মাতুলের সংসারিক অবস্থা সবই জানো। ৺রঘুবীরের দয়ায় কোনমতে দিন চ'লিয়া যায় বটে, কিন্তু যখন প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত ব্যয়ের আবশ্যক হইয়া পড়ে তখনই মহা চিন্তায় পড়ি। নবজাত শিশু আমাকে সেই চিন্তায় ফেলিয়াছে। এখন প্রতিদিন তাহার একটু দুগ্ধের প্রয়োজন। ঘরে দুগ্ধবতী গাভীও নাই আর ক্রয় করিয়া খাওয়াই সে সঙ্গতিও নাই। তাই তোমাকে জানাইতেছি যে, যদি ইহার কোন বিহিত করিয়া মাতুলকে চিন্তামুক্ত কর তাহা হইলে বিশেষ সুখী হইব। অধিক আর কি লিখিব, ৺রঘুবীরের দয়ায় সব কুশল। তোমার কুশল দানে সুখী করিবে।

ইতি আশীর্ব্বাদক
শ্রীক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়।

ক্ষুদিরাম চিঠিখানা লেখে বটে, কিন্তু ভাবে পাঠাবে কিনা। সে জানে রামচাঁদ তার যোগ্য ভাগিনেয়। ৺রঘুবীরের দয়ায় মেদিনীপুরে মোক্তারীতে ভালো পসার ক'রেছে। ইতিমধ্যেই তার সাংসারিক অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেছে, এবং স্বভাব চরিত্রও খুব মধুর। এত পয়সা উপায় করে বটে কিন্তু কোন অহঙ্কার নেই। তা' ছাড়া—দয়া, ধর্ম্মে, দানে, ধ্যানে খুব মন আছে। তা না হ'লে তার আর্থিক দুরবস্থা মাত্র অনুমান ক'রে প্রতি মাসে নিয়মিত ভাবে সাহায্য ক'রতো না। শুধু তাকেই নয় তার আরও দুই মামা নিধিরাম ও কানাইরামকেও সেই সঙ্গে সাহায্য ক'রে চ'লেছে। তার উপরে আবার তাকে জানাতে মনটা যেন ঠিক সায় দেয় না। অথচ উপায়ও খুঁজে পায় না। নিজের বা স্ত্রীর কোন অভাব হ'লে

রঘুবীরের উপর নির্ভর ক'রে থাকতে পারতো। কিন্তু দুগ্ধপোষ্য শিশুর জীবন নিয়ে তো দৈবের উপর নির্ভর করা চলে না। ভাবতে ভাবতে কাতর হ'য়ে পড়ে। দিব্য দর্শন ও অনুভূতির স্মৃতি বিলুপ্ত হ'য়ে যায়। কিছুতেই মনকে প্রবোধ দিয়ে স্থির রাখতে পারেন!—পুত্র তার নারায়ণের অংশ সম্ভূত। মানবের বেশে এসেছে বটে, কিন্তু অতিমানব। তার প্রয়োজন সে নিজেই মিটিয়ে নেবে। অভাবনীয় উপায়ে সব সমস্যার সমাধান হ'য়ে যাবে। কিন্তু অপত্য স্নেহে সমস্ত ধারণা এবং বিশ্বাস শিথিল হ'য়ে আসে। শুধু মনে হয় রামকুমার, রামেশ্বরও যা, গদাধরও তাই। তার যা-কিছু প্রয়োজন তাকেই মেটাতে হবে। যেমন ক'রে হোক, যেখান থেকে হোক সংগ্রহ ক'রতে হবে। তা না ক'রতে পারলে নিজের উপরেও অবিচার করা হবে, আর শিশু পুত্রের উপরেও অবিচার করা হবে। অথচ এমন আর্থিক সঙ্গতি নেই যে কিনে খাওয়ায়। আর তা ক'রতে গেলে খোরাকীর ধান বিক্রী ক'রে ক'রতে হবে। আবার এই ধান বিক্রী ক'রলে নিজেদের খোরাকীতে টানাটানি প'ড়বে। তা ছাড়া দেবসেবা আছে, অতিথি অভ্যাগত আছে···

হঠাৎ চন্দ্রমণির কাতর আর্ত্তনাদে ভাবনায় ছেদ পড়ে। ত্রস্তপদে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে। দাওয়ায় দাঁড়িয়ে চন্দ্রমণির উপর উৎসুক দৃষ্টি তুলে ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, কি হ'ল ?

চন্দ্রমণির চীৎকারে রামকুমার, রামেশ্বর, পুত্রবধূ সকলেই কৌতূহল ও উৎকণ্ঠা নিয়ে উপস্থিত হয়। ধনী ও শঙ্করী পর্য্যন্ত ছুটে আসে। বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, কি হ'ল ?

চন্দ্রমণি ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে নবজাত শিশুর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে বলে, ঐ দেখ—ঐ দেখ !

সকলেই বিস্মিত দৃষ্টিতে শিশুর দিকে চায়। দেখে—নবজাতক তৈলাক্ত হ'য়ে কুলোর উপর নিঃস্পন্দ হ'য়ে শুয়ে আছে। কিন্তু কুলো-খানা ভেঙ্গে পড়ার মত মড়মড় শব্দ ক'রছে।

একটা সাতদিনের শিশুর দেহের ভারে কুলো ভেঙ্গে পড়ার শব্দ শুনে ও স্পন্দনহীন হ'য়ে শুয়ে থাকতে দেখে ভয়ে বিস্ময়ে সকলেই স্তম্ভিত হ'য়ে যায়। পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে পাংশু মুখে চায়।

ক্ষুদিরামও বিহ্বল হ'য়ে পড়ে। কিন্তু সাধ্যমত সে ভাবটা দমন ক'রে গম্ভীর ভাবে বলে, সব খুলে বল।

চন্দ্রমণি ছেলেকে কুলো থেকে আবার কোলে নিতে যায় কিন্তু আর তুলতে পারে না। অসম্ভব ভারী ব'লে মনে হয়।

গ্রামের মেয়ে সে। দরিদ্র ঘরের বধূ। কোলে-কাঁখে এক আধমণ ভার বোঝা অবলীলাক্রমে ব'য়ে নিয়ে যেতে পারে। আর যেতেও হয়। তা'ছাড়া দুই পুত্র ও এক কন্যার জননী। তাদেরও কোলে-কাঁখে ক'রেই মানুষ ক'রেছে। কিন্তু আপন গর্ভজাত পুত্রকে কোলে তুলতে পারে নি এমন তো কোনদিন হয় নি বা এমন কোনদিন শোনেও নি।

চন্দ্রমণি ভয়ে বিহ্বল হ'য়ে পড়ে। মুখখানা পাংশু হ'য়ে আসে। আর আত্মসম্বরণ ক'রতে পারে না। হাউ হাউ ক'রে কেঁদে ফেলে। কাঁদতে কাঁদতে বলে, এ আমার কি হ'ল ! ছেলেকে যে আর কোলে তুলতে পারছি না।

ধনী আগ্রহ ভরে জিজ্ঞাসা করে, কেন বৌদি ?

চন্দ্রমণি তেমনি কাঁদতে কাঁদতে বলে, এ যে ভীষণ ভারী লাগছে।

ধনী শুচিতা রক্ষার সঙ্কল্প ত্যাগ ক'রে শিশুকে নিতে এগিয়ে যায়। কিন্তু সেও তুলতে পারে না। অসম্ভব ভারী লাগে।

দরিদ্র কামারের মেয়ে সে। তার উপর অল্প বয়সেই মাতৃহারা। সেই কারণে বালিকা বয়স থেকেই সংসারের সকল কাজ ক'রতে হ'য়েছে বা হ'চ্ছে। আর এখন তো নিজের জীবিকার সংস্থান নিজেকেই ক'রতে হয়। মণ মণ ধান অনায়াসে এপাড়া ওপাড়া থেকে নিয়ে ও দিয়ে আসে, এতটুকু কষ্ট বা ক্লান্তি বোধ করে না। কিন্তু এই সাতদিনের শিশুকে তার চেয়ে অনেক বেশী ভারী ব'লে মনে হয়।

ধনী আরো দু'বার নিষ্ফল চেষ্টা ক'রে হতাশ হয়। মনের মধ্যে তড়িৎপ্রবাহের মত বহু ভাবনা খেলে যায়। পরিশেষে ক্ষুদিরামের উপর ভয়ার্ত্ত ও বিস্মিত দৃষ্টি তুলে ব্যগ্রকণ্ঠে বলে, দাদা, একটা রোজা-টোজা ডেকে পাঠাও। ছেলেকে নিশ্চয় ব্রহ্মদত্তি ভর ক'রেছে। তা' না হ'লে সাতদিনের ছেলে হঠাৎ এমন ভারী হয় কি ক'রে ?

ক্ষুদিরাম ইতিমধ্যে ভেবে নিয়েছিল—চন্দ্রমণি অনেকক্ষণ শিশুকে কোলে নিয়েছিল এবং দুর্ব্বল শরীর ব'লে হয়তো ঝিঁজি-টিজি লেগে হাত পা অবশ হ'য়ে আসায় আর তুলতে পারছে না। কিন্তু ধনীর কথায় ও কুলোর মড়মড় শব্দে ধারণা দূর হ'য়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে আবার বিহ্বল হ'য়ে পড়ে। আর ভাবতে পারে না। মাথাটা যেন ঘুরে যায়। রামেশ্বরের দিকে চেয়ে ব্যাকুল কণ্ঠে বলে, যা তো বাবা! চিনু শাঁখারীকে একবার ডেকে নিয়ে আয় তো।

রামেশ্বর কোন প্রশ্ন না ক'রে দৌড়ে যায়।

ধনী চন্দ্রমণির দিকে চেয়ে সান্ত্বনা দিয়ে বলে, চুপ কর দেখি বৌদি! ছেলের কিছু হয় নি। এমনই ভাল হ'য়ে যাবে। তারপর ঘুরিয়ে প্রশ্ন করে, কখন থেকে এমন হ'ল ?

চন্দ্রমণি আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছে রুদ্ধকণ্ঠে ব'লতে যাবে—সেই সময় রামেশ্বরের সঙ্গে ব্যস্ত সহকারে চিনু এসে হাজির হয়। আঁতুড় ঘরের দরজার কাছে এসে চন্দ্রমণির দিকে চেয়ে কৌতূহল ভরে জিজ্ঞাসা করে, কি হ'য়েছে মাঠান, বলুন তো ?

চন্দ্রমণি রুদ্ধকণ্ঠে আবেগের সঙ্গে বলে, ছেলেকে কোলে নিয়ে তেল মাখাতে মাখাতে কেমন যেন ভারী ব'লে মনে হ'তে লাগলো। ভাবলাম অনেকক্ষণ কোলে নিয়ে আছি ব'লে বোধ হয় ভারী লাগছে। তখন বৌমাকে ডেকে ব'ললাম, বৌমা, একখানা কুলো দিয়ে যাও তো, ছেলেকে একটু শোয়াই। আর বাপু কোলে রাখতে পারছি না। বৌমা কুলো দিয়ে গেল, ছেলেকে শোয়ালাম। কিন্তু কুলো পর্য্যন্ত মড়মড় ক'রতে লাগ্‌লো এবং

ছেলেও অসাড় হ'য়ে এলো। তখন আর কি—ভয় পেয়ে চীৎকার ক'রে উঠলাম। তারপর কোলে নিতে গেলাম কিন্তু আর তুলতে পারলাম না।

চন্দ্রমণি থামতেই চিনু উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে, আর ব'লতে হবে না মাঠান, বুঝতে পেরেছি। আমরা সব জানি। ছেলে তো আপনার সাধারণ নয়। এ যে শিবের অংশ থেকে জন্মগ্রহণ ক'রেছে। এবং আপনাদের মনে বোধ হয় কোন সন্দেহ জেগেছে, তাই শিবের আবেশ হ'য়েছে। ব'লে শিশুর দিকে চেয়ে শিবস্তোত্র আবৃত্তি ক'রতে ক'রতে গায়ে হাত বুলাতে থাকে।

দেখতে দেখতে শিশুর স্পন্দন ফিরে আসে। আবার হাত পা ছুঁড়ে স্বাভাবিক ভাবে খেলা আরম্ভ করে।

চন্দ্রমণি নিবিড় স্নেহে কোলে তুলে নেয়।

একুশ

পুত্র সুস্থ হ'য়ে ওঠে। সুস্থ দেখে একে একে সকলেই চ'লে যায়। ক্ষুদিরামও আবার ঘরে এসে ঢোকে। কোন তাড়া নেই, কারণ এখনও চৌদ্দদিন অশুচি। পুত্রের ষষ্ঠীপূজো না হ'লে শুচি হবে না বা গৃহদেবতাদের পূজোও ক'রতে পারবে না। আর রামকুমার উপযুক্ত হবার পর থেকে সংসারের ভাবনা বা কাজ এক রকম ছেড়েই দিয়েছে। তবে নেহাৎ যেগুলো না ভাবলে নয় বা না ক'রলে নয় সেগুলো অবশ্য ভাবতে হয় বা করতে হয়। তবে সে রকম প্রয়োজন এমন খুব কমই হয়। শুধু ধান্য রোপণের সময় লক্ষ্মীজলার মাঠে গিয়ে

রঘুবীরকে স্মরণ ক'রে প্রথম কয়েক গোছা ধান রোপণ ক'রতে হয়। আর রঘুরীরের নাম স্মরণ ক'রে স্বহস্তে রোপণ করে ব'লেই ঐ এক বিঘা দশ ছটাক জমিতে এতগুলো লোকের অন্নসংস্থান হয়। তা ছাড়া অতিথ, ফকির, দীন, দরিদ্রও আছে। আর কখনো কখনো ঐ রকম দু'একটা কাজ বা ভাবনা তাকে ক'রতে হয় বা ভাবতে হয়। তা'ছাড়া রামকুমার তাকে সমস্ত দায় থেকে এক রকম মুক্তি দিয়েছে। তবে হাজার হোক রামকুমার পুত্র এবং সংসারের অনভিজ্ঞ। অনেক সময় উচিৎ, অনুচিৎ ঠিক ক'রতে পারে না। তার উপরে পদে পদে প্রলোভন। অভাবের সংসার, কখন প্রলুব্ধ হ'য়ে পদস্খলন ক'রে বসে। তার এত-দিনের মান, সম্মান, গৌরব তুচ্ছ লোভের বশবর্ত্তী হ'য়ে ধূলিসাৎ ক'রে দেয়—তাই একটু সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়। চিন্তিত দেখলে কারণ জিজ্ঞাসা ক'রে চিন্তার খানিকটা অংশ নিতে হয়। না নিলে পিতার কর্ত্তব্য থেকে চ্যুত হ'চ্ছে ব'লে মনে হয়, এবং তার উপর অবিচারও করা হয়। তবে সে রকম ঘটনা বা অবস্থা খুব কমই হয়।

কিন্তু স্তম্ভিত হ'য়ে যায় আজকের ঘটনা স্মরণ ক'রে। বর্ষার নদীর মতন ভাবনার স্রোত এসে মনকে দোলা দিয়ে হু হু ক'রে ব'য়ে যায়। চৈতন্য আলোড়িত হ'য়ে ওঠে। সে জানে তার গৃহের চতুঃসীমায় কোন ভূত প্রেত, দৈত্য, দানব, যক্ষ, রক্ষ কেউ আসতে পারে না। কারণ রঘুবীর যেখানে নিত্য পূজিত সেখানে এদের প্রবেশ নিষেধ। তা'ছাড়া একটা দুগ্ধপোষ্য নবজাত শিশুকে ধ'রবেই বা কেন? বিশেষ ক'রে যখন সে মাতৃক্রোড়ে র'য়েছে। স্বয়ং মৃত্যুরাজ এসেও মাতৃকোল থেকে পুত্রকে নিয়ে যেতে পারে না—তা' ভূত, প্রেত, দৈত্য, দানব।

ভাবতে ভাবতে ক্ষুদিরাম শিউরে ওঠে। গদাধরকে অবিশ্বাস করার জন্যে মরমে মরে যায়। বার বার মনে হয়—তাকে চৈতন্য দিবার জন্যেই নবজাত শিশুর উপর হ'ল শিবের আবেশ। আর সে স্পষ্ট দেখলো—শিশু স্পন্দনহীন হ'য়ে শুয়ে আছে। না আছে চপলতা, না আছে চঞ্চলতা।

কিন্তু আঁখি দুটী ধ্যানমগ্ন যোগীর মতন, যেন শিবনেত্র। আর শিবস্তোত্র শোনার সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এল। নিজেকে নিজে ধিক্কার দেয়। ভাবে—হায় রে! যে নিখিল বিশ্বের সূক্ষ্ম অণুপরমাণুর কথা ভেবে স্থির ক'রে রেখেছে, আর সে ভাবছে তার দুঃখের কথা! আর সেই ভাবনায় একেবারে কাতর হ'য়ে প'ড়েছিলো।

ক্ষুদিরাম আর কিছুমাত্র চিন্তা না ক'রে রামচাঁদকে লিখিত পত্রখানা মেঝে থেকে তুলে নেয়। ইতস্ততঃ না ক'রে ছিঁড়ে ফেলে। তারপর শুধুমাত্র পুত্রের জন্ম-সংবাদ দিয়ে পত্র লেখে।

যদিও গদাধরের আসার ইঙ্গিত থেকে তার আবির্ভাব পর্য্যন্ত বিবিধ অলৌকিক ঘটনা ঘ'টেছে বা ঘ'টছে, স্বামী স্ত্রীর নানাবিধ দিব্যদর্শন হ'য়েছে ও হ'চ্ছে, আর শুধু তারা নয়—সারা গ্রামের লোকই প্রকারান্তরে জেনেছে চন্দ্রমণির অলৌকিক ভাবে গর্ভসঞ্চারের কথা। পুত্র তাদের দেবতার অংশসম্ভূত। সেই কৌতুহল ও বিশ্বাস নিয়ে অনেকেই এসে শিশুকে দেখে যাচ্ছে। কেবল গ্রাম থেকেই নয়, গ্রামান্তর থেকেও কৌতুহল নিয়ে কেউ কেউ আসছে। জাতককে দেখে মুগ্ধ হ'চ্ছে। বিশ্বাস নিয়ে ফিরে যাচ্ছে। আর সেই কারণে জ্যোতিষ শাস্ত্র জাতক সম্বন্ধে কি বলে সেটা জানার বাসনা অতি প্রবল হ'য়ে ওঠে, তবে তাদের গ্রামে কোন অভিজ্ঞ জ্যোতির্ব্বিদ নেই ব'লে এ পর্য্যন্ত কৌতূহল চরিতার্থ ক'রতে পারে নি বা ক্রমে ক্রমে সেটা স্তিমিত হ'য়ে এসেছিল। কিন্তু এই ঘটনায় আবার সেটা প্রবল হ'য়ে ওঠে। আর একটা জন্ম-পঞ্জিকা ক'রে রাখা সমীচীনও বটে, এই ভেবে ষষ্ঠীপূজার আগের দিন সকাল সকাল খাওয়া দাওয়া চুকিয়ে ভূরসুবো গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। তা ছাড়া ভূরসুবোর জমিদার মানিক রাজ এবং তার ভ্রাতা জয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায় উভয়েই তার বিশিষ্ট বন্ধু। এই উপলক্ষে তাদের সঙ্গে দেখাও ক'রে আস্‌বে, আর পুত্রের জন্ম সংবাদটাও জানানো হবে।

ক্ষুদিরাম ভূরসুবো গ্রামে প্রবেশ ক'রে একেবারে জ্যোতিষির বাড়ীর দরজায় এসে হাজির হয়।

জ্যোতিষী তার পূর্ব্ব পরিচিত এবং সমবয়সী ও বন্ধুস্থানীয়। ক্ষুদিরামের আহ্বানে বেরিয়ে আসে। দিবা দ্বিপ্রহরে তাঁকে বাড়ীর দরজায় দেখে বিস্মিত হয়। আগ্রহ ভরে বলে, আসুন, আসুন! ব'লে বাইরের ঘরে এনে বসায়। তারপর ভিতরের দিকে চেয়ে মেয়ের উদ্দেশ্যে বলে, গিরি! একখানা পাখা দিয়ে যাতো মা।

আট বছরের মেয়ে গিরি বাড়ীর ভিতর থেকে একখানা পাখা এনে দিয়ে যায়।

জ্যোতিষী পাখাটা নিয়ে ক্ষুদিরামকে ব্যজন ক'রতে ক'রতে কৌতূহলী হ'য়ে জিজ্ঞাসা করে, কি সংবাদ বলুন তো চাটুয্যে মশায়? এই দুপুর রোদে....

ক্ষুদিরাম পাখাটা নেবার জন্য জ্যোতিষীর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে কুণ্ঠিত হ'য়ে বলে, পাখাটা আমাকে দিন। আপনি আর কেন……

জ্যোতিষী পাখাটা সমানভাবে নাড়তে নাড়তে বলে, তা হোক, আপনি পথশ্রান্ত…কিন্তু এমন অসময়ে কি মনে ক'রে এসেছেন বলুন তো?

ক্ষুদিরাম কৌতুক ক'রে বলে, কেন, আসতে নেই? আপনি, মানিক-রাজ, জয়রাম সকলেই আমার বন্ধুস্থানীয়, আর দীর্ঘদিন দেখা সাক্ষাৎ নেই……

ক্ষুদিরামের কথায় জ্যোতিষী কুণ্ঠিত হ'য়ে ওঠে। সলজ্জ কণ্ঠে ব্যস্ত হ'য়ে বলে, সে কি কথা! নিশ্চয় আসবেন—মানিকরাজ, জয়রাম প্রায়ই আপনার কথা কত বলে……

জ্যোতিষীকে কথাটা শেষ করার অবকাশ না দিয়ে ক্ষুদিরাম কৌতুক ক'রে জিজ্ঞাসা করে, কি বলে?

ক্ষুদিরামের প্রশ্নে জ্যোতিষী বিব্রত বোধ করে। একটু ইতস্ততঃ ক'রে

বলে, সৎ লোকের সঙ্গ সকলেই চায়। আর আপনি অনেকদিন হয় এধারে আসেন নি, তাই আর কি……

ক্ষুদিরাম এবার ঈষৎ কুণ্ঠার সঙ্গে বলে, হ্যাঁ, কাজে কর্ম্মে…আর বয়সও হ'য়েছে, তার উপরে দু'মাস এখানে ছিলামও না…

ক্ষুদিরামের কথা সমাপ্ত না হ'তেই জ্যোতিষী কৌতূহলী হ'য়ে জিজ্ঞাসা করে, কোথায় গেছিলেন ?

ক্ষুদিরাম ভাব গম্ভীর কণ্ঠে বলে, গয়াধামে। উত্তরটা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চোখের উপর ভেসে ওঠে স্মৃতিগুলি। মনটা উদাস হ'য়ে আসে। কিন্তু ভাবটা দমন ক'রে নিয়ে এবং জ্যোতিষীকে আর কোন প্রশ্ন করার অবকাশ না দিয়ে গম্ভীর ভাবে বলে, শুনুন, সত্যিই একটা প্রয়োজনে এসেছি। গত ৬ই ফাল্গুন আমার একটী পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ ক'রেছে। তার একটা জন্ম-পঞ্জিকা ও রাশ-নাম রাখার জন্যেই আপনার কাছে আসা। তারপর একটু মৃদু হেসে আবার বলে, শুধু যে কলা বেচতেই এসেছি তা নয়, সেই সঙ্গে রথও দেখে যাব।

ক্ষুদিরামের কথা শুনে জ্যোতিষী হো হো ক'রে হেসে ওঠে। তারপর হাসি থামিয়ে জিজ্ঞাসা করে, তা জাতকের ভাগ্যফল কি এখনই জেনে যেতে চান ?

ক্ষুদিরাম একটু ইতস্ততঃ ক'রে কুণ্ঠার সঙ্গে বলে, যদি আপনার কোন অসুবিধা না হয় বা বিরক্ত বোধ না করেন…

ক্ষুদিরামকে কথাটা শেষ করার অবকাশ না দিয়ে জ্যোতিষী ব্যস্ত সহকারে জিব কেটে বলে, বিলক্ষণ বিলক্ষণ! সেকি কথা, আপনি এই দুপুরবেলা এতটা পথ ভেঙ্গে এসেছেন আর আমি বাড়ী ব'সে সামান্য কাজটুকু ক'রতে পারবো না। ব'লে আবার কন্যার উদ্দেশ্য ডেকে বলে, মা গিরি! পাঁজিখানা আর শ্লেট পেন্‌সিলটা দিয়ে যা তো মা।

গিরি পাঁজি ও শ্লেট পেন্‌সিল দিয়ে যায়।

জ্যোতিষী পাঁজিখানা হাতে নিয়ে ক্ষুদিরামের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করে, পুত্র আপনার কবে জন্মগ্রহণ ক'রেছে ব'ললেন ?

উত্তরে ক্ষুদিরাম বলে, ৬ই ফাল্গুন, শেষ রাত্রে।

জ্যোতিষী পাঁজির পাতা উল্টাতে উল্টাতে আবার জিজ্ঞাসা করে, শেষ রাত্রে, ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে ?

ক্ষুদিরাম ঈষৎ চিন্তা ক'রে বলে, হ্যাঁ, ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত ব'ল্‌তে পারেন। অনুমান রাত্রি ভোর হ'তে অর্দ্ধ দণ্ড বাকী ছিল।

জ্যোতিষী আর কোন প্রশ্ন না ক'রে গভীর মনোনিবেশ সহকারে পাঁজি রেখে শ্লেটের উপর রাশিচক্র আঁকে। আঁক-যোগ ক'রে গ্রহগুলিকে বিভিন্ন ঘরে বসায়। জাতকের জন্মকুণ্ডলীতে গ্রহের অদ্ভুত সমাবেশ দেখে বিস্ময়ে শুধু স্তম্ভিত হয় না, একেবারে হতবাক হ'য়ে যায়। আর সেই নির্ব্বাক বিস্মিত দৃষ্টি ক্ষুদিরামের মুখের উপর তুলে ধরে।

জ্যোতির্ব্বিদ হিসাবে সে বহু লোকের জন্ম-পঞ্জিকা দেখেছে বা ক'রেছে। আর এই শাস্ত্র সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছাবার জন্যে অনেক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংগ্রহ ক'রে যত্ন সহকারে অধ্যয়ন ক'রেছে। তা ছাড়া জ্ঞানী জ্যোতির্ব্বিদ হিসাবে একটা সুনামও আছে। গণনা তার প্রায় অভ্রান্তই হয়। আর সেই কারণে অনেক দূর দূরান্তর থেকে লোক এসে তার কাছ থেকে গণনা ক'রে নিয়ে যায়। কিন্তু এমন অপূর্ব্ব গ্রহ সমাবেশপূর্ণ জন্ম-পঞ্জিকা তার এই বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত দেখে নি, এবং এমন গ্রহ সমাবেশ যে কোন জাতকের হ'তে পারে তা তার ধারণাতীত। তাই রাশিচক্রের উপর আর একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, জন্মক্ষণটা কি ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তেই ? সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিত ?

ক্ষুদিরাম কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না ক'রে গম্ভীর ভাবে বলে, হ্যাঁ, কারণ তারপর আমি আর শয্যা গ্রহণ করি নি।

জ্যোতিষী কোন জবাব দেয় না।

জ্যোতিষীর বিস্ফারিত দৃষ্টি ও বিহ্বল ভাব দেখে ক্ষুদিরামের কৌতূহল জেগে ওঠে। তাই বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, কেন বলুন তো ?

জ্যোতিষী উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে, আপনি ধন্য চাটুয্যেমশায়। এই রকম সুসন্তান আপনারই হ'তে পারে। অনেক ভাগ্য না ক'রলে এই রকম সন্তানের জনক হওয়া যায় না।

জ্যোতিষীর কথা শুনে পুত্রগর্ব্বে ক্ষুদিরামের বুকখানা ফুলে ওঠে। কিন্তু সে ভাবটা দমন ক'রে বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করে, কেমন দেখ্‌ছেন ব'লুন তো ? বেঁচে-ব'র্ত্তে থাকবে তো ?

জ্যোতিষী ক্ষুদিরামের উপর থেকে দৃষ্টি তুলে রাশিচক্রের উপর নিক্ষেপ ক'রে আবেগের সঙ্গে বলে, বেঁচে-ব'র্ত্তে থাকবে কি ব'লছেন, অবিনশ্বর হ'য়ে থাকবে !

ক্ষুদিরামের সমস্ত সন্দেহ এবং ভাবনার শেষ হ'য়ে যায়। গদাধরের উদ্দেশ্যে প্রণাম ক'রে মনে মনে বলে, প্রভু, তা'হ'লে ছলনা করো নি। সত্যই কৃপা ক'রেছো।

ক্ষুদিরামকে নির্ব্বাক হ'য়ে থাকতে দেখে জ্যোতিষী বেশ জোর দিয়ে দৃঢ় কণ্ঠে বলে, আপনি বোধ হয় আমার কথা বিশ্বাস ক'রতে পার্‌ছেন না ? তবে জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্বন্ধে আমার যতটুকু জ্ঞান বা পড়াশুনা আছে এবং আজ পর্য্যন্ত যত জন্মকুণ্ডলী ক'রেছি বা দেখেছি, তাতে এমন গ্রহ নক্ষত্রের সমাবেশ আর দেখি নি। কোন জাতকের রাশিচক্রে যে এমন গ্রহের সমাবেশ হ'তে পারে তা আমার ধারণাতীত।

ক্ষুদিরামের সমস্ত কৌতূহলের নিবৃত্তি ইতিপূর্ব্বেই হ'য়ে গিয়েছে, তবু যেটুকু সংশয় ও সন্দেহ ছিল তা জ্যোতিষির আগের কথায় একেবারেই নিরসন হ'য়ে যায়। আর সে কিছু জানতে চায় না বা জানার দরকারও নেই। তবু তার ভাণ ক'রে আগ্রহ ভরে জিজ্ঞাসা করে, জাতক সম্বন্ধে জ্যোতিষ শাস্ত্র কি বলে ব'লুন তো শুনি ?

জ্যোতিষী ভাব গম্ভীর কণ্ঠে বলে, বালকের জন্ম লগ্নে রবি, চন্দ্র ও

বুধ একত্রে মিলিত রয়েছে এবং শুক্র, মঙ্গল ও শনি তুঙ্গস্থান অধিকার পূর্ব্বক তার অসাধারণ জীবনের পরিচয় দিচ্ছে। আবার মহামুনি পরাশরের মতে দেখা যাচ্ছে—রাহু আর কেতু তুঙ্গী রয়েছে এবং বৃহস্পতি তুঙ্গাভিলাষী হ'য়ে জাতকের অদৃষ্টের উপর শুভ প্রভাব বিস্তার ক'রছে। ব'লে ক্ষুদিরামের দিকে চেয়ে হাত নেড়ে একটা শ্লোক ব'লে যায়—

ধর্ম্মস্থানাধিপে তুঙ্গে ধর্ম্মস্থে তুঙ্গখেচরে।
গুরুণা দৃষ্টিসংযোগে লগ্নেশে ধর্ম্মসংস্থিতে ॥
কেন্দ্রস্থানগতে সৌম্যে গুরৌ চৈব তু কোনভে।
স্থিরলগ্নে যদা জন্ম সম্প্রদায় প্রভুঃ হি সঃ ॥
ধর্ম্ম বিন্মাননীয়স্তু পুণ্যকর্ম্মরতং সদা।
দেবমন্দিরবাসী চ বহুশিষ্যসমন্বিতঃ ॥
মহাপুরুষসংজ্ঞোঽয়ং নারায়ণাংশসম্ভবঃ।
সর্ব্বত্র জন পূজ্যশ্চ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
ইতি ভৃগুসংহিতায়াং সম্প্রদায়প্রভুযোগং তৎফলঞ্চ।

শুনতে শুনতে ক্ষুদিরামের শরীর রোমাঞ্চিত হ'য়ে ওঠে। আঁখি নিমীলিত হ'য়ে আসে। মনটা ভাবে বিভোর হ'য়ে যায়। চোখের উপর ভেসে ওঠে প্রশান্ত মধুর বিষ্ণুমূর্ত্তি।

ক্ষুদিরামের ভাব-বিহ্বল মুখের দিকে চেয়ে জ্যোতিষী শ্লোকের বাংলা ব্যাখ্যা ক'রে বলে, এই রকম উচ্চ লগ্নে যে জন্মগ্রহণ করে তার সম্বন্ধে জ্যোতিষ শাস্ত্র নিঃসন্দেহে নির্দ্দেশ করে—ঐ জাতক ভবিষ্যতে ধর্ম্মবিৎ ও মাননীয় হবে, সর্ব্বদা পুণ্যকর্ম্মে রত থাকবে এবং বহু শিষ্য পরিবেষ্টিত হ'য়ে দেবমন্দিরে বাস ক'রবে। আর নবীন ধর্ম্ম-সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত ক'রে নারায়ণাংশসম্ভূত মহাপুরুষ ব'লে জগতে প্রসিদ্ধি লাভ ক'রবে ও সকলের পূজনীয় হবে।

জ্যোতিষী থামতেই ক্ষুদিরাম ভাব-বিহ্বল কণ্ঠে বলে, আমার উপর ভগবানের অসীম দয়া।

জ্যোতিষী সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে, সত্যিই চাটুয্যে মশায়, এ রকম সন্তান পাওয়া মানে ভগবানের আশীর্ব্বাদ পাওয়া। বহু পুণ্য না ক'রলে এ রত্ন লাভ করা যায় না।

ক্ষুদিরাম বেলার দিকে চেয়ে একটু চঞ্চল হ'য়ে ওঠে। তাই প্রসঙ্গটা ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

ক্ষুদিরামকে উঠ্‌তে দেখে জ্যোতিষী ব্যস্ত হ'য়ে বিস্মিত কণ্ঠে বলে, একি! উঠ্‌লেন কেন ?

ক্ষুদিরাম বিনীতভাবে বলে, একবার মাণিক রাজার বাড়ী যেতে হবে —সেখানেও খানিকক্ষণ ব'স্‌তে হবে। দেরী ক'রলে বাড়ী ফিরতে সন্ধ্যে উত্তীর্ণ হ'য়ে যাবে।

জ্যোতিষী চুপ ক'রে থাকে।

ক্ষুদিরাম তার নিরুক্ত মুখের দিকে চেয়ে বিনীত ভাবে বলে, অপরাধ নেবেন না। অনেক কষ্ট দিলাম।

জ্যোতিষী হাত জোড় ক'র জিব কেটে ব্যস্ত সহকারে বলে, সে কি কথা ? আপনার পায়ের ধূলো পড়াতে খুব আনন্দ পেলাম। এমন যদি মাঝে মাঝে আসেন বড় আনন্দ পাই।

ক্ষুদিরাম স্মিতহাস্যে বলে, বুঝতেই তো পার্‌ছেন, গৃহী লোক, নানা ঝঞ্ঝাটে আর···কথাটা শেষ না ক'রে আবার বলে, তা হ'লে আপনি পুত্রের একটা জন্ম-পঞ্জিকা অবসর মত ক'রে রাখবেন। আমি সময় মত এসে নিয়ে যাব!

জ্যোতিষও উঠে দাঁড়ায়। বিনীত কণ্ঠে বলে, নিশ্চয় নিশ্চয়। আমি দু'চার দিনের ভিতরই ক'রে ফেলছি, আর আমিই পাঠিয়ে দেব। আপনাকে কষ্ট ক'রে আসতে হবে না।

ক্ষুদিরাম আর কিছু না ব'লে নমস্কার ক'রে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে।

●

বাইশ

ক্রমান্বয়ে একঘেয়ে এক জায়গায় শুয়ে-ব'সে থাকতে থাকতে চন্দ্রমণি হাঁপিয়ে ওঠে। কাজের মানুষ সে। ব'সে থাকতে তার ভালও লাগে না, আর পারেও না। হাত পা যেন নিশ্‌পিশ্‌ করে। মন কাজ কাজ ক'রে ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে। তার উপরে আঁতুড়ে ঢুকে পর্য্যন্ত ধনী ও প্রসন্ন আগের মতন আর এসে বসে না। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দু' একটা জিজ্ঞাসাবাদ ক'রেই যাই যাই করে। সে অবশ্য আর একটু থাক্‌বার জন্যে অনুরোধ করে। কারণ গল্প-গুজবে তবু সময়টা কেটে যায়। কিন্তু ওরা আর দাঁড়াতে চায় না। নানা কাজের অজুহাত দেখিয়ে চ'লে যায়।

তবে গদাধর জন্মাবার পর থেকেই তাকে দেখবার জন্য সীতানাথ পাইনের-বউ, মধু যুগীর বউ, গুণী নাপতিনী, ক্ষেতির মা প্রভৃতি অনেকেই এখন আসা-যাওয়া করে। ছেলেকে দেখে কত সুখ্যাতি করে। কেউ বলে, আমরা সব শুনেছি গো, তাই তো ছেলেকে দেখ্‌তে এলাম। তারপর ছেলেকে দেখে মুগ্ধ হ'য়ে যায়। বিস্মিত কণ্ঠে বলে, সত্যিই গো! যা শুনেছি তা' দেখছি মিথ্যে নয়। কে ব'লবে আঁতুড়ে ছেলে। যেন ছ'মাসের। আর মুখখানা কি হাসি হাসি। দেখলেই মায়া লাগে।

কেউ আবার হাত দু'খানা বাড়িয়ে দিয়ে আঁচির কথা ভুলে মিনতি ক'রে বলে, মাঠান্‌, তোমার খোকাকে আমার কোলে একবার দেবে গো? বড্ড কোলে নিতে ইচ্ছে ক'র্‌ছে।

চন্দ্রমণি বিস্মিত কণ্ঠে বলে, ও মা! সে কি গো! এখনও যে আঁচি যায় নি। কোলে নেবে কি?

সে আরো কাতর হ'য়ে অনুরোধ ক'রে বলে, তা হোক্ গো। যাবার সময় নয় হালদার পুকুরে ডুব দিয়ে বাড়ী যাবো।

অশুচি অবস্থায় পুত্রকে অনেকেরই কোলে নিবার আগ্রহ ও অনুরাগ দেখে মাতৃগর্ব্বে চন্দ্রমণির বুকখানা ফুলে ওঠে। মুগ্ধ দৃষ্টিতে ছেলের দিকে চেয়ে সান্ত্বনা দিয়ে বলে, তা' নিও বাছা! আর তো ক'দিন। আঁচিটা উঠে যাক, তারপর নিও। তোমরা পাঁচজনে নিলে আমি তো বেঁচে যাই। এই কচি ছেলে নিয়ে সংসারের কাজ করা···

কোলপ্রার্থিনী হতাশ হয়। শুষ্ক মুখে বলে, তাই হবে মাঠান্। আপনি যখন দেবেন না····

চন্দ্রমণি চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে গালে আঙ্গুল দিয়ে বিস্মিত কণ্ঠে বলে, ও মা! শোন কথা! আমি তাই ব'ললাম নাকি লো? আমি ব'লছি আঁতুড় গেলে নিস্। আর কটা দিন······

এমনি ক'রে ছেলের ষষ্ঠী পূজোর দিন এগিয়ে আসে। চন্দ্রমণিও হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। ভোর ভোর স্নান ইত্যাদি সেরে শুচি হ'য়ে নেয়। তারপর ষষ্ঠী পূজোর গোছগাছ ক'রতে থাকে।

আর ক্ষুদিরামও দীর্ঘ তিন সপ্তাহ তার রঘুবীরকে স্পর্শ ক'রতে না পারায় ব্যথিত হ'য়েছিল, তাই সেও অন্যান্য দিনের তুলনায় একটু আগেই স্নান ইত্যাদি সেরে নেয়।

যদিও রঘুবীর এবং অন্যান্য দেবদেবীর পূজা বা ভোগ বন্ধ ছিল না, অন্য লোককে দিয়ে যথানিয়মে করিয়েছে, কিন্তু তৃপ্তি পায় নি। সব সময় মনে হ'য়েছে—এ পূজানুষ্ঠান হ'চ্ছে। কারণ পূজার সময় দূরে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য ক'রেছে—পুরোহিত নিয়ম মত সবই ক'রেছে বটে, কিন্তু যেন প্রাণহীন। কর্ত্তব্য কাজ কোন মতে সম্পাদন করার মত। ভক্তিও নেই, বিশ্বাসও নেই। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিরুপায় হ'য়ে সেই প্রাণহীন পূজা দেখেছে। মনে মনে ব্যথা পেয়েছে। অনুতপ্ত হ'য়ে বলেছে, প্রভু, এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটী ক্ষমা করো। আজ তাই শুচি হ'য়ে গুণ গুণ ক'রে

রঘুবীরের ভজন গাইতে গাইতে সাজি হাতে ফুল বাগানে এসে হাজির হয়। মহানন্দে ফুল তোলে। ফুলে ফুলে রঘুবীরকে, মা শীতলাকে, রামেশ্বর বাণলিঙ্গকে ঢেকে দেবে। আজ একুশ দিনের ভিতর কারো গলায় একগাছা মালা পড়ে নি, কেইবা গাঁথবে আর কেইবা দেবে। মনে মনে ভাবে—আজ তিন গাছা মালা গাঁথবে। আপন হাতে পরিয়ে দেবে দেবদেবীর গলায়। ভাবতে ভাবতে তন্ময় হ'য়ে যায়। বেলার দিকে হুঁস থাকে না।

গদাধরের কান্নায় চন্দ্রমণির তন্ময়তা টুটে যায়। শিশুকে সকাল বেলায় বেশ খানিকটা তেল মাখিয়ে উঠানে শুইয়ে দিয়ে এসেছিল। তখন রোদ ছিল না এবং শিশুও নিশ্চিন্ত মনে হাত পা ছুঁড়ে খেলা ক'রছিল। তাই দেখে সে নিশ্চিন্ত মনে ষষ্ঠী ও গৃহ দেবতাদের পূজার গোছ ক'রতে ব'সেছিল। কিন্তু ছেলের কান্নায় উঠানের দিকে চেয়ে দেখে—রৌদ্রে ছেয়ে গেছে। আর শিশু রৌদ্রে দগ্ধ হ'য়ে ছট্‌ফট্‌ ক'রে কাঁদছে। মুখ চোখ লাল হ'য়ে উঠেছে।

ঠাকুরঘর থেকে পুত্রের অবস্থা দেখে চন্দ্রমণি শিউরে ওঠে। পুত্রবধূর উদ্দেশ্যে ব্যস্ত সহকারে বলে, বউমা! গদাইকে তাড়াতাড়ি তুলে আনো। আহা, রোদে একেবারে পুড়ে গেল। তারপর রামেশ্বরের উদ্দেশ্যে বিরক্তিভরে বলে, মুখপোড়াকে ব'লে এসেছিলাম—রামু, একটু দেখিস তো বাবা! তা কে কার কথা শোনে। তিনি সব অগ্রাহ্যি ক'রে কোন্ রাজকার্য্যে গেছেন কে জানে।

পুত্রবধূ রান্নাঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে ধনীও বাড়ীর ভিতর এসে ঢোকে। শিশুকে রোদে প'ড়ে ছট্‌ফট্‌ ক'রে কাঁদতে দেখে ছুটে এসে সস্নেহে কোলে তুলে নেয়। চন্দ্রমণির দিকে চেয়ে ঈষৎ উষ্ণ এবং

বিস্মিত কণ্ঠে বলে, তোমাদের কি আক্কেল ব'লো তো বৌদি! ছেলেটাকে এমন রোদের মধ্যে শুইয়ে রেখে তোমরা নিশ্চিন্ত হ'য়ে আছো।

চন্দ্রমণির বিরক্তিভাব তখনো যায় নি। তাই ধনীর কথার উত্তরে বেশ ঝাঁজের সঙ্গে বলে, একা মানুষ, কোন দিকে দেখ্‌বো। আর তোদেরও খুব আক্কেল। জানিস আজ ষষ্ঠী পূজো। একটু সকাল সকাল আস্‌বি—হাতে-নাতে ক'রে একটু গুছিয়ে দিবি। অন্ততঃ ছেলেটাকে ধ'রেও তো একটু সাহায্য ক'রতে পারতিস্।

চন্দ্রমণির কথায় ধনী লজ্জায় পাংশু হ'য়ে ওঠে। গদাধরকে বুকে নিয়ে ঘরের দিকে এগিয়ে আস্‌তে আস্‌তে কুণ্ঠিত হ'য়ে বলে, আর কেন লজ্জা দিচ্ছ বৌদি, সবই তো জানো। গদাধরের কান্নায় কথায় বিঘ্ন ঘটে। তাকে চুপ করাবার জন্যে কথাটা অসমাপ্ত রেখে গদাধরকে দুই হাতের মধ্যে ধ'রে দোল দিতে দিতে শান্ত করার চেষ্টা ক'রে বলে, সোনা আমার—মাণিক আমার—

চন্দ্রমণি কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না ক'রে সমান ঝাঁজের সঙ্গে বলে, আর প্রসন্ন তো এ বাড়ীর পথ একেবারে ভুলেই গেছে। দু'দিন থেকে তার চুলের টিকি পর্য্যন্ত দেখা যাচ্ছে না।

ধনী গদাধরকে একই ভাবে দোল দিতে দিতে দাওয়ার উপর উঠে বসে। চন্দ্রমণির কথার জবাবে বিস্মিত কণ্ঠে বলে, ও মা, তুমি শোননি! তার যে একটা ভাই হ'য়েছে গো!

ধনীর কথায় চন্দ্রমণির বিরক্তিভাব চ'লে যায়। কণ্ঠস্বরে বিস্ময় জেগে ওঠে। চোখ দুটো বিস্ফারিত ক'রে বলে, ও মা! তাই নাকি!

শিশু তখনো কেঁদে চ'লেছে। ধনী তাকে সমভাবে শান্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা ক'রতে ক'রতে চন্দ্রমণির কথার জবাবে বলে, আমার সঙ্গে কাল ঘাটে দেখা—তবে তো আমি জানতে পারলাম। আজ একবার সময় ক'রে আসবে ব'লেছে।

চন্দ্রমণি ক্রন্দনরত পুত্রের দিকে চেয়ে আবেগের সঙ্গে বলে, আহা!

বেঁচে-বর্ত্তে থাক্, আমার গদায়ের এক বয়সী হ'ল। বেঁচে-বর্ত্তে থাকলে দু'জনে ভাব হবে খুব।

ধনী সে কথার কোন জবাব না দিয়ে বলে, বৌদি! ছেলের বোধ হয় ক্ষিদে পেয়েছে। বৌমাকে দুধ দিতে বলো, আমি খাইয়ে দিচ্ছি।

চন্দ্রমণি পুত্রের দিকে সস্নেহে চেয়ে বলে, হ্যাঁ, অনেকক্ষণ তো মাইটায় কিছু পায় নি। তারপর পুত্রবধূর উদ্দেশ্যে বলে, বৌমা! গদায়ের দুধ আর ঝিনুকটা দিয়ে যাও তো। ধনী খাইয়ে দেবে।

শাশুড়ীর আহ্বানে পুত্রবধূ পাংশু মুখে শূন্য হাতে রান্নাঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে। মুখের দিকে সলজ্জ দৃষ্টিতে চেয়ে বলে, দুধ বিড়ালে খেয়ে গেছে। আমি যখন খোকাকে নিতে রান্নাঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছি সেই সময়...

চন্দ্রমণির আর শোনার ধৈর্য্য থাকে না। সে জানে সংসার তাদের অভাবের। অনেক কষ্টে ছেলের জন্যে এই দুধের যোগান ক'রতে হ'য়েছে এবং এর জন্যে হয় তো স্বামী স্ত্রীকে এক-আধ বেলা উপবাস দিয়ে এই ক্ষতি পূরণ ক'রতে হবে। তার উপরে স্বামী কারো দান বা অনুগ্রহ নেওয়া পছন্দ করে না! বিশেষ ক'রে আবার শূদ্রের। একবার ক্ষেতির মার কাছ থেকে চারটী মুড়ি নিয়ে কি বিপদেই না প'ড়েছিল। কর্ত্তা শুনে একেবারে রেগে আগুন। খড়ম নিয়ে তেড়ে মারতে পর্য্যন্ত এসেছিল। বললে, শূদ্রের দান তুমি নিয়েছ! এতদূর স্পর্দ্ধা! মান সম্মান সব ডুবিয়ে দেবে? তা না হ'লে ব্যবস্থা সে ক'রতে পারতো। প্রসন্নদের বাড়ীতে চেয়ে পাঠালেই এক আধ-সের দুধ তারা হাসি মুখে দিয়ে যায়। গরু তাদের অনেক। দুধও হয় ঢের। কিন্তু স্বামী তা' পছন্দ ক'রবে না। শুনলে একটা অনাছিষ্টি কাণ্ড বাধিয়ে ব'সবে। তার উপরে আজ একুশ দিন তার প্রাণের দেবতা রঘুবীরের পূজা ক'রতে না পেয়ে মেজাজ একেবারে রুক্ষ হ'য়ে আছে। কারো খাতির করবে না। এই কথা শুনে হয় তো একটু চিন্তা ক'রবে। আর সে যদি কারো বাড়ী

থেকে চেয়ে আনার প্রস্তাব দেয় তখন ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে একবার চাইবে তারপর গম্ভীর ভাবে বলবে, রঘুবীরের উপর নির্ভর ক'রে থাকো, তাঁর যদি ইচ্ছা হয় ব্যবস্থা হবে, নয় তো হবে না। ব'লে বেশ নির্বিবকার ভাবে ঠাকুরঘরে গিয়ে ঢুকবে। কিন্তু সে তো চুপ ক'রে থাকতে পারবে না, সে যে মা। তার যে নাড়ীছেঁড়া ধন। অথচ উপায় থাকা সত্বেও শুধু ভাবনা আর ব্যথা নিয়ে চুপ ক'রে থাকতে হবে, গুমরে গুমরে ম'রতে হবে।

ভাবতে ভাবতে সংযম হারিয়ে ফেলে। তীব্র দৃষ্টিতে পুত্রবধূর দিকে চেয়ে তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে, ছিঃ ছিঃ! একটুখানি আক্কেল বুদ্ধি নেই মা। দুধটুকু খুলে রেখে কি ব'লে তুমি বেরিয়ে এলে? এখন ছেলেটাকে কি খাওয়াই?

পুত্রবধূ অপরাধিনীর মত নীরবে নত মস্তকে দাঁড়িয়ে থাকে। একটী কথারও জবাব দিতে পারে না।

ধনী বোকার মত একবার এর মুখের দিকে আর একবার ওর মুখের দিকে চাইতে থাকে।

পুত্রবধূর নীরবতায় এবং সমস্ত অবস্থা বিবেচনা ক'রে চন্দ্রমণির মেজাজটা আরো রুক্ষ হ'য়ে ওঠে। তাই সমান ঝাঁজের সঙ্গে বলে, যে দিকে না যাবো, বা না দেখবো, সেই দিকেই একটা বিভ্রাট ঘট্‌বে। আর তুমি ছেলেমানুষ নও, শ্বশুরের অবস্থা সব জানো। কত কষ্ট ক'রে এই দুধটুকুর যোগান ক'রতে হ'য়েছে, এর জন্যে হয়তো......আর ব'লতে পারে না। ব্যথায়, অভিমানে কণ্ঠ রোধ হ'য়ে আসে। চোখের কোণে জল এসে টলমল করে।

পুত্রবধূ লজ্জায় ঘৃণায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে চায়। কি ব'লে যে শাশুড়ীকে সান্ত্বনা দেবে ভেবে পায় না।

ধনী পুত্রবধূর রক্তাক্ত পাংশু মুখের দিকে চেয়ে তার অবস্থাটা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি ক'রে চন্দ্রমণিকে শান্ত করার জন্যে বলে, যা হবার তাতো

হ'য়েছে, আর বকাবকি ক'রে কি হবে বলো। বরং একটু দুধের চেষ্টা দেখো।

চন্দ্রমণি অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলে, এই দুধই কত কষ্টে নেওয়া হ'চ্ছে, তার উপর এত বেলায় কি আর দুধ পাওয়া যাবে ?

উত্তরে ধনী বলে, আমি একবার প্রসন্নদের বাড়ী যাবো ? তাদের তো অনেক গরু, দুধও হয় ঢের, চাইলে কি আর...

চন্দ্রমণি সঙ্গে সঙ্গে বলে, তাহ'লে তোর দাদা কি আর রক্ষে রাখবে ! শুনলে একটা অনাছিষ্টি কাণ্ড ক'রে ব'স্‌বে। জানিস না তার স্বভাব ?

ব'লতে ব'লতে ক্ষুদিরাম বাড়ী এসে ঢোকে। শিশুকে কাঁদতে দেখে এবং চন্দ্রমণির অশ্রুসিক্ত কণ্ঠস্বর শুনে বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, কি হ'ল ?

পুত্রবধূ শ্বশুরের সাড়া পেয়ে কুণ্ঠিত পদে আবার রান্নাঘরে গিয়ে ঢোকে।

চন্দ্রমণি আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে বলে, আর কি হবে— দুধটুকু সব বেড়ালে খেয়ে গেছে। ছেলে কাঁদছে এখন যে তাকে কি খাওয়াই...

ক্ষুদিরামের সমস্ত ভাব বিনষ্ট হ'য়ে যায়। মনটা চিন্তা ও বিষাদে ভ'রে ওঠে। নত মস্তকে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে কি আর হবে ! একটু মিছরী টিছরী ফুটিয়ে খাওয়াও। ব'লে ভারাক্রান্ত মনে ঠাকুরঘরে এসে ঢোকে। ঢোকে বটে কিন্তু আনন্দ, উৎসাহ, উদ্দীপনা কিছুই আর খুঁজে পায় না। সমস্ত ভাব অন্তর্হিত হ'য়ে ভাবনা এসে মনটাকে তোলপাড় ক'রতে থাকে। রঘুবীরের চিন্তা ছাপিয়ে শিশুপুত্র গদাধরের চিন্তায় মন ভারাক্রান্ত হ'য়ে ওঠে।

পূজাসনে ব'সে ভাবে, রামচাঁদকে একটা দুগ্ধবতী গাভীর জন্যে লিখলেই হ'ত। আর চিঠি পেয়ে সে নিশ্চয়ই একটা ব্যবস্থা ক'রতো। এতদিনে অন্ততঃ এই চিন্তা এবং ভাবনার হাত থেকে মুক্তি পেত। শিশু

পুত্রের জীবন নিয়ে ভগবানের উপর নির্ভর করাটা উচিৎ হয় নি। তার এই নিঃস্পৃহতা ও নিষ্ক্রিয়তার জন্যে রঘুবীরই হয়তো অসন্তুষ্ট হবেন। কারণ পঞ্চ-ইন্দ্রিয় দিয়ে পাঠিয়েছেন এবং সবগুলিই সক্রিয়। অকর্ম্মণ্য কোনটা নয়। আর এই বলিষ্ঠ ইন্দ্রিয়গুলি নিয়ে সপরিবারে তাঁর উপর নির্ভর ক'রে থাকলে তিনি হয়তো একদিন প্রকারান্তরে ব'লবেন, ওহে বাপু! তোমাকে যে আমি বলিষ্ঠ ও কর্ম্মঠ ক'রে পৃথিবীতে পাঠালাম সে কি শুধু পঙ্গু এবং অথর্ব্বের মত আমার মুখের দিকে চেয়ে ব'সে থাকবার জন্যে? তবে তোমাকে এমন বলিষ্ঠ ইন্দ্রিয়গুলি দিলাম কি ক'রতে?

ভাবনা বেড়েই চলে। প্রতিকার কিছু খুঁজে পায় না। পরিবারের অন্য কারো কিছু অভাব অভিযোগ থাকলে সে মোটেই কাতর হ'ত না। সবই তাঁর ইচ্ছা ব'লে নির্ব্বিকার থাকতে পারতো। আর থেকেছেও তাই। কিন্তু এ পুত্র যে তার দেবতার আশীর্ব্বাদ। বহু জীবনের বহু তপস্যার ধন……

চাটুয্যে মশায় আছেন নাকি?

বাইরে থেকে কে যেন ডাকে। ক্ষুদিরাম চ'ম্‌কে ওঠে। ভাবনাগুলো মিলিয়ে যায়। উঠ্‌বে কি উঠ্‌বে না ইতস্ততঃ করে।

লোকটা আবার ডাকে।

ক্ষুদিরাম পূজাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। কৌতূহল ও চিন্তা নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে। চন্দ্রমণিকে সদরের দিকে এগিয়ে যেতে দেখে বাধা দিয়ে বলে, আমি যাচ্ছি।

চন্দ্রমণি ফিরে দাঁড়ায়।

ক্ষুদিরাম দাওয়া থেকে নেমে এসে সদর দরজা খুলে দেখে—একটী সম্পূর্ণ অপরিচিত লোক। সঙ্গে তার সবৎস গাভী। বাছুরের গলায় দড়ি বাঁধা। দড়িটা তার হাতে। আর গরুটা অনতিদূরে চ'রে বেড়াচ্ছে। ক্ষুদিরাম বিস্মিত দৃষ্টিতে চায়।

লোকটা ক্ষুদিরামের পায়ে হাত দিয়ে নমস্কার ক'রে বিনীতভাবে

বলে, আমি মেদিনীপুরের মোক্তারবাবুর কাছ থেকে আসছি। এই গরু আর বাছুর তিনি আমাকে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আর এই চিঠি......

ক্ষুদিরাম চিঠিখানা নেয়। কিন্তু সহসা প'ড়তে পারে না। দেখে ও শুনে শরীর রোমাঞ্চিত হ'য়ে ওঠে। মনটা বিস্ময়ে অভিভূত হ'য়ে যায়। বাক্‌শক্তি হারিয়ে ফেলে। ভগবানের অপরিসীম করুণার কথা স্মরণ ক'রে চক্ষু সজল হ'য়ে ওঠে। শুধু লোকটার মুখের উপর অর্থহীন দৃষ্টি রেখে স্থূল জগৎ ছেড়ে চ'লে যায় ঊর্দ্ধলোকে। চোখ দিয়ে টপটপ ক'রে ঝরে পড়ে জল। শোভন অশোভনের কথা ভুলে যায়।

লোকটা ক্ষুদিরামকে নির্ব্বাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ও চোখে জল দেখে হতবুদ্ধি হ'য়ে যায়। কোন অপরাধ ক'রে ফেলেছে কিনা মনে মনে বিশ্লেষণ করে। কিন্তু হাতড়ে কিছুই পায় না, শেষে আর চুপ ক'রে থাকতে না পেরে প্রবল কুণ্ঠার সঙ্গে বলে, আজ্ঞে আমি কি......

লোকটার কথায় ক্ষুদিরামের সম্বিত ফিরে আসে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় একটা সম্পূর্ণ অপরিচিত লোকের সম্মুখে এই আবেগটা প্রকাশ না ক'রলেই পারতো। মানুষটা কি ভাবলো। আর মনের যা অবস্থা তাতে কথা ব'লতে গেলে কণ্ঠস্বর কেঁপে যাবে, হয়তো আবেগে রুদ্ধ হয়েও আসতে পারে। সেটা আরো লজ্জার ব্যাপার হবে। তাই আর না দাঁড়িয়ে চিঠিখানা হাতে নিয়ে একেবারে ঠাকুরঘরে এসে ঢোকে।

স্বামীকে চোখে জল ও হাতে চিঠি নিয়ে নির্ব্বাক হ'য়ে ঠাকুরঘরে ঢুকতে দেখে চন্দ্রমণির কৌতূহল উৎকণ্ঠায় এসে দাঁড়ায়। আর সেই উৎকণ্ঠা দমন ক'রতে না পেরে একেবারে সদর দরজার কাছে এসে হাজির হয়। একটা অপরিচিত লোক এবং তা'র সঙ্গে গরু ও বাছুর দেখে বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, কি হ'য়েছে ?

লোকটা ভয়ে বিস্ময়ে পাংশু মুখে কুণ্ঠিত হ'য়ে বলে, আজ্ঞে আমি মেদিনীপুরের :মোক্তারবাবুর কাছ থেকে আস্‌ছি। তিনি আমাকে দিয়ে এই গরু, বাছুর ও একটা চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছেন।

সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রমণির কাছে সব রহস্য স্বচ্ছ হ'য়ে ওঠে। স্বামীর চোখে জল এবং নির্ব্বাক হবার কারণ বুঝ্‌তে আর দেরী হয় না। আনন্দে আর আবেগে তারও চোখ দুটি ছলছলিয়ে ওঠে। কণ্ঠও রোধ হবার মত হয়। কিন্তু অনেক কষ্টে সে ভাব দমন ক'রে আবেগের সঙ্গে কম্পিত স্বরে বলে, এস, এস, বাড়ীর ভিতর এস। ব'লে আবার ভিতরে ঢোকে।

লোকটিও চন্দ্রমণিকে অনুসরণ ক'রে বাছুর নিয়ে উঠানে এসে দাঁড়ায়। গরু ও বাছুর পিছু পিছু আসে। লোকটা ভিতরে ঢুকে চন্দ্রমণিকে লক্ষ্য ক'রে বলে, মাঠান্! অনেকক্ষণ হয় বাছুরটাকে আট্‌কে রেখেছি। একটা কোন পাত্তর দিন, গরুটাকে দুইয়ে নিয়ে বাছুরটাকে ছেড়ে দিই। কোঁয়ালে বাছুর……

চন্দ্রমণি ঘরে ঢুকে তাড়াতাড়ি ক'রে একটা পেতলের ঘটি এনে দেয়। আর লোকটাও বাছুরটাকে ছেড়ে দেয়। বাছুরটা ছুটে গিয়ে মাতৃস্তনে মুখ লাগায়। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে বাছুরটাকে স্তনচ্যুত ক'রে গরুটার সম্মুখের পায়ের সঙ্গে গলাটা বাঁধে। তারপর হাঁটু গেড়ে ব'সে দুধ দুইতে থাকে।

আনন্দে ও আবেগে চন্দ্রমণির দু'চোখ বেয়ে হু হু ক'রে জল নামে।

তেইশ

সেদিন ঈশ্বরের অপার করুণা আর শিশুপুত্রের ভাগ্য দেখে ক্ষুদিরাম ভাবে, আর সে ভাববে না। অন্ততঃ আর যার জন্যই ভাবুক গদাধরের জন্যে ভাববে না। তার প্রয়োজন এমনি অভাবনীয় উপায়েই মিট্‌বে। তা' না হ'লে রামচাঁদকে পুত্রের জন্ম-সংবাদ দিয়ে পত্র দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুগ্ধবতী

গাভী পাঠিয়ে দিত না। আর শুধু মাত্র অনুমান ক'রে পাঠিয়েছে। অবশ্য সে জানে মাতুল তার দরিদ্র। শিশুকে দুধ কিনে খাওয়াবার সঙ্গতি নেই, কিন্তু খাওয়াতেই হবে। অন্ততঃ দু'তিন বছর পর্য্যন্ত, এবং তার আত্ম-মর্য্যাদাসম্পন্ন মামা কারো কাছে সাহায্য বা অনুগ্রহ চাইবেন না। তা' চাইলে তাকেই জানাতো। এই সব ভেবে আর কাল বিলম্ব না ক'রে সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়ে তাকে আপাততঃ চিন্তার হাত থেকে মুক্ত ক'রেছে। ক্ষুদিরামের হৃদয় সেদিন রামচাঁদের বুদ্ধি, বিবেচনা, স্নেহ, করুণা দেখে মুগ্ধ হ'য়ে সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ ক'রেছিল।

কিন্তু পিতৃহৃদয় না ভেবে পারে না। মন থাকলেই ভাবনা থাকবে। তবে কম আর বেশী। পুত্রকে একটু হাঁচতে কাশতে দেখলেই মনটা কেমন যেন ভারাক্রান্ত হ'য়ে যায়। ভাবনা কোন এক সময়ে অজ্ঞাতসারে এসে তার ক্রিয়া ক'রতে থাকে। ক্রমে ক্রমে বিগত দিনের বিস্ময়কর ঘটনা-গুলিকে ভুলিয়ে দেয়। অপত্য স্নেহের জোয়ারে সব ভেসে যায়। ভুলে যায় গদাধর তার নারায়ণের অংশ-সম্ভূত। এইজন্যই ব'লেছে···স্নেহ অন্ধ।

তবে আগের তুলনায় এখন সেটা অনেক ক'মে এসেছে। আগে যেমন ঝেড়ে ফেলতে পারতো না, সব সময় কাঁটার মত মর্ম্মস্থলে খচ খচ ক'রে বিঁধতো, এখন আর তা হয় না। হঠাৎ কিছু দেখলে বা শুনলে সাময়িক মনটা চঞ্চল হ'য়ে ওঠে বটে, কিন্তু আগের মত দীর্ঘস্থায়ী হয় না। ঝড়ের মত একটু দোলা দিয়ে চ'লে যায়।

ক্ষুদিরামের যদিও বিগত দিনের বিস্ময়কর স্মৃতি ও অনুভূতিগুলি মাঝে মাঝে মনে পড়ে, আর তাই ভেবে পুত্র গদাধর সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়, কিন্তু চন্দ্রমণির সেই নীলপূজার দিনের ঘটনা বা অনুভূতি কিছুই আর মনে থাকে না। কোন ক্রমেই···এমন কি স্বামীর কথাতেও বিশ্বাস ক'রতে পারে না যে, পুত্র তার অসামান্য। দেবতার অংশ-সম্ভূত। ভাল মন্দ, জন্ম মৃত্যু তার ইচ্ছাধীন। বরং আসে বিপরীত ভাব। রক্ত মাংসের দেহ নিয়ে যে পৃথিবীতে এল সে সৃষ্টিছাড়া হয় কি ক'রে ? রামকুমার,

রামেশ্বর, কাত্যায়নীও যা তার গদাইও তাই। একটু হাঁচি কাসি দেখলেই মনটা শঙ্কিত হ'য়ে ওঠে। বার বার রঘুবীরের চরণতলে প'ড়ে পুত্রের মঙ্গল কামনা করে। করে বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ নির্ভরও ক'রতে পারে না। একে-ওকে-তাকে কি ক'রলে ভাল হয় জিজ্ঞাসা করে। শত কাজের ফাঁকে সময় ক'রে বুকে একটু মাসকলাইয়ের তেল মালিশ ক'রে দেয়। তুলসীপাতার রস মধু মিশ্রিত ক'রে খাওয়ায়, সেই সঙ্গে উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ নিয়ে দিনযাপন করে। হাসি অন্তর্হিত হয়। সব সময় কি হবে কি হবে ভাব। প্রাণ খুলে কারো সঙ্গে মিশতে পারে না। পরিশেষে যত দেবদেবীর কথা মনে আসে সকলের কাছেই পুত্রের জন্যে মানত করে। আর এমনি ক'রেই কখনো ভাবিয়ে, কখনো না ভাবিয়ে গদাধর ষষ্ঠমাসে এসে পড়ে।

চন্দ্রমণির সব ভাবনা গিয়ে এখন ছেলের মুখে ভাত দেবার ভাবনা এসে মনটাকে চিন্তিত ক'রে তোলে। যেমন তেমন ক'রে দিতে গেলেও অন্ততঃ এক কুড়ি টাকা দরকার। দু'চারজনকে ব'লতেই হবে। আত্মীয়স্বজন যে ক'ঘর আছে তাদের না ব'ললে ভাল দেখায় না। তা'ছাড়া অনাত্মীয়ের ভিতরও দু'চারজনকে ব'লতে হবে। না ব'ললে পরে পাঁচ কথা উঠ্‌বে। অথচ তাদের যা অবস্থা···কি ক'রে যে কি হ'বে······চন্দ্রমণি ভেবে কোন কূল-কিনারা পায় না। আবার যা নিয়ম তা'তো রক্ষা ক'রতে হবে। অথচ স্বামী তার নীরব, একেবারে উদাসীন। মনে না ক'রিয়ে দিলে হুঁস হবে না। আর এখন থেকে না ভাবলে বা যোগাড় যন্ত্র না ক'রলে হবে কি করে?

তাই সেদিন ক্ষুদিরাম পূজা সেরে ঠাকুরঘর থেকে বেরুতেই চন্দ্রমণি বলে, হ্যাঁগা, ছেলে তো ছ'মাসে প'ড়লো। এখন তো মুখে চারটি ভাত দিতে হবে। তার কি করছ বলো দেখি?

চন্দ্রমণির কথায় ক্ষুদিরামের সব ঐশ্বরিক ভাব বিনষ্ট হ'য়ে ভাবনা এসে উপস্থিত হয়। মুখের উপর চিন্তার রেখা ধীরে ধীরে ফুটে ওঠে। সহসা জবাব দিতে পারে না। কারণ এর জন্যে সে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। কখন কবে গদাধর যে তার ষষ্ঠ মাসে এসে প'ড়েছে তা সে হিসাব করে নি,

তাই ভাবনাও ছিল না। দিনগুলি জপতপ নিয়ে নদীস্রোতের মত বেশ ব'য়ে যাচ্ছিল। কিন্তু আর না ভেবে উপায় নেই। দেশাচার, কুলাচার যা আছে তা তো ক'রতেই হবে, অন্ততঃ সে না ক'রে পারে না। দেশ-ঘরে তার একটা মান আছে, খ্যাতি আছে, নিষ্ঠাচারী ব'লে সকলে জানে; অনেকে এই সব ব্যাপারে পরামর্শ ও বিধান নিতে আসে। আর সে যদি যথাকর্ত্তব্য না ক'রে যাঁর কাজ তিনি ক'রবেন ব'লে নিশ্চিন্ত থাকে তা' হ'লে লোকে ব'লবে কি ? অথচ বিশেষ দেরী করা চ'লবে না। অন্নপ্রাশনের কালে অন্নপ্রাশন দিতেই হবে। অভাব অভিযোগ, দুঃখ দরিদ্রতার জন্যে নিয়মের ব্যতিক্রম করা চ'লবে না। অন্ততঃ তার পক্ষে সম্ভব নয়। বিশেষ ক'রে গদাধরের অন্নপ্রাশন।

স্বামীকে নীরব এবং চিন্তিত দেখে চন্দ্রমণির অনুশোচনা জাগে। ভাবে কথাটা এখন না ব'ললেই হ'ত। খাওয়া দাওয়ার পর ব'ললেই ভাল ক'রতো। এই ভাবনায় খাওয়াটা হয়তো তৃপ্তিদায়ক হবে না। তাই খুব উপেক্ষাভরে বলে, যাক্‌গে, যা' হবার হবে। ও পরে ভেবো। এখন খাবে চলো। বেলা ঢের হ'য়েছে।

ক্ষুদিরাম একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে শেষ মধ্যাহ্নের রৌদ্রদগ্ধ দিগন্তের দিকে চেয়ে চিন্তিত মনে বলে, হ্যাঁ, চলো।

অন্যদিন খেতে ব'সে ক্ষুদিরাম অনেক কথা বলে। বিবিধ প্রশ্ন করে। রামকুমার, রামেশ্বরকে না দেখলে জিজ্ঞাসা করে, তারা কোথায় গেছে ? আজ পূজা ক'রতে বেশ দেরী হ'ল প্রভৃতি এই ধরণের অনেক কথা। এই সময়টাতেই চন্দ্রমণির সঙ্গে কথা বলার অবকাশ পায়। কারণ সে আহারের কাছে ব'সে খাওয়ার তাদারক করে, সেই সঙ্গে নানাবিধ কথাবার্ত্তাও বলে।

আজ কিন্তু স্বামীকে চিন্তিত ও নীরব দেখে কোন কথা আর জিজ্ঞাসা ক'রতে সাহস পায় না। শুধু অসহায় ও নির্ব্বাক হ'য়ে পাখাখানা নাড়তে থাকে।

আর ক্ষুদিরাম খেতে খেতে হিসাব করে......গদাধর জন্মেছে ফাল্গুন

মাসে। আর এটা শ্রাবণ মাস। তা' হ'লে ছ'মাসই তো হ'ল। এরপর ভাদ্র মাস। ভাদ্র মাসে কোন শুভকাজ করা বিধেয় নয়। ক'রলে এই মাসেই একটা শুভদিন দেখে ক'রতে হয়। আর দেরী করা চ'লবে না। খেয়ে উঠেই পাঁজিখানা দেখতে হবে।

কিন্তু ভাবনাটা দুর্ভাবনা হয় সঙ্গতির কথা মনে হ'তে। আর কাকেও না বলুক অন্ততঃ আত্মীয়স্বজন যারা আশেপাশে আছে তাদের তো ব'লতে হবে। মনে মনে তার একটা হিসাব ক'রে দেখে—কমপক্ষে পঁচিশ জন। তা'ছাড়া দু'চারটে বাড়তি লোকও যে না হবে তা' নয়। ব্রাহ্মণবাড়ী কাজ হ'লে দীন দরিদ্র অব্রাহ্মণ বিনা নেমন্তন্নেই খেয়ে যায়, আর যাবেও। তা' হ'লে পঞ্চাশজনের মত আয়োজন ক'রতে হবে। শুধু ডাল, ভাত একটা তরকারী ক'রলেই চ'লবে না। সে তো সকলেই বাড়ীতে রোজ খায়। নেমন্তন্ন ক'রে এনে ঐ খাওয়ানো মানে রসিকতা করা। আর তাতে দুর্নাম হয়। খেয়ে উঠেই বাড়ীর বাইরে গিয়ে ব'লবে, খাওয়ালো তো ডাল ভাত—তা আবার বেলা তেপ্রহরের সময়। ওতো বাড়ীতে রোজই খাই। না আছে দই, না আছে মিষ্টি। অতএব পঁচিশজনই খাক আর পাঁচশো জনই খাক আয়োজন তাকে ষোড়শোপচারেই ক'রতে হবে। দই, মিষ্টি, পরমান্ন, মাছ, পাঁচ রকম ব্যঞ্জন সবই ক'রতে হবে, তবে পরিমাণে কম আর বেশী। যা হোক যখন ক'রতে হবে তখন আর অযথা দেরী ক'রে লাভ কি? যেমন ক'রে হোক ক'রে তো ফেলা যাক। তারপর রঘুবীর আছেন।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে ভাবনায় সমাপ্তি দিয়ে ক্ষুদিরাম চন্দ্রমণির দিকে চায়। ভাতের গ্রাসটা চিবুতে চিবুতে বলে, হ্যাঁ, অন্নপ্রাশনটা এই মাসেই দেওয়া দরকার। তবে কোন ঘটা করা সম্ভব হবে না। নমো নমো ক'রে সারতে হবে।

স্বামীর কথা শুনে চন্দ্রমণি আশ্বস্ত হয়। মুখের থেকে চিন্তার রেখাগুলো মিলিয়ে যায়। খুশীর সঙ্গে বলে, নমো নমো ক'রে সারলেও দু'চার জনকে ব'লতে হ'বে তো?

ক্ষুদিরাম আর একটা গ্রাস মুখের ভিতর ফেলতে গিয়ে বিরত হ'য়ে বলে, তা' হবে বৈকি ? নেহাৎ যাকে না ব'ললে নয়- খারাপ দেখায়, এই রকম দু'চারজনকে ব'লে রঘুবীরের প্রসাদ মুখে দিয়ে দেবো।

যদিও চন্দ্রমণির ইচ্ছা ছিল গদাধরের অন্নপ্রাশনে একটু ঘটা কর্বার কিন্তু স্বামীর কথায় এবং অবস্থা বিবেচনা ক'রে উদ্গত নিঃশ্বাসটাকে চেপে নিয়ে ক্ষুণ্ণমনে বলে, হ্যাঁ, যেমন অবস্থা তেমন ব্যবস্থা ক'রতে হবে বৈকি। তা' হ'লে একটা দিন-টিন দেখো।

ক্ষুদিরাম হ্যাঁ, ব'লে আহার শেষ ক'রে উঠে পড়ে। হাতমুখ ধুয়ে ঘরে ঢুকে পাঁজিখানা টেনে নেয়। নিবিষ্ট মনে দেখে—আগামী বুধবার দিনটা ভাল। তবে সময় বেশী পাওয়া যাবে না। মাত্র সাতদিন সময় আছে। এর মধ্যে সব ব্যবস্থা ক'রে ফেলতে হবে। রামচাঁদকে একখানা চিঠি দিতে হবে। কাত্যায়নীকে ও জামাতাকে ব'লতে হবে। তার দুই কনিষ্ঠ ভাই—নিধিরাম ও কানাইরামকে সপরিবারে আস্‌বার জন্যে ব'লে আসতে হবে।

ক্ষুদিরাম পাঁজি রেখে চিন্তিত মনে দাওয়ায় এসে রান্নাঘরের দিকে চেয়ে দেখে—রামকুমার এসেছে কিনা। রামকুমারকে না পেয়ে চন্দ্রমণিকে ডেকে বলে, রামকুমার এলে ব'লো আমার সঙ্গে দেখা না ক'রে যেন বেরিয়ে যায় না।

চন্দ্রমণি রান্নাঘর থেকে 'আচ্ছা' ব'লে জবাব দেয়।

ক্ষুদিরাম আবার ঘরে ঢোকে। দোয়াত কলম টেনে নিয়ে রামচাঁদকে পুত্রের অন্নপ্রাশনের সংবাদ দিয়ে আসার জন্য পত্র দেয়।

চিঠি লেখা শেষ হ'তে না হ'তে রামকুমার এসে দাঁড়ায়। বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করে, বাবা, আমাকে ডেকেছেন ?

ক্ষুদিরাম চিঠির উপর থেকে দৃষ্টি তুলে রামকুমারের উপর ফেলে চিন্তিত মনে বলে, হ্যাঁ, সামনের বুধবার গদাইয়ের অন্নপ্রাশনের দিন স্থির ক'রেছি। আর বেশী দেরীও নেই। তুমি কাল সকাল বেলা বেরিয়ে

তোমার দুই কাকাকে সপরিবারে নেমন্তন্ন ক'রে আসবে। আর যদি সম্ভব হয় তবে ফেরার পথে কাত্যায়নী ও জামাতা বাবাজীকে ব'লে আস্‌বে।

রামকুমার ঘাড় নেড়ে বলে, যে আজ্ঞে।

ক্ষুদিরাম একই ভাবে বলে, আর কা'কেও বলি না বলি···আত্মীয়-স্বজন যে ক'ঘর আছে তাদের তো ব'লতে হ'বে।

রামকুমার পিতার কথা সমর্থন ক'রে বলে, তাতো বটেই।

ক্ষুদিরাম আর কোন কথা না ব'লে আবার পত্র লেখায় মনোনিবেশ করে।

রামকুমার একটু ইতস্ততঃ ক'রে বলে, তা' হ'লে আমি এখন যেতে পারি ?

ক্ষুদিরাম পত্রের উপর দৃষ্টি রেখেই বলে, হ্যাঁ, তুমি এখন যেতে পারো।

রামকুমার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে।

ক্ষুদিরাম পত্র লেখা শেষ ক'রে কালি কলম যথাস্থানে রাখে। বাইরের দিকে চেয়ে বেলাটা অনুমান ক'রে নেয়। তারপর লিখিত পত্রখানা নিয়ে ডাকঘরের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে।

ডাকঘরের পথটা ধর্ম্মদাসের বাড়ীর পাশ দিয়ে। ক্ষুদিরাম যেতে যেতে ভাবে···ধর্ম্মদাসের সঙ্গে একটা পরামর্শ করা দরকার। সমবয়সী বন্ধুও বটে, তার উপরে গ্রামের জমিদার এবং বৈষয়িক লোক। অনেক ক্রিয়াকর্ম্ম ক'রেছে ও করে। কত কি খরচ প'ড়বে, এবং পঞ্চাশ জনকে খাওয়াতে কত চাল, ডাল, তেল, নুন, মশলাপাতি কি কি লাগবে তার একটা নিখুঁত হিসাব দিতে পারবে। আর সেই কারণেই খাওয়া দাওয়ার পর বিশ্রাম না ক'রেই বেরিয়ে পড়ে। তবে ভেবেছিল চিঠিখানা ফেলে দিয়ে ফেরার পথে ধর্ম্মদাসের বাড়ী এসে উঠ্‌বে। কিন্তু যাবার সময় দেখে—ধর্ম্মদাসের বাইরের ঘরে এক ঘর লোক এবং ধর্ম্মদাস তাদের সঙ্গে গভীর আলোচনায় রত।

ক্ষুদিরামকে দেখে ধর্ম্মদাস উৎফুল্ল কণ্ঠে ডেকে বলে, দাদা যে! বলি এই দুপুর বেলা কোথায় চ'লেছ ?

ক্ষুদিরাম পথের উপরে দাঁড়িয়েই বলে, ডাকঘরে।

ধর্ম্মদাস বিস্মিত কণ্ঠে বলে, এই দুপুর বেলা!

ক্ষুদিরাম আরো একটু এগিয়ে এসে দাওয়ার নীচে সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে বলে, পত্রখানা জরুরী। আর তোমার সঙ্গে একটু পরামর্শ……

ক্ষুদিরামকে কথাটা শেষ করার অবকাশ না দিয়ে ধর্ম্মদাস ব্যস্ত হ'য়ে দাঁড়িয়ে উঠে বলে, এস, এস!

ক্ষুদিরাম একটু ইতস্ততঃ ক'রে বলে, চিঠিখানা ফেলে দিয়ে আসছি…

ধর্ম্মদাস একই ভাবে বলে, সে হবেখন। ডাকঘর তো আর সন্ধ্যের আগে বন্ধ হ'চ্ছে না।

ক্ষুদিরাম তবু ইতস্ততঃ করে।

ধর্ম্মদাস জিজ্ঞাসা করে, চিঠি ফেলা ছাড়া আর কোন কাজ আছে নাকি ?

ক্ষুদিরাম কি ভেবে দাওয়ায় উঠ্‌তে উঠ্‌তে বলে, না আর কোন কাজ নেই।

ধর্ম্মদাস যথাস্থানে ব'সে বলে, তবে এস। তামাক খেয়ে যাও। আমি চিঠিখানা ডাকবাক্সে ফেলে দেওয়ার ব্যবস্থা ক'রছি। ব'লে ঘরের এক কোণে উপবিষ্ট একটি অল্পবয়সী ছেলেকে লক্ষ্য ক'রে বলে, বিশে! দাদার চিঠিখানা ডাকবাক্সে ফেলে দিয়ে আয় তো।

বিশু কোন উক্তি না ক'রে ক্ষুদিরামের সম্মুখে এসে দাঁড়ায়। হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে বিনীত ভাবে বলে, কই দিন!

ক্ষুদিরাম ঘরে ঢুকতে সকলেই উঠে দাঁড়ায়। কেউ কেউ এগিয়ে এসে পায়ের ধূলো নেয়। কেউ কুশল সমাচার জিজ্ঞাসা করে।

ক্ষুদিরাম চিঠিখানা বিশুর হাতে দিয়ে প্রশান্ত কণ্ঠে সকলকে ব'সতে বলে, ও যথাযথ প্রশ্নের উত্তর দেয়।

ধর্ম্মদাস ঘরের এক কোণে অবস্থিত চেয়ারটার দিকে নির্দ্দেশ ক'রে বলে, ব'স! তারপর বাড়ীর চাকরকে ডাকে।

ক্ষুদিরাম চেয়ারটাতে গিয়ে বসে।

ধর্ম্মদাসের ডাকে বাড়ীর চাকর ভূতো ব্যস্ত হ'য়ে ছুটে আসে। কাণে হাত দিয়ে ধর্ম্মদাসের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চায়।

ধর্ম্মদাস বেশ চীৎকার ক'রে সেই সঙ্গে হাবে ভাবে এক ক'ল্কে তামাক সেজে ও কড়ি বাঁধা হুঁকায় জল ফিরিয়ে আনতে বলে।

ভূতো 'যে আজ্ঞে' ব'লে বেরিয়ে যায়।

ধর্ম্মদাস ক্ষুদিরামের দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে চেয়ে আগ্রহ ভরে জিজ্ঞাসা করে, কি ব্যাপার বল তো শুনি?

ক্ষুদিরাম গৃহমধ্যে উপবিষ্ট লোকগুলির দিকে একবার চেয়ে একটু ইতস্ততঃ ক'রে বলে, সামনের বুধবার ছেলের মুখে ভাত দেবার দিন স্থির ক'রেছি। তাই আর কি—কত কি লাগবে টাগবে তার একটা হিসাব তোমাকে ক'রে দিতে হবে। এই জন্যে আর কি রোদের মধ্যে······

ক্ষুদিরামকে কথাটা শেষ করার অবকাশ না দিয়ে ধর্ম্মদাস জিজ্ঞাসা করে, কত লোক খাবে?

ধর্ম্মদাসের প্রশ্নে ক্ষুদিরাম একটু বিব্রত বোধ করে। কারণ কাজটা নীরবে সারতে চেয়েছিল। বেশী জানাজানি হ'লে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হ'তে পারে, এবং তা' তার সামর্থ্যের বাইরে গিয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু প্রশ্ন যখন হ'য়েছে তখন উত্তর দিতেই হবে। তাই উপেক্ষা ভরে বলে, কোন রকমে নমো নমো ক'রে সেরে দেওয়া। তবে দু'চার ঘর আত্মীয়বন্ধু যাদের না ব'ললে নয়···এই আর কি···রঘুবীরের প্রসাদ মুখে দিয়ে······

গৃহাভ্যন্তরে উপবিষ্ট চিনু সহসা ব'লে বসে, আমরা প্রসাদ পাবো না?

চিনুর দেখাদেখি সকলেই সমস্বরে ব'লে ওঠে, আমরা?

ক্ষুদিরামের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। মুখখানা পাংশু হ'য়ে ওঠে।

ইতিপূর্ব্বে হিসাবকরা লোকসংখ্যা গোলমাল হ'য়ে যায়। কার কথায় কি যে জবাব দেবে ভেবে পায় না।

সেই অবসরে ধর্ম্মদাস আবার চোখের ইঙ্গিতে সকলকে উৎসাহিত করে।

ধর্ম্মদাসের ইঙ্গিত পেয়ে মধু যুগী বলে, না চাটুয্যেমশায়, নমো নমো ক'রে সারলে চ'লবে না।

চিনু মধুর কথায় সায় দিয়ে বলে, আমরা কত আশা ক'রে আছি।

ইতিমধ্যে ভূতো তামাক সেজে হুঁকার উপর ক'ল্‌কে দিয়ে ঘরে ঢুকে ক্ষুদিরামের দিকে বাড়িয়ে ধরে।

ক্ষুদিরাম ভূতোর হাত থেকে হুঁকাটা নেয়। মুহূর্ত্তের মধ্যে উদ্‌গত নিঃশ্বাসটা চেপে নিয়ে এবং মুখের ভাব পরিবর্ত্তন ক'রে হাসিমুখে বলে, বেশ তো—বেশ তো—তোমাদের সকলকে আমি এখনই নিমন্ত্রণ ক'রে রাখলাম।

ক্ষুদিরাম নিমন্ত্রণ করে বটে কিন্তু ভয়ে ভাবনায় বুকের ভিতরটা শুকিয়ে ওঠে। কিছুতেই মুখের প্রশান্ত ভাবটা বজায় রাখতে পারে না। হিসাব ক'রে দেখে—এখানেই পঞ্চাশজন লোক হবে। সকলের সঙ্গেই যে বেশ হৃদ্যতা ও মাখামাখি আছে তা' নয়। অতএব এদের ব'ললে যাদের সঙ্গে হৃদ্যতা আছে তাদেরও ব'লতে হয়, এবং হবেও। না ব'ল্‌লে আর ভাল দেখায় না। প্রকারান্তরে সমগ্র গ্রামবাসীই হবে। এর উপর আছে ভূরসুবোর মানিক রাজার বাড়ী, জ্যোতিষ শাস্ত্রীর বাড়ী, কি যে হবে···বুক ভেঙ্গে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসার জন্যে ছট্‌ফট ক'রতে থাকে। অনেক কষ্টে সেটাকে দমন ক'রে হুঁকাতে মুখ লাগায়।

ক্ষুদিরামের নিমন্ত্রণ পেয়ে সকলেই উৎফুল্ল হয়। এই নিয়ে ঘরের মধ্যে বেশ একটা গুঞ্জন ওঠে। আগেকার আলোচনার বিষয়বস্তু ধামাচাপা প'ড়ে যায়।

ক্ষুদিরাম বেশ বুঝতে পারে এত চিন্তা ও ভাবনা নিয়ে বিশেষতঃ

এত লোকের মধ্যে আলোচনাটা সুখদায়ক হবে না। কোন এক সময়ে তার অজ্ঞাতসারে দুর্ভাবনা ও দুশ্চিন্তার রেখাগুলো মুখের উপর ধীরে ধীরে ফুটে উঠ্‌বে। আর তা' দেখে লোকগুলো নিশ্চয় বুঝে নেবে প্রশান্তি অন্তর্হিত হবার কারণ। পরিশেষে কেউ হয় তো ব'লবে, না না, চাটুয্যে-মশায়, আমরা ঠাট্টা ক'রলাম। আপনার অবস্থা কি আমরা জানি নে। আপনি যা হোক্ ক'রেই সারুন। কি ক'রে পারবেন। আর এই ভাবে ব'ললে তার কাছে অত্যন্ত পীড়াদায়ক এবং লজ্জার বিষয় হবে। তাই হুঁকায় একটা দীর্ঘ টান দিয়ে ধোঁয়ার সঙ্গে ধীরে ধীরে দীর্ঘশ্বাসটা ছেড়ে ক'ল্‌কে সমেত হুঁকাটা ধর্ম্মদাসের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলে, খাও।

ধর্ম্মদাস দাঁড়িয়ে উঠে হুঁকাটা নেয়।

সেই সঙ্গে ক্ষুদিরামও উঠে দাঁড়ায়। ধর্ম্মদাসের দিকে চেয়ে বলে, এখন আমি যাই। তোমরা আলোচনা সেরে নাও। অন্য এক সময়ে আসবো। এখনও তো সাতদিন দেরী আছে। ব'লে মতামতের অপেক্ষা না ক'রে বাইরের দিকে পা বাড়ায়।

ধর্ম্মদাস কি ভেবে আর বসবার জন্যে অনুরোধ না ক'রে বলে, তোমাকে আর আস্‌তে হবে না, আমিই যাবোখন।

ক্ষুদিরাম 'আচ্ছা' ব'লে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে।

●

চব্বিশ

ক্ষুদিরাম তার নিরুপায় অবস্থাটা পাছে চোখেমুখে ফুটে ওঠে তাই তাড়াতাড়ি ধর্ম্মদাসের বাইরের ঘর থেকে বেরিয়ে আসে বটে, কিন্তু আসার সঙ্গে সঙ্গে দুর্ভাবনা এবং দুশ্চিন্তা সারা মুখখানাতে প্রকট হ'য়ে ওঠে। অনুশোচনা জাগে দরিদ্রতার কথা ভেবে। লুচি নয়, মেঠাই মণ্ডা নয়,

চারটি ভাত। ভগবান তাও তাকে দেবার সঙ্গতি দেন নি। চারটি ভাত চেয়ে তার কাছে কেউ কোনদিন বিমুখ হয় নি। এমন কি পুত্র পরিবারকে পর্য্যন্ত সেই শিক্ষা দিয়ে এসেছে। কোন অতিথি ভোজনের পূর্ব্বে এসে অন্ন চাইলে তাকে যেন বিমুখ করা না হয়। এবং তার জন্যে যদি অভুক্ত থাকতে হয় তাও আচ্ছা। সেই লোক কেমন ক'রে প্রত্যাখ্যান করে এই লোকগুলোর আব্দার? বিশেষ ক'রে তার গদাধরের অন্নপ্রাশনে।

কিন্তু আব্দার রক্ষা করার উপায় ভাবতে গিয়ে হাত পা অবশ হ'য়ে আসে। আর সময়ও বেশী নেই যে, বেশ ক'রে ভেবে চিন্তে একটা উপায় উদ্ভাবন ক'রবে। এখন একমাত্র উপায় নিজেদের খোরাকির ধান বিক্রী ক'রে কাজ উদ্ধার করা। এ ছাড়া আর আর যে সব উপায় মনের মধ্যে এসে উঁকি ঝুঁকি মারে সেগুলো গ্রহণ ক'রতে মন যেন ঠিক সায় দেয় না। সে উপায়গুলির মধ্যে একটি হ'চ্ছে রামচাঁদকে বিস্তারিত জানিয়ে সাহায্য চাওয়া। আর নয় তো ধর্ম্মদাসের কাছে ধার চাওয়া।

রামচাঁদ প্রতি মাসে তাকে পণের টাকা সাহায্য ক'রে আসছে। তা' ছাড়া তার সঙ্গে দেখা ক'রতে গেলেই কাপড় চোপড়, এটা ওটা কিনে দেয়। আর এই চিঠি পেয়ে সাধ্যমত নিশ্চয় কিছু পাঠাবে। হয় টাকাই পাঠাক নয় জিনিষ-পত্তরই পাঠাক, কিছু পাঠাবে।

আর এক—ধর্ম্মদাসের কাছে ধার চাওয়া। চাইলে হাসিমুখেই দেবে। কিন্তু শোধ ক'রবে কি ক'রে? আয় কোথায়? সেই গয়াধামে যাবার সময় যে টাকা ধার ক'রেছিলো তাই এখনও শোধ হয় নি। এর পরে ধার চাওয়া···সে অনুগ্রহ চাওয়ারই নামান্তর। এবং শোধ ক'রতে না পারলে মিথ্যাচারী হ'য়ে যেতে হবে। যার জন্যে দেড়শো বিঘে নিষ্কর সম্পত্তি ছেড়ে, পৈতৃক বাস্তু ছেড়ে এল। আর আজ জীবনের সায়াহ্ন কালে এসে তাই ক'রতে হবে?

ধর্ম্মদাস তাকে সাহায্য করার জন্যে উন্মুখ। অর্থাৎ কিছু দান ক'রে কৃতার্থ হ'তে চায়। অবশ্য নেবার লোকের অভাব নেই। কিন্তু সে নিতে

পারে না। কোন ক্রমেই না। একবার পদস্খলন হ'লে ধীরে ধীরে নেমে যাবে। মান সম্মান, গৌরব সবই বিনষ্ট হবে।

সে দরিদ্র। গ্রামবাসী সকলেই জানে। তবু তা'কে যে শ্রদ্ধা ভক্তি করে শুধু এই কারণে। আজও পর্য্যন্ত তার স্নান সারা না হ'লে কেউ ঘাটে নামে না। এসে আগে জিজ্ঞাসা করে, চাটুয্যেমশায়ের স্নান হ'য়েছে কিনা ? পথে-ঘাটে দেখা হ'লে শ্রদ্ধা ভক্তিতে অবনত হ'য়ে পড়ে সে শুধু তার সংযম, নিষ্ঠা, নির্লোভ দেখে। এই যে ধর্ম্মদাস তাকে সাহায্য করার জন্যে উন্মুখ—শুধু সে নেয় না ব'লেই তো। আর এত খাতিরও করে এই কারণে। সে গ্রামের জমিদার। অনেক বিষয়-সম্পত্তির মালিক। অনেকেই তার কৃপা পাবার জন্য লালায়িত। এমন অনেক লোক আছে, মায় বহু ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত যারা অনুগ্রহ লাভের আশায় প্রতিদিন একবার ক'রে তার বৈঠকখানায় হাজরে দিয়ে যায়। ধর্ম্মদাস বিনয়ী লোক। অখাতির কাকেও করে না। কিন্তু তাকে দেখলে যে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে সেটা তার প্রাণের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তির আবেগ। শুধু মাত্র লৌকিকতা বা ভদ্রতা নয়। আর এই সাহায্য নিলেই সেই আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি অন্তর্হিত হবে। থাকবে শুধু শিষ্টাচার ও সামাজিকতা।

অবশ্য সে যে সাধারণের কাছ থেকে শ্রদ্ধা ভক্তি পাবার জন্যে এই নীতি নিয়েছে তা' নয়, নিয়েছে দেবতার উপর বিশ্বাস স্থাপন করার জন্যে। তাঁর করুণা এবং কৃপা লাভের আশায়। নির্ভরতাকে গভীর ক'রে তুলবার জন্যে। তবে মাঝে মাঝে কতকগুলো পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যখন আর দেবতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর ক'রতে পারে না। বিবিধ ভাবনা চিন্তা এসে মনটাকে চঞ্চল ক'রে তোলে। তবে ফল কিছুই হয় না বা সমাধানও হয় না। আবার সেই দেবতার উপরই নির্ভর ক'রতে হয়। এ ক্ষেত্রেই তাই হবে। খোরাকির ধান বিক্রী ক'রে অন্নপ্রাশন ক্রিয়াটা হয় তো কোনমতে সমাধা হবে, তারপর ?—রামচাঁদ প্রেরিত মাসিক পণের টাকা ও রাম-কুমারের ক্রিয়া কর্ম্মের যৎসামান্য আয়ের উপর নির্ভর ক'রে থাকতে হবে।

অর্থাৎ সেই রঘুবীরের উপরই নির্ভর ক'রে থাকতে হবে। ভাবতে ভাবতে ক্ষুদিরাম বাড়ী এসে ঢোকে।

চন্দ্রমণি রান্নাঘরের দাওয়ায় ব'সে গদাধরকে স্তন দিচ্ছিল। স্বামীকে বিশ্রাম না ক'রে অসময়ে বেরিয়ে যেতে দেখে এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে আসতে ও চিন্তিত দেখে বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, এমন সময় কোথায় গেছিলে ?

চন্দ্রমণির কথায় ক্ষুদিরামের ভাবনায় ছেদ পড়ে। নিজের ঘরে না ঢুকে রান্নাঘরের দাওয়ার উপর উঠে আসে।

চন্দ্রমণি ব্যস্ত হয়ে পুত্রবধূর উদ্দেশ্যে বলে, বৌমা ! তোমার শ্বশুরকে বসার একটা আসন দিয়ে যাও তো।

পুত্রবধূ একখানা আসন এনে পেতে দিয়ে যায়।

ক্ষুদিরাম আসন গ্রহণ ক'রে ভাবনা-কাতর কণ্ঠে বলে, ধর্ম্মদাসের সঙ্গে একটু পরামর্শ ক'রতে আর রামচাঁদের চিঠিখানা ডাকবাক্সে ফেলে দেবার জন্যে বেরিয়েছিলাম।

চন্দ্রমণি আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করে, রামচাঁদকে আসতে লিখলে ?

ক্ষুদিরাম একই ভাবে বলে, তা তো লিখ্‌লাম, কিন্তু আসতে কি পারবে ?

চন্দ্রমণি হ্যাঁ না আর কিছু বলে না।

চন্দ্রমণিকে নীরব দেখে ক্ষুদিরাম আবার বলে, যা ভেবেছিলাম তা আর হ'ল না।

চন্দ্রমণি বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, কি হ'ল না ?

ক্ষুদিরাম বেশ একটু হতাশ ভাবেই বলে, নমো নমো ক'রে সারা।

চন্দ্রমণি কোন জবাব না দিয়ে কৌতূহল ভরে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

ক্ষুদিরাম একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চিন্তিত কণ্ঠে বলে, প্রায় সারাগ্রামই হবে।

ক্ষুদিরামের কথা শুনে চন্দ্রমণির মনটা খুশীতে ভ'রে ওঠে। আনন্দোৎফুল্ল কণ্ঠে বলে, আমার মনটাও তাই চাইছিলো। গদাইয়ের জন্যে আজকাল কত লোক আসে। জিজ্ঞাসা ক'রলে বলে, তোমার এই ছেলেটাকে কি ভাল যে লেগেছে দিদি, তা আর কি ব'লবো। সারা দিনের ভিতর একবার না দেখলে মনটা যেন ছট্‌ফট্ করে। তাদের না ব'ললে কি ভাল দেখায় ?

ক্ষুদিরাম বলে, ইচ্ছা তো আমারও হয়। কিন্তু সামর্থ্য কই ?

চন্দ্রমণি বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, তবে সারা গ্রাম ক'রছো কেন ?

ক্ষুদিরাম চন্দ্রমণির কোলে অবস্থিত পুত্র গদাধরের দিকে চেয়ে বলে, তোমার পুত্রের সেই রকম ইচ্ছা তাই হ'ল।

চন্দ্রমণি কথার অর্থ বুঝতে না পেরে স্বামীর মুখের দিকে বোকার মত চেয়ে থাকে।

ক্ষুদিরাম চন্দ্রমণির অর্থহীন দৃষ্টির দিকে চেয়ে বলে, ধর্ম্মদাসের বাড়ী গেলাম পরামর্শ ক'রতে। এক ঘর লোকের মধ্যে অন্নপ্রাশনের কথা ব'লতেই ঘর শুদ্ধ লোক ধ'রে ব'সলো তাদেরও খাওয়াতে হবে। আর কি করি, না ব'লতে পারলাম না। সঙ্গে সঙ্গে নিমন্ত্রণ ক'রে ফেললাম।

চন্দ্রমণি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে, ভালই ক'রেছ।

ক্ষুদিরাম সে কথার ঠিক জবাব না দিয়ে নিজের কথারই জের টেনে বলে, ধর্ম্মদাসের বাড়ীতে যাদের নিমন্ত্রণ ক'রে এলাম সকলের সঙ্গেই যে খুব একটা হৃদ্যতা আছে তাতো নেই। অতএব হৃদ্যতা যাদের সঙ্গে আছে তাদের আর এখন বাদ দেওয়া যাবে না।

চন্দ্রমণি খুব উৎসাহের সঙ্গে বলে, নিশ্চয়। আর বাদ দিলে ভাল দেখায় না।

ক্ষুদিরাম হতাশ ভরে বলে, তা দেখায় না। কিন্তু ক্রিয়া সমাধা ক'রতে খোরাকির ধান ক'টি সব যাবে। তখন তোমার পুত্রের মুখের দিকে চেয়ে ব'সে থাকতে হবে।

চন্দ্রমণি এ কথার কোন জবাব দেয় না।

ক্ষুদিরামও আর কথা না বাড়িয়ে উঠে পড়ে।

ক্রমে ক্রমে দিন এগিয়ে আসে। ইতিমধ্যে ধর্ম্মদাস একটা ফর্দ্দও ক'রে দিয়ে গেছে এবং নিমন্ত্রণও সব সারা হ'য়ে গেছে। কিন্তু যার উপরে ভরসা ক'রে এই আয়োজন সেটা আর হয় না। অর্থাৎ ধানটা সহসা বিক্রী হয় না। যদিও চাষীদের ঘরে এ সময়ে ধান থাকে না এবং তারাই সাধারণতঃ এই ক'টা মাস কিনে খায়, কিন্তু সে অল্প অল্প ক'রে। অর্থাৎ জনমজুরী ক'রে যা উপায় করে তাতে ধানও কেনে এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষও কেনে। অতএব তাদের পক্ষে এককালীন এত ধান কেনা সম্ভব নয়। আর যারা পারে তাদের নিজেদেরই গোলা ভর্‌তি। তার উপরে ক্ষুদিরাম ঠাকুরের খোরাকির ধান কিনতে ভরসা পায় না। যদি দেবতার কোপানলে পড়ে।

দিন যতই এগিয়ে আসে ক্ষুদিরামও ততই শুধু হতাশ হয় না শঙ্কিত হ'য়েও পড়ে। আর যেন রঘুবীরের উপর নির্ভর ক'রে থাকতে পারে না। আজ বাদে কাল মেয়ে জামাই আসবে, তার দুই ভাই সপরিবারে এসে প'ড়বে। আর তার পরের দিন বাড়ীতে কাজ। অথচ একমাত্র চাল ছাড়া আর কোন আয়োজনই সে ক'রে উঠ্‌তে পারে নি। যা দিয়ে ক'রবে সেটাই এখনও যোগাড় হয় নি, এবং হবে কিনা তা এখন অনিশ্চিতের উপর এসে দাঁড়িয়েছে। অথচ অন্ন আর বস্ত্র—এ দুটোই হ'চ্ছে মানুষের প্রধান সমস্যা। এর ক্রেতা সব সময়েই পাওয়া যায়। কিন্তু এমনই অদৃষ্ট—তার ক্ষেত্রেই হ'ল ব্যতিক্রম। দেবতার ভোগের ধান ব'লেই কেউ কিনতে সাহস পাচ্ছে না। পাইনরা আগে নিতে চেয়েছিল, কিন্তু পরে কি ভেবে একটা দোহাই পেড়ে এড়িয়ে গেল। অথচ এখন আর সময়ও নেই যে ভিন্ন

গ্রামের খরিদ্দার ঠিক করে। স্থির চিত্তের লোক সে, সহসা কোন কিছুতে বিচলিত বা চঞ্চল হওয়া তার স্বভাব বিরুদ্ধ। কিন্তু আর বিচলিত না হ'য়ে পারে না। একবার ভাবে ধর্ম্মদাসকে সব খুলে বলি, আবার ভাবে—না না, এত টাকা তার জীবিতকালে শোধ হবে না। এই ঋণের বোঝা নিয়েই মৃত্যু বরণ ক'রতে হবে। আর সে মৃত্যু হবে বেদনাদায়ক। শুধু তাই নয় রামকুমার, রামেশ্বরকে এই ঋণজালে জড়িয়ে যাওয়া হবে। ভাবতে ভাবতে মাথা গোলমাল হ'য়ে যায়। স্থির সিদ্ধান্তে আর পৌঁছাতে পারে না। উদ্বেগ আর দুর্ভাবনায় আরও একটা দিন চ'লে যায়। মাত্র একটা দিন বাকী।

ক্ষুদিরাম যথানিয়মে স্নান ইত্যাদি সেরে ফুল তুলে ঠাকুরঘরে এসে ঢোকে। পূজায় বসে বটে, কিন্তু অন্যান্য দিনের মত ধ্যানে মগ্ন হ'তে পারে না। জপতপের মাঝে মাঝে প্রাবৃট কালের মত দুর্ভাবনার ঘন কালো মেঘ মনের উপর দিয়ে ভেসে যায়, চিত্তের একাগ্রতা ধূলিসাৎ হ'য়ে আসে। আত্মসংযম ভেঙ্গে পড়ে। চোখে নামে শ্রাবণের ধারা। রুদ্ধ আবেগের সঙ্গে বলে, প্রভু! একি বিপদেই ফেললে। জীবনে যা করি নি, গদাইয়ের অন্নপ্রাশনে আমাকে কি তাই করতে হবে? চোখের জলে হৃদয় শান্ত হয়। পূজা সেরে বেরিয়ে আসে। ঠাকুরঘর থেকে বেরিয়েই দেখে—কাত্যায়নী এবং জামাতা এসে প'ড়েছে এবং উভয়ে চন্দ্রমণির কাছে বসে কথাবার্ত্তা কইছে।

পিতাকে ঠাকুরঘর থেকে বেরুতে দেখে কাত্যায়নী ও জামাতা উভয়ে এসে ভক্তিভরে প্রণাম করে।

ক্ষুদিরাম প্রশান্ত কণ্ঠে আশীর্ব্বাদ ক'রে কুশল জিজ্ঞাসা করে। তারপর চন্দ্রমণিকে মেয়ে জামাইকে জল খেতে দিবার নির্দ্দেশ দিয়ে নিজের ঘরে এসে ঢোকে। মনের প্রশান্ত ভাবটা রঙ্গমঞ্চের যবনিকার মত ধীরে ধীরে সরে যায়। আবার দুর্ভাবনাগুলো নট-নটীর মত মনোমঞ্চে এসে অভিনয় সুরু ক'রে দেয়।

মেয়ে জামাই এসে প'ড়েছে। এরপর আসবে তার দুই ভ্রাতা পরিবার সহ। তা আসুক, কিন্তু আয়োজন এখনও কিছুই হয় নি। জেলেদেরকে কিছু আগাম দিয়ে মাছের কথা ব'লে আসতে হবে। ময়রাকেও তাই। আর বিলম্ব করা উচিৎ নয়। কারণ এখন বায়না না ক'রলে কাল সময় মত পাওয়া যাবে না।

ক্ষুদিরাম আর ইতস্ততঃ না ক'রে বেরুবার জন্যে জামাকাপড় ছাড়ে।

এমন সময় ধর্ম্মদাস 'দাদা, দাদা' ব'লতে ব'লতে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করে।

ক্ষুদিরাম দুশ্চিন্তার রেখাগুলো মুছে ফেলে হাসি মুখে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে। আপ্যায়িত ক'রে বলে, এস, এস। তারপর নিজেই ঘরে ঢুকে একখানা মাদুর এনে দাওয়ার উপর বিছিয়ে দিয়ে বলে, বোস, বোস।

ধর্ম্মদাস উঠে এসে বসে। ক্ষুদিরামের দিকে চেয়ে বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, কোথাও বেরুচ্ছ নাকি ?

ক্ষুদিরাম একটু ইতস্ততঃ ক'রে বলে, হ্যাঁ, মানে এখনও তো দই মিষ্টি, মাছের কথা বলা হয় নি, আর বায়নাও দেওয়া হয় নি। তাই আর কি… কথাটা শেষ না ক'রেই থেমে যায়।

ধর্ম্মদাস চোখ দুটো বিস্ফারিত ক'রে বিস্মিত কণ্ঠে বলে, এখনও দাও নি! কাল তো কাজ!

ক্ষুদিরাম আর দুর্ভাবনাকে চেপে রাখতে পারে না। একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে আসে। কালো ছায়া এসে মুখের প্রশান্তিটা নষ্ট ক'রে দেয়। হতাশভরে বলে, বুঝতেই তো পারছ!

ক্ষুদিরামের কথা শুনে ধর্ম্মদাস কয়েক মুহূর্ত্ত কি যেন ভাবে। তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বলে, দাদা, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'রবো ?

ধর্ম্মদাসের কথা বলার ধরণ দেখে ক্ষুদিরাম বিস্মিত হয়। কৌতূহল নিয়ে জিজ্ঞাসা করে, বলো।

ধর্ম্মদাস আবেগের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা, দেবতা কি শূদ্রের পূজা নেন না ?

ধর্ম্মদাসের প্রশ্নে ক্ষুদিরাম চিন্তায় পড়ে। সে কি জানতে চায়, কি ব'লতে চায়, মনে মনে সেটা বিশ্লেষণ ক'রতে গিয়ে সহসা উত্তর দিতে পারে না।

ক্ষুদিরামকে নীরব দেখে ধর্ম্মদাস ঠিক তেমনি আবেগের সঙ্গে বলে, আমি যদি কোন দেবতার পূজায় কিছু দিই তা কি তিনি নেবেন না ?

ক্ষুদিরাম আর চুপ ক'রে থাকতে পারে না। প্রশান্ত কণ্ঠে বলে, কেন নেবেন না।

সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মদাস বলে, আমি কিছু নরদেবতার পূজায় দিতে চাইলে তুমি নিশ্চয় তা প্রত্যাখ্যান ক'রবে না ?

ক্ষুদিরাম ধর্ম্মদাসের কথার অর্থ বুঝতে না পেরে তার মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

ধর্ম্মদাস ক্ষুদিরামের জিজ্ঞাসু দৃষ্টির দিকে চেয়ে বলে, গদাধর তোমার পুত্র হ'তে পারে, কিন্তু আমার কাছে সে দেবতা। দেবতার অংশ মানেই দেবতা। এই জীবন্ত দেবতার কাল অন্নপ্রাশন, আমাকে তার পরমান্ন জোগাড় করবার একটু অধিকার দাও দাদা! আমার অর্থের এবং সম্পদের কিছু অংশ তার কাজে ব্যয় ক'রে জন্ম সার্থক করি। দান ক'রছি ব'লে প্রত্যাখ্যান ক'রো না। এ করছি দেবতার পূজায় নিবেদন। ব'লতে ব'লতে ধর্ম্মদাসের চক্ষু সজল হ'য়ে ওঠে। আবেগে বাক্‌রোধ হ'য়ে আসে।

ক্ষুদিরামের মনে হয় এ রঘুবীরের কৃপা! গদাধরের প্রয়োজন এমনি ক'রেই মিটবে।

ক্ষুদিরামকে নির্ব্বাক দেখে হতাশায় ধর্ম্মদাসের মুখখানা ম্লান হ'য়ে ওঠে। চোখ দিয়ে টপ টপ ক'রে জল ঝ'রে পড়ে। করুণ স্বরে মিনতি ক'রে বলে, এ সার্থক পূজা তো আর কোথাও হবে না দাদা! আমি দু'

চোখ ভ'রে দেখবো···দেবতা গ্রহণ ক'র্‌ছে। এতো আর কোন দেবতার পূজা দিলে দেখতে পাবো না।

ক্ষুদিরামের চক্ষুও সজল হ'য়ে আসে। আবেগের সঙ্গে বলে, বেশ বেশ, তোমার যা প্রাণ চায় তুমি তাই করো।

ক্ষুদিরামের কথায় ধর্ম্মদাসের মনটা আনন্দে ভ'রে ওঠে। চাদরের প্রান্তভাগ দিয়ে চোখের জল মুছে গভীর উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলে, তবে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো দাদা। আমি সব ব্যবস্থা ক'রছি। ব'লে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় ও ক্ষুদিরামের পায়ের ধূলো নিয়ে বেরিয়ে আসে।

●

পঁচিশ

গদাধরের অন্নপ্রাশন সাড়ম্বরেই হ'য়ে যায়। ধর্ম্মদাস দাঁড়িয়ে থেকে সমস্ত কাজ তদারক ক'রে সুশৃঙ্খলে শেষ করে। ক্ষুদিরামকে মোটে ভাবতেও হয় না বা কোনদিকে চাইতেও হয় না, এবং আরো আশ্চর্য্য হয়, যখন দেখে—নিমন্ত্রিতের সংখ্যা হিসাবের অঙ্ক ছাড়িয়ে যাচ্ছে অথচ অভাব কিছুরই হ'চ্ছে না। শুধু গ্রাম নয়, গ্রামান্তর থেকেও লোক এসে খেয়ে যাচ্ছে। দীনদরিদ্র ব্রাহ্মণ বাড়ীতে এই রাজসূয় যজ্ঞ দেখে ক্ষুদিরাম শুধু বিস্মিত হয় না, তার উপরে রঘুবীরের অপরিসীম করুণা দেখে শ্রদ্ধা ভক্তিতে অবনত হ'য়ে পড়ে। বারবার প্রণাম ক'রে মনে মনে বলে, প্রভু, তোমার অসীম করুণা! সেই সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মদাসের নিষ্ঠা, ত্যাগ ও উদারতা দেখে মুগ্ধ হয়।

এই গ্রামের ভিতর ধর্ম্মদাসের সঙ্গেই তার একটু বেশী ঘনিষ্ঠতা। অবসর পেলে ওখানেই যায়। গল্প-গুজবে কিছুটা সময় অতিবাহিত ক'রে

আসে। আপদে বিপদে পরামর্শ নেয়। প্রচুর ধনসম্পত্তির মালিক হ'য়েও নিরহঙ্কারী, অমায়িক ও মিষ্টভাষী। কিন্তু সঠিক মনের পরিচয় কোনদিন পায় নি বা পাবার চেষ্টাও করে নি। তবে যে যে গুণ থাকলে সমাজে জনপ্রিয় হওয়া যায় ধর্ম্মদাসের সেগুলো সবই আছে। তা' না হ'লে অন্ততঃ তার সঙ্গে মিলতো না। কিন্তু এই ক্রিয়ার পর সেটা বহু গুণে বৃদ্ধি হয়। ভালবাসার সঙ্গে শ্রদ্ধা এসে মেশে। যোগসূত্রের গ্রন্থিটা দৃঢ় হয়।

সেই সঙ্গে মনে পড়ে ফেলে-আসা পৈতৃক ভিটে দেরে গ্রাম এবং তার জমিদার রামানন্দ রায়ের কথা। সেও জমিদার এও জমিদার, কিন্তু চরিত্রে কি প্রভেদ! একজন প্রজাপীড়ক, দাম্ভিক, অহঙ্কারী, হৃদয়হীন। যার অত্যাচারে চিরকালের মত পৈতৃক বিষয়-সম্পত্তি পরিত্যাগ ক'রে আসতে হ'য়েছে। আর একজন প্রজাবৎসল, বিনয়ী, নিরহঙ্কারী। যে স্বেচ্ছায় অবনত মস্তকে সব কার্য্যভার তুলে নিয়েছে।

ক্ষুদিরাম মনে মনে সর্ব্বান্তঃকরণে ধর্ম্মদাসকে আশীর্ব্বাদ করে।

আর চন্দ্রমণি গদাইয়ের অন্নপ্রাশনের ক্রিয়াকলাপ দেখে শুধু অবাক হয় না, স্তম্ভিত হ'য়ে যায়। এত আয়োজন! এযে তার কল্পনাতীত! আর দুই পুত্রকন্যারও অন্নপ্রাশন হ'য়েছে। তখন তাদের অবস্থা ভালই ছিল। কিন্তু এত ঘটাও হয় নি বা এত লোকও খায় নি। লোকের যেন আর শেষ নেই! দেখে—গর্ব্বে ও আনন্দে বুকখানা ফুলে ওঠে। উৎসাহ, উদ্দীপনা শতগুণ বেড়ে যায়। এতটুকু ক্লান্তি বোধ করে না। ব্যস্ততার সঙ্গে এখানে ওখানে ঘুরে সব তদারক করে। মেয়েদের খাবার সময় পরিচিত অপরিচিত সকলকেই জিজ্ঞাসা করে, আর কিছু লাগবে কিনা। দু' খানা মাছ, দুটো মিষ্টি অথবা দই; পরমান্ন নেবার জন্যে বার বার অনুরোধ করে।

নিমন্ত্রিতারা কেউ পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে বলে, না দিদি! আর কিছু লাগবে না। তোমার ছেলের অন্নপ্রাশনে খুব খেলাম। এমনধারা অনেক-দিন খাই নি।

আবার কেউ বলে, না মাঠান্! আর কিছু লাগবে না। আপনার ছেলের কল্যাণে খুব খেলাম। আহা! আমাদের মত দুঃখী কাঙালের ব্যথা যেন আপনার ছেলে বোঝে। কাঙালের জন্যে চিরদিন যেন তার প্রাণটা কাঁদে।

তার কথার উত্তরে আর একজন নিমন্ত্রিতা সঙ্গে সঙ্গে বলে, তা কাঁদবে বাছা। ছেলে তো আর তোমাদের আমাদের ঘরের ছেলের মত নয়, এ যে স্বয়ং দেবতা। মানুষের দুঃখ দূর ক'রতেই তো জন্মেছে।

আর একজন বলে, তা' মাঠান্, আপনার গব্যেই এমন ছেলে জন্মাতে পারে। আমরা কোথাকার কে। কিন্তু আপনি দাঁড়িয়ে থেকে যে খাওয়া খাওয়ালেন—এমন ধারাটা কোথাও দেখি নি।

শুনতে শুনতে আনন্দে, পুত্রগর্ব্বে চন্দ্রমণির দুটো চোখ ছলছলিয়ে ওঠে। আবেগের সঙ্গে বলে, তোমাদের তৃপ্তিতেই আমার আনন্দ। আশীর্ব্বাদ করো—ছেলে যেন বেঁচে-বর্ত্তে থাকে।

সকলেই প্রায় সমস্বরে ব'লে ওঠে, ছেলে আপনার বেঁচে-বর্ত্তে থাক, রাজরাজেশ্বর হোক।

আর ধর্ম্মদাস আনন্দ পায় সার্থক অর্থব্যয় ক'রে। সঙ্গতিপন্ন লোক সে। বাড়ীতে ক্রিয়াকর্ম্ম লেগেই আছে। দোল, দুর্গোৎসব থেকে আরম্ভ ক'রে লক্ষ্মীপূজো, ষষ্ঠীপূজো, মাকালপূজো কিছুই আর বাদ যায় না। আর সব পূজো সাড়ম্বরেই হয়। দু'দশজন লোকও খায়। তা ছাড়া দোল, দুর্গোৎসবে যথেষ্ট ঘটা করে। ঠাকুর দেবতার উপর ভক্তিও তার অগাধ। দেবতার অস্তিত্ব বিশ্বাস করে। শত কাজের ফাঁকেও একটা নির্দ্দিষ্ট সময় জপতপ করে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোন দর্শনও হয় নি বা অনুভূতিও জাগে নি। থরে থরে দুর্গাপ্রতিমার সম্মুখে নৈবেদ্য সাজিয়ে দিয়েছে। আরতির সময় অবনত চিত্তে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছে, কিন্তু কিছুই দেখতে পায় নি। যে মৃন্ময়ীমূরতি সেই মৃন্ময়ীমূরতি। চিন্ময়ী রূপ কোনদিন দেখতে পায় নি। অবশ্য প্রাণে তার জন্যে খুব একটা ব্যথা বা আকুলতাও

বোধ করে নি। মনকে সান্ত্বনা দিয়েছে—সব কিছু সকলের জন্যে নয়। বহু জীবনের সাধনায় তবে এ সব দর্শন হয়। মৃন্ময়ীর চিন্ময়ী রূপ দেখা যায়।

তারপর যখন প্রসন্নর কাছে শুনলো ক্ষুদিরাম গৃহিণীর অলৌকিক অনুভূতির এবং গর্ভসঞ্চারের কথা—তখন ভৌতিক ব্যাপার ব'লে মনে ক'রে নিয়েছিল। কথাটাকে উপেক্ষাভরে উড়িয়েই দিয়েছিল। কিন্তু ক্ষুদিরামের কাছে যখন শুনলো—গয়ায় বিষ্ণুমন্দিরে পিণ্ডদানকালে দর্শন এবং অনুভূতির কথা। তখন তার সঙ্গে চন্দ্রমণির গর্ভসঞ্চারের কাহিনীটা মিলিয়ে দেখে স্তম্ভিত হ'য়ে গেল। আর ভৌতিক ব্যাপার ব'লে উড়িয়ে দিতে পারলো না এবং সেইদিন থেকে দেবতা দর্শনের আশা ক'রেছিলো। তারপর দেখা পেল নররূপী দেবতার। কিন্তু সাজিয়ে দিতে পারলো না পূজার ডালি, নৈবেদ্যের থালা।

শুনতে পায় নানা অভাব অভিযোগের কথা। প্রাণটা কিন্তু দেবার জন্যে আকুলি বিকুলি করে। কিন্তু সাহস পায় না ক্ষুদিরাম চাটুয্যেকে ব'লতে। অশূদ্রযাজী ব্রাহ্মণ সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাখ্যান ক'রবে। সেই সঙ্গে হয় তো লজ্জাও দেবে। ব'লবে, আমাকে প্রলোভন দেখিও না ধর্ম্মদাস। আমি যেদিন দেরে গ্রাম ছেড়েছি সেইদিন থেকে দারিদ্র্যকে চিরসাথী ক'রেছি। অর্থ আর পরমার্থ একসঙ্গে পাওয়া যায় না। অর্থ দিয়ে আমার পরমার্থ নষ্ট ক'র না বা আর কোনদিন চেষ্টাও ক'র না। গ্রহীতার অভাব নেই। তাদের দিতে পারো। সে তার ব্রত ও নিষ্ঠা নিয়ে চ'লে যাবে। কেন যে দিতে চাইছি সে চিন্তা বা বিচার একবারও ক'রবে না। হয় তো ভেবেও নেবে ধর্ম্মদাসের অর্থের অহঙ্কার হ'য়েছে। সে আমাকে সকলের সঙ্গে সমান স্তরে নামাতে চায়। কিন্তু কোনদিনও দেখবে না কেন আমার এই ব্যাকুলতা। অর্থের সদ্ব্যবহার সকলেই চায়। আর এ রকম সদ্ব্যবহার কোথায় হ'বে ? এ অর্থ লাগবে দেবতার সেবায়। আর সে দেবতা মাটির নয়, পাথরের নয়, রং তুলিতে আঁকাও নয়।

সাক্ষাৎ জীবন্ত, পঞ্চভূতের দেহ, রক্ত মাংসে গড়া। সেবা শুধু অনুভব ক'রে তৃপ্তি পেতে হবে না, দুই চোখ ভ'রে সে দেখবে—নরদেবতা তার পূজোপচার গ্রহণ ক'রছে। আর শেষ পর্য্যন্ত ক'রলেও তাই। জীবন ধন্য হ'য়েছে, দৃষ্টি সার্থক হ'য়েছে, এতকাল দোল দুর্গোৎসব ক'রে যা না তৃপ্তি পেয়েছে তার চেয়ে বহু গুণে তৃপ্তি পেয়েছে। সকাল থেকে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত প্রায় অভুক্ত থেকে সব কাজ তদারক ক'রেছে। এতটুকু ক্লান্তি বা কষ্ট বোধ করে নি। আনন্দে ও মাধুর্য্যে মন ভ'রে গেছে। মহাশূন্যের পথ তার উন্মুক্ত হ'য়েছে। তাই কাজের শেষে ক্ষুদিরামের কাছে বিদায় চেয়ে বলে, দাদা, এবার তা হ'লে আমি যেতে পারি ?

ক্ষুদিরাম কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে চেয়ে বিস্মিত কণ্ঠে বলে, সে কি ! না খেয়ে যাবে কি রকম !

ক্ষুদিরামের কথার মাঝখানে চন্দ্রমণিও এসে পড়ে। স্বামীর কথার জের টেনে বলে, সে কি ঠাকুরপো ! সারাদিন খাটা-খাটনি ক'রলে আর এখন না খেয়ে চ'লে যাবে ! এতে যে গেরস্তের অকল্যাণ হবে।

ধর্ম্মদাস হাসতে হাসতে বলে, ভগবান যাদের সন্তান তাদের আবার অকল্যাণ হবে ?

ধর্ম্মদাস থামতেই চন্দ্রমণি ব্যস্ত হ'য়ে বলে, তা কি হয় ? আমরা যে শান্তি পাবো না।

ধর্ম্মদাস তেমনি হাসিমুখে বলে, তা হ'লে একটা মিষ্টি আর এক গ্লাস জল এনে দাও। আজ আর কিছু খাবার ইচ্ছাও নেই, প্রবৃত্তিও নেই। কাল বরং চারটি প্রসাদ পেয়ে যাবো।

চন্দ্রমণি কিছু বলার আগেই ক্ষুদিরাম ধর্ম্মদাসের ক্লান্ত মুখের দিকে চেয়ে স্ত্রীকে বিরত ক'রে বলে, তবে থাক্, আর পীড়াপীড়ি ক'রো না। সারাদিন না খেয়ে ক্ষিদে মরে গেছে। তুমি বরং নেবু দিয়ে এক গ্লাস বাতাসার সরবৎ ক'রে এনে দাও। শরীরটা ঠাণ্ডা হবে।

চন্দ্রমণি আর দ্বিরুক্তি না ক'রে চ'লে যায়।

ধর্ম্মদাস ক্ষুদিরামের দিকে চেয়ে বলে, এবার আমার ছেলের একটা অন্নপ্রাশনের দিন দেখে দাও। সেও তো ছ'মাসের হ'ল। আর একটা নামকরণ···অনেক দিন হয় তোমাকে ব'লেছি···

ক্ষুদিরাম ধর্ম্মদাসের মুখ থেকে কথাটা কেড়ে নিয়ে বলে, হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমাকে ব'লতে আর মনে নেই; একটা নাম আমি ঠিক ক'রে রেখেছি।

ধর্ম্মদাস গভীর আগ্রহ ভরে জিজ্ঞাসা করে, কি নাম দাদা?

উত্তরে ক্ষুদিরাম বলে, গয়াবিষ্ণু।

নাম শুনে ধর্ম্মদাস খুব খুশী হয়। আনন্দে ও আবেগের সঙ্গে বলে, বাঃ! বেশ নাম রেখেছ! গদাধর আর গয়াবিষ্ণু চমৎকার নামের মিল হ'য়েছে।

ক্ষুদিরাম সঙ্গে সঙ্গে বলে, মনের মিলও চমৎকার হবে। বেঁচে থাকলে দেখতে পাবে।

এমন সময় চন্দ্রমণি এক গ্লাস সরবৎ ও মিষ্টি এনে দাঁড়ায়। তারপর কন্যা কাত্যায়নীর উদ্দেশ্যে বলে, কাতু! একখানা আসন দিয়ে যা তো মা!

ধর্ম্মদাস ব্যস্ত হ'য়ে বলে, আর আসন লাগবে না বৌদি। তুমি দাও, দাঁড়িয়েই খেয়ে যাচ্ছি। ব'লে চন্দ্রমণির দিকে হাতখানা বাড়িয়ে দেয়।

চন্দ্রমণি একটু ইতস্ততঃ ক'রে বলে, ব'সবে না?

ধর্ম্মদাস ব্যস্তভাবে বলে, না না, আর ব'সবো না। অনেক রাত হ'ল।

ক্ষুদিরাম এবার চন্দ্রমণিকে লক্ষ্য করে বলে, তবে দাও।

ইত্যবসরে কাত্যায়নী আসন আনে। মার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করে, কোথায় পেতে দেব মা?

চন্দ্রমণি মিষ্টির রেকাবী ও সরবৎএর গ্লাসটা ধর্ম্মদাসের হাতে দেয়। তারপর মেয়ের দিকে চেয়ে বলে, আর পাততে হবে না মা।

কাত্যায়নী দ্বিরুক্তি না ক'রে আসন নিয়ে চ'লে যায়।

ধর্ম্মদাসও মিষ্টি আর সরবৎ খেয়ে গ্লাস আর রেকাবীটা মাটিতে নামিয়ে

রাখে। তারপর ক্ষুদিরামের চরণ ছুঁয়ে প্রণাম ক'রে বিদায় নিয়ে চ'লে যায়। যাবার সময় এই মাসেই তার ছেলের অন্নপ্রাশনের একটা দিন দেখে দেবার জন্যে অনুরোধ ক'রে যায়।

ক্ষুদিরাম সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ ক'রে বলে, কালই দেখে দিচ্ছি।

উৎসব শেষে একে একে সকলেই চ'লে যায়। ভাবনা চিন্তা, উদ্বেগ, অশান্তিরও পরিসমাপ্তি ঘটে। আবার নিরুদ্বিগ্ন জীবন। এমনি ক'রে আর দুটি মাস চ'লে যায়। গদাধর অষ্টম মাসে এসে পড়ে। এখন বেশ হামা দিয়ে বেড়াতে পারে। হাতের কাছে যা পায় তাই মুখে পুরে আস্বাদ নেবার চেষ্টা করে। একটু অসতর্ক হ'লে বা কোন কিছু অসাবধানে রাখলে হামা দিয়ে গিয়ে ধরে। হয় তো দুধের বাটিটাকেই ফেলে দেয়।

চন্দ্রমণি দেখে কপালে করাঘাত করে বলে, ঐ যাঃ! সব দুধটুকু ফেলে দিলো। কি দস্যি ছেলে রে বাবা! একটুখানি এদিক ওদিক গেছি কি একেবারে অনাচ্ছিষ্টি কাণ্ড! একে নিয়ে কি করি বলো তো? ব'লে গভীর স্নেহে বুকে তুলে নেয়। চুমায় চুমায় গণ্ড রক্তিম ক'রে দিয়ে আবার বলে, গয়ার গদাধর এসেছে। আহা কি ছিরি! এখন কি খাবে? তারপর পুত্রবধূকে ডেকে বলে, বৌমা! আর একটু দুধ দিয়ে যাও। দস্যি ছেলে দুধটুকু সব ফেলে দিয়েছে। একে নিয়ে কি যে করি......

গদাধর মায়ের কোলে উঠে আদরটা বেশ উপভোগ করে। ভাসা-ভাসা ডাগর আঁখি মুখের উপর ফেলে মা-আ-আ-আ করে।

চন্দ্রমণি বিশ্বসংসার ভুলে যায়। স্নেহে আর ভালবাসায় হৃদয় উদ্বেলিত হ'য়ে ওঠে। পুত্র তার দেবতা—এ কথা ঘুণাক্ষরেও মনে আসে না। দেবতা হবে পাথরের, মাটির, নয় তো পটে আঁকা ছবি। কারো পাঁচ মাথা, কারো চার হাত, কারো তিনটে চোখ। আর সব দেবতারই একটা ক'রে বাহন আছে। কারো ষাঁড়, কারো ইঁদুর, কারো ময়ূর। কিন্তু তার পুত্র গদাধরের

এসব কিছুই নেই। না আছে চারটে হাত অথবা তিনটে চোখ, তুটো মাথা। এ আবার দেবতা ? সে তো সারা জীবন দেবতাদের পুজো ক'রে আসছে। কোন দেবতাকে সে এমন ক'রে কোলে ক'রতে পেরেছে ? কেউ পাথর, নয় কেউ মাটি। তাদের ছুঁতে ভয় করে। কি জানি যদি কোন অপরাধ হয়। কত শুদ্ধাচারে, কত সন্তর্পণে ছুঁতে হয়। তবু সংশয় ও সন্দেহ যায় না। বার বার ব'লতে হয়—অপরাধ নিও না ঠাকুর। তার গদাধর ঠাকুর হ'লে তো এমন ক'রে কোলে নিতে পারতো না, চুমো খেতে পারতো না। এমন আধো আধো স্বরে মা-আ-আ-আ ক'রে ডাকতো না।

চন্দ্রমণি তার গদাইয়ের চারটে হাত আর তুটো মাথা কল্পনা ক'রে শিউরে ওঠে। না না, তার ঠাকুর হ'য়ে কাজ নেই। সে মানুষই থাক। কোল আলো ক'রে থাক। যার যা খুশী সে তাই ভাবুক।

পুত্রবধূ তুধ দিয়ে যায়। চন্দ্রমণি সব ভবনা রেখে গদাইকে তুধ খাওয়ায়। বেলা বেড়ে যাচ্ছে। সব কাজ প'ড়ে আছে। এখনও পূজোর গোছ হয় নি। অথচ ছেলেকে ঘুম না পাড়ালে কাজ করা অসম্ভব। হামা দিয়ে সারা ঘরময় ঘুরে বেড়াবে। ধূলো কাদা মেখে, এটা-ওটা ফেলে, যা' তা' মুখে পূরে একটা অনাচ্ছিষ্টি কাণ্ড ক'রে ব'সবে। তাই তুধ খাইয়েই কোল তুলিয়ে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করে।

আর গদাধরের পেটটী ভ'রে যাওয়ায় এবং শেষ রাত্রে শয্যাত্যাগ করায় অল্পায়াসেই ঘুমিয়ে পড়ে।

চন্দ্রমণি আর সময় নষ্ট না ক'রে গদাইকে এনে বিছানায় শুইয়ে দেয়। কয়েকবার কানটা চাপড়ায়। ঘুমন্ত মুখের দিকে স্নেহ-করুণ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে। তারপর মশারীটা ফেলে দিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে। বেলার দিকে চেয়ে চঞ্চল হ'য়ে ওঠে। ব্যস্ত হ'য়ে কাপড় ছেড়ে ঠাকুরঘরে এসে ঢোকে।

একটু পরে ক্ষুদিরাম সাজি ভরা ফুল নিয়ে ঠাকুরঘরে আসে।

চন্দ্রমণিকে তখনো ঠাকুর ঘরে এবং পূজোর আয়োজন সারা হ'তে না দেখে বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, কি, আজ এত বেলা ক'রলে যে ?

চন্দ্রমণি চন্দন ঘ'ষতে ঘ'ষতে স্বামীর দিকে চেয়ে বলে, গদায়ের জ্বালায় কি নিশ্চিন্তে কিছু করার যো আছে। এত ছুরন্ত হ'য়েছে·····এক বাটি দুধ ফেলে দিয়েছে। তাকে খাইয়ে, ঘুম পাড়িয়ে, তবে এসে পূজোর গোছ ক'রতে ব'সেছি।

ক্ষুদিরাম আর কিছু না ব'লে পূজাসনে বসে। এটা ওটা স্বহস্তে গুছিয়ে নিতে থাকে।

চন্দ্রমণি ঠাকুরঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসে দেখে—বেলা ঢের হ'য়েছে। রোদ খাঁ খাঁ ক'রছে। অনেকক্ষণ হয় গদাধরকে শুইয়ে দিয়ে এসেছে। ছেলেটা ঘুমচ্ছে না উঠে প'ড়েছে, দেখবার জন্যে ঘরে এসে ঢোকে। শয্যার দিকে চেয়ে দেখে গদাধর নেই। তার জায়গায় এক দীর্ঘাকৃতি দিব্যকান্তি পুরুষ শুয়ে আছে। ভয়ে আর্ত্তনাদ ক'রে ব'লে ওঠে, আমার গদাই, গদাই কোথায় গেল! হাউ হাউ ক'রে কাঁদতে কাঁদতে ঘর ছেড়ে ছুটে বেরিয়ে আসে। সর্ব্বশরীর ভয়ে ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপতে থাকে।

চন্দ্রমণির আর্ত্তনাদে ক্ষুদিরামের ধ্যান ভেঙ্গে যায়। ব্যস্ত হ'য়ে ঘর ছেরে বেরিয়ে আসে।

পুত্রবধূও শঙ্কা এবং কৌতূহল নিয়ে রান্নাঘর ছেড়ে আসে।

ক্ষুদিরাম বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, কি হ'ল ?

চন্দ্রমণির শরীরের কাঁপুনি তখনও যায় নি। তাই সহসা জবাব দিতে পারে না। হাউ হাউ ক'রে শুধু কাঁদে।

ক্ষুদিরাম ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে। ব্যগ্রকণ্ঠে আবার জিজ্ঞাসা করে, কি হ'ল ?

চন্দ্রমণি অনেক কষ্টে আত্মসম্বরণ ক'রে ক্রন্দন-বিজড়িত কণ্ঠে বলে, গদাই নেই, তার জায়গায় কে একজন শুয়ে আছে।

চন্দ্রমণির কথা শুনে বিস্ময়ে, উৎকণ্ঠায় ক্ষুদিরামের চোখ দুটো বিস্ফারিত হ'য়ে ওঠে। বিস্মিত কণ্ঠে বলে, সে কি!

চন্দ্রমণি একই ভাবে বলে, হ্যাঁ, দেখবে চলো। ব'লে ঘরের দিকে এগুতে থাকে।

ক্ষুদিরামও কৌতূহল নিয়ে শঙ্কিত মনে চন্দ্রমণিকে অনুসরণ করে।

ঘরে ঢুকে চন্দ্রমণি এবং ক্ষুদিরাম দেখে—কেউ কোথাও নেই। গদাইকে যেমন শুইয়ে রেখে এসেছিল তেমনি শুয়ে অকাতরে ঘুমোচ্ছে। চন্দ্রমণি বিস্মিত হয়।

ক্ষুদিরামেরও সব কৌতূহল এবং শঙ্কা মিলিয়ে যায়। উপেক্ষাভরে বলে, কই?

চন্দ্রমণি কেমন যেন বিভ্রান্ত এবং অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়ে। কি যে জবাব দেবে ভেবে পায় না। অথচ সে স্পষ্ট দেখেছে···গদাধরের পরিবর্ত্তে একজন অপরিচিত দীর্ঘকায় পুরুষ শুয়ে আছে। নিজের চক্ষুকে কি ক'রে অবিশ্বাস করে? তাই আমৃতা-আমৃতা ক'রে বলে, আমি যে স্পষ্ট দেখলাম······বোধ হয় কোন ভূতপ্রেত হবে। তুমি একটা রোজা-টোজা···

ক্ষুদিরাম চন্দ্রমণিকে কথাটা শেষ করার অবকাশ না দিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বলে, তোমাকে না আগেই ব'লেছি—রঘুবীর যার গৃহদেবতা তার বাড়ীতে ভূতপ্রেত আসতে পারে না।

চন্দ্রমণি গভীর স্নেহে গদাধরকে বুকে তুলে নিয়ে বলে, তবে আমি কি ভুল দেখলাম?

ক্ষুদিরাম ভাবগম্ভীর কণ্ঠে বলে, না, তাও দেখো নি। বেঁচে থাকলে এ রকম আরো অনেক কিছু দেখতে পাবে। চন্দ্রমণিকে আর কথা বলার অবকাশ না দিয়ে আবার পূজার ঘরের দিকে এগিয়ে যায়। আর চন্দ্রমণি গদাধরকে কোলে নিয়ে চিন্তিত মনে রান্নাঘরে গিয়ে ঢোকে।

●

ছাব্বিশ

আবার একটা ফাল্গুন আসে এবং চ'লেও যায়। এমনি ক'রে একে একে ক্ষুদিরামের জীবন থেকে চারটে ফাল্গুন চ'লে যায়। দিয়ে যায় জ্বরা আর বার্দ্ধক্য। মন থেকে কেড়ে নিয়ে যায় আশা ও উদ্দীপনা। সেই সঙ্গে ভবিষ্যতের স্বপ্ন। তা যাক্…জীবনের খেয়াতরী সেও প্রায় ঘাটে ভিড়িয়ে এনেছে, কিন্তু মনটাকে তার জন্যে ঠিক্ যেন প্রস্তুত ক'রতে পারে না। গদাধর কিছুতেই তাকে নিরাসক্ত হ'তে দেয় না। আধো আধো স্বরে বাবা ব'লে যখন কোলে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে তখন ভুলে যায় আয়ুঃসূর্য্য পশ্চিমে হেলে প'ড়েছে। জীবন-আকাশে সন্ধ্যার সূচনা। নিবিড় স্নেহে পুত্রকে বুকে জড়িয়ে ধরে। আবার স্বপ্ন রচনা করে। অবসাদ আর ক্লান্তি মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দেয়। ভাবে…কি ক'রে এদের শান্তিতে রাখা যায়! তার উপরে চন্দ্রমণি আবার পুত্রসম্ভবা। সংসার কিছুতেই আর তাকে অনাসক্ত হ'তে দেয় না। তবে আবার চার বছর পরে এবং যাবার বেলায় এই পুত্র-সম্ভাবনায় ক্ষুদিরাম আনন্দ তো পায় না বরং ব্যথিত ও লজ্জিত হয়। কেন জানে না, তার মনে হয় দিন ঘনিয়ে এসেছে। আর এই কাচ্চা বাচ্চা-গুলোকে ঠিকমত মানুষ ক'রতে হবে। লেখাপড়া শেখাতে হবে। তারপর বে' থা আছে। এবং তার অবর্ত্তমানে এই সব ভার বোঝা বহন ক'রতে হবে রামকুমার, রামেশ্বরকে। তারা অবশ্য ক'রবে সে বিশ্বাস আছে, কিন্তু এই জন্যে হয় তো মনে মনে তার বিরুদ্ধে একটা অসন্তোষ ও অভিযোগ বহন ক'রবে। ব'লবে, বাবা শেষকালে দুটো অপগণ্ডকে আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে গেল। কিন্তু প্রকৃতির দান তো ফেরানো যায় না। তাই পরলোকের চিন্তা ছেড়ে দিয়ে আপাততঃ ইহলোকের চিন্তায় ব্যস্ত

হ'য়ে পড়ে। আবার ঢেঁকি ঘরের ঢেঁকি সরিয়ে চন্দ্রমণির জন্যে প্রসূতি আগার করে।

চন্দ্রমণিও সূতিকাগারে প্রবেশ করে। আর ধনী আসে সহায়তা ক'রতে।

চন্দ্রমণি আঁতুড় ঘরে ঢোকাতে গদাধর হয় নিঃসঙ্গ। আগের মত আর মাকে কাছে পায় না। প্রথম প্রথম বেশ একটা অভিমান হয়। মুখ ভার ক'রে উদাস মনে ফেরে। বুঝতে পারে না, মা তাকে ছেড়ে কেন ঐ ঢেঁকির ঘরে গিয়ে ঢুকলো। তা'র উপরে ঐ ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেই মা আর ধাই মা সঙ্গে সঙ্গে ব'লে ওঠে, হাঁ হাঁ—আসিস নে গদাই! আসিস নে! এখন এখানে আসতে নেই!

অভিমানে গদাইয়ের দুই চোখ জল ভ'রে আসে। আর একটী কথাও না ব'লে ছল্ ছল্ চোখে ঘুরে আসে। ভাবে—তার মা কেন এমন নিষ্ঠুর হ'ল? যে এক মুহূর্ত্ত না দেখলে গদাই গদাই ক'রে চীৎকারে পাড়া মাতিয়ে তুলতো, সে একবার ভুলেও ডাকে না—গদাই একবার আমার কাছে আয় বাবা। সেই সঙ্গে ধাইমাও ঐ রকম হ'ল। যেদিন রাত্রে পাঁচ সাতবার তাকে দেখবার জন্যে, কোলে নেবার জন্যে ছুটে ছুটে আস্‌তো, কত কি খাবার আনতো—হয় নারকেল নাড়ু, নয় ক্ষীরের নাড়ু, নয় চারটি মুড়ি, মুড়কি, সেও কাল থেকে বিরূপ হ'য়েছে। ও সব তো কিছু আনেই না, এমন কি কোলে পর্য্যন্ত নেয় না। মা তো ঐ ঘরে ঢুকে আর বেরুচ্ছেই না। ধাইমা তবু ঘর বার করে। আর সে যখন ধাইমার কোলে উঠবার জন্যে ধ'রতে ছুটে যায়—সেই ধাইমা সভয়ে পিছিয়ে গিয়ে অদ্ভুত মুখভঙ্গী ক'রে দু'খানা হাত নাড়তে নাড়তে বলে হ্যাঁ হ্যাঁ, আমাকে ছুঁস্‌নে গদাই! আমাকে ছুঁস্‌নে!

সেও থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। আনন্দ আর উচ্ছ্বাস মিলিয়ে যায়। ব্যথায়, অভিমানে, চোখের কোলে জল এসে টলমল্ করে। বুঝতে পারে না কেন এই বাধা-নিষেধ, কি সে অপরাধ ক'রেছে?

গদাইয়ের মুখখানা ভার হ'য়ে যেতে দেখে ও চোখে জল দেখে ধনীও ব্যথিত হয়। সান্ত্বনা দিয়ে বলে, এখন আমাকে ছুঁতে নেই বাবা, ছুঁলে দোষ হয়।

অভিমানে গদাইয়ের আর কথা ব'লতে ইচ্ছা করে না। তাই জলভরা চোখে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়ায়। কিন্তু মনে মনে খুঁজে ফেরে, কি সে অন্যায় ক'রেছে ? কিন্তু কিছুই মনে ক'রতে পারে না। অভিমান আর আঁখি-জল নিয়ে আসে পিতার ঘরে।

আঁচির সম্ভাবনায় ক্ষুদিরাম ইতিপূর্ব্বেই গৃহদেবতার পূজার ভার অন্য লোকের উপর দিয়েছে এবং সে যথানিয়মে পূজো ক'রে চ'লেও গেছে। কিন্তু ক্ষুদিরামের সময় যেন যেতে চায় না। তার উপরে প্রসবকালে যদি কিছু হয়। বিপদের কথা বলা তো যায় না। তুর্ভাবনা, তুশ্চিন্তা এসে মনটাকে সব সময় শঙ্কিত ও উদ্বিগ্ন ক'রে তোলে। সেই কারণে এবং কোন কাজ না থাকায় গীতায় মনোনিবেশ করে। বর্ত্তমান ভুলে চ'লে যায় অতীতের কুরুক্ষেত্রে। আবেগের সঙ্গে পড়ে—

"যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানম ধর্ম্মস্য তদাত্মানং স্থজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশয়ম্ তুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

হঠাৎ পদশব্দে তন্ময়তা টুটে যায়। গীতা থেকে দৃষ্টি তুলে দরজার দিক ফেলে। দেখে তার গদাধর এসেছে। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে। কিন্তু তুই চোখে জল, গণ্ড বেয়ে ঝ'রে প'ড়ছে।

গদাধরের চোখের জলে ক্ষুদিরামের হৃদয়টা উদ্বেলিত হ'য়ে ওঠে। ব্যগ্রভাবে সম্মুখের দিকে হাত তু'খানা বাড়িয়ে দিয়ে গভীর দরদের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে, কি হ'য়েছে বাবা ?

পিতার স্নেহকরুণ কণ্ঠস্বরে গদাধরের বুকের ভিতরটা গুমরে ওঠে। ঠোঁট তুটো থর থর ক'রে কাঁপে। কণ্ঠ রোধ হ'য়ে আসে। ক্রন্দন আর

রোধ ক'রে রাখতে পারে না। ছুটে গিয়ে পিতার বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারপর কোলের ভিতর মুখখানাকে ঢুকিয়ে দিয়ে ফুঁপিয়ে ওঠে।

ক্ষুদিরাম নিবিড় স্নেহে পুত্রকে বুকে বেঁধে নেয়, স্নেহকমোল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, কি হ'য়েছে বাবা ?

গদাধরের অভিমান তখন কান্নায় ভেঙ্গে প'ড়েছে। হৃদয় অশান্ত। তাই সহসা কথা ব'লতে পারে না।

ক্ষুদিরাম আর কোন কথা না ব'লে গভীর স্নেহে পুত্রের মাথায় পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে ভাবে—সত্যই কি এ গয়ার গদাধর ? ধর্ম্মস্থাপনের জন্য সে যুগে যুগে পৃথিবীতে এসেছে ? না—না, এ রক্ত মাংসের মানুষ। সব দোষ ও গুণ নিয়ে এসেছে। সেই মানবিক মান অভিমান, রাগ দ্বেষ ক্ষুধা তৃষ্ণা...এ দেবতা নয়। আর হ'য়ে দরকারও নেই। স্নেহ ভালবাসার কাঙাল হ'য়ে থাক। এমনি ক'রে অভিমান নিয়ে বুকের উপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ুক। স্থূল অনুভূতির চরম আনন্দ হ'য়ে বিরাজ করুক। আদরে আর আব্দারে অতিষ্ঠ ক'রে তুলুক। অপত্য স্নেহে ভাসিয়ে নিয়ে যাক। ভুলিয়ে দিক তার ইহকাল পরকাল। স্বর্গ আর নরক। জীবনের শেষ কটা দিন অপত্য স্নেহের জোয়ারে ভেসে যাক জীবন-তরী। ভিড়ুক গিয়ে অন্ধকার পারাবারে।

পিতার সস্নেহ পরশে গদাধরের হৃদয় ক্রমে ক্রমে শান্ত হ'য়ে আসে। তবে একেবারে হয় না। তাই ক্রন্দন-বিজড়িত কণ্ঠে টেনে টেনে বলে, ধাইমা আ—মা—লে...

ক্ষুদিরাম গদাধরের মুখ থেকে কথাটা কেড়ে নিয়ে বলে, বকেছে ? আচ্ছা আমি তাকে ব'কে দিচ্ছি। ব'লেই হাঁক পাড়ে, ধনী !

সঙ্গে সঙ্গে ধনী সাড়া দেয়। জিজ্ঞাসা করে, কি দাদা ?

ক্ষুদিরাম কিছুমাত্র ব্যস্ত না হ'য়ে ক্রোধের ভাণ ক'রে জিজ্ঞাসা করে, তুই কেন আমার গদাধরকে ব'কেছিস ? হুঁ—বড় বাড় হ'য়েছে, না...

প্রত্যুত্তরে ধনী খিল্ খিল্ ক'রে হেসে ওঠে।

ক্ষুদিরাম ধনীর প্রতি আর মনোনিবেশ না ক'রে গদাধরের মাথায় সমান ভাবে হাত বুলাতে বুলাতে বলে, তুমি কেঁদো না বাবা, ওকে আমি আরো ব'কে দেবো।

পিতার কথায় গদাধর শান্ত হয়। কোল থেকে মুখটা তুলে নিয়ে উঠে বসে। মুখের উপরে অশ্রু সজল আঁখি তুলে কৌতূহল ভরে আধো আধো কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, বাবা! মা কেন ও ঘলে গাথে ?

ক্ষুদিরাম একটু ইতস্ততঃ করে। তারপর সস্নেহে বলে, তোমার যে একটা ছোট ভাই হবে। তাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করার অবকাশ না দিয়ে বলে, আচ্ছা গদাই! বলো তো বাবা কৃষ্ণের শতনাম ?

গদাধর সব অভিমান ভুলে যায়। বাবার কোলের উপর স্থির হ'য়ে বসে। কচি কচি দু'খানা হাত কপালে ঠেকিয়ে আনন্দে ও আবেগের সঙ্গে আধো আধো কণ্ঠে সুর ক'রে বলে,—

ছিনন্দ রাথিল নাম নন্দের নন্দন।
যছোদা রাথিল নাম যাজু বাছাধন॥
উপানন্দ নাম রাথে থুন্দর দোপাল।
ব্রজ বালক নাম রাথে ঠাকুর রাখাল॥

শুনতে শুনতে ক্ষুদিরাম তন্ময় হ'য়ে যায়। সেই সঙ্গে বিস্মিত হয় শিশুর অদ্ভুত স্মরণশক্তি দেখে। একদিন একবার মাত্র তাকে দিয়ে আবৃত্তি ক'রিয়েছিল। তারপর আর সে ভোলে নি। ছেলের মেধা দেখে ভাবে···দৈব সহায় না থাকলে এমন শ্রুতিধর হওয়া সম্ভব নয়। তবে কি সত্যই······

গদধার নাম শেষ ক'রে তন্ময় হ'য়ে চুপ ক'রে থাকে।

ক্ষুদিরামেরও ভাবনায় ছেদ পড়ে। পুত্রের মুখের দিকে চেয়ে বলে, আচ্ছা, এবার ব'লোতো বাবা—একে চন্দ্র······

পিতার কথায় গদাধরের আনন্দ আর আবেগ মিলিয়ে যায়। মুখখানা

ভার হ'য়ে ওঠে। গভীর অনিচ্ছা সত্বে বলে, একে চন্দ্র, দুয়ে পক্ষ, তিনে নেত্র……

ধারাপাতে গদাধরের উচ্ছ্বাস আর আবেগের অভাব ক্ষুদিরামের দৃষ্টি এড়ায় না। ভাবে, অঙ্কশাস্ত্রের উপর গদাধরের কেন এমন বিরূপ ভাব ? অন্যান্য বিষয়ে যতখানি আগ্রহ বা উৎসাহ দেখা যায় ধারাপাতের বেলায় ঠিক তার বিপরীত। অথচ সাংসারিক জীবনে এটা অত্যাবশ্যক। হিসাব-নিকাশ ক'রতে না শিখলে বা না জানলে পদে পদে ঠকবার সম্ভাবনা। তা ছাড়া অঙ্কশাস্ত্রে অজ্ঞ থাকা মানে কূটবুদ্ধির অভাব অনুমিত হয়। সাংসারিক জীবনের জন্য সব বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং প্রস্তুত হ'য়ে থাকা দরকার। তাহ'লে জীবনে অপরের দ্বারা বঞ্চিত হবার সম্ভাবনা খুব কম থাকে। আর এ বিষয়ে পারদর্শী লোককে মানুষে ভক্তি করুক না করুক, ভয় করে। তবে এ বিষয়টার মধ্যে অনুরক্ত হবার মত কোন রস-কস নেই সত্য। আর হয়তো সেই কারণেই গণিতশাস্ত্রের উপরে গদাধরের এই বিতৃষ্ণা। অবশ্য এখন শিশু। কার কি কার্য্যকারিতা জানে না বা এখন থেকে জানানোও উচিৎ হবে না। শিশুমনের উপরে একটা ভার বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হবে, মনের সহজ সরল অভিব্যক্তিকে ব্যাহত করা হবে।

ভাবতে ভাবতে গদাধরের এক থেকে একশো পর্য্যন্ত গণনা শেষ হয়। পাছে পিতা এ জাতীয় আবার তাকে কিছু ব'লতে বলে তাই গণনা শেষ ক'রেই জিজ্ঞাসা করে, বাবা ! আজ তুমি পূজো ক'রবে না ?

ক্ষুদিরাম পুত্রের মুখের দিকে চেয়ে সস্নেহে উত্তর দেয়, না বাবা ! এখন আমাদের পূজো ক'রতে নেই।

হঠাৎ গদাধর প্রশ্ন ক'রে বসে, আচ্ছা বাবা ! পূজো ক'রলে কি হয় ?

ক্ষুদিরাম সহসা জবাব দিতে পারে না। অদ্ভুত প্রশ্ন। জীবনের এতখানি বয়সের মধ্যে এই ধরণের প্রশ্ন আজ পর্য্যন্ত কেউ করে নি। এমন কি রামকুমার, রামেশ্বরও নয়। তারাও একদিন শিশু ছিল। এই রকম কোলে

বসিয়ে তাদেরও অনেক কিছু শিখিয়েছে। তারাও শিশুমনের সমস্ত কৌতূহল তাকে দিয়েই নিবৃত্তি ক'রিয়ে নিয়েছে। কিন্তু কোনদিন জিজ্ঞাসা করে নি পূজো ক'রলে কি হয়? এ প্রশ্নের কি জবাব সে দেবে? বিশেষতঃ এই চার বছরের শিশুকে! জীবনের অর্থ যার কাছে অস্পষ্ট, সত্যি-কারের সুখ, দুঃখ, আনন্দ, বেদনা যার ধারণাতীত—তাকে কেমন ক'রে বোঝাবে পূজো ক'রলে কি হয়। তবু প্রশ্ন যখন ক'রেছে তখন একটা জবাব দিতেই হবে। তবে কেমন ক'রে ব'ললে ঐ অপরিপক্ক মন গ্রহণ ক'রতে পারে সেই কথাটা ভাবতে ভাবতে ক্ষুদিরামের বেশ কিছুক্ষণ সময় চ'লে যায়।

পিতাকে নীরব দেখে গদাধরের কৌতূহল অত্যুগ্র হ'য়ে ওঠে। সে জ্ঞান হবার পর থেকে পিতাকে ঠাকুরঘরে গিয়ে পূজোয় ব'সতে দেখেছে, আর তা অনেকক্ষণ ধ'রে। এক এক দিন বেলা দুপুর গড়িয়ে যায়। যেন হুঁসই থাকে না। মা এসে ডাকলে তবে ওঠে। যে বাবা তাকে এত ভালবাসে, একটুখানি না দেখলে চঞ্চল হ'য়ে ওঠে। বার বার ডাকে—গদাই! গদাই! সেই বাবা পূজোয় ব'সলে যেন অন্য মানুষ হ'য়ে যায়। আর তার কথা মনে থাকে না। সে কতবার পূজোর ঘরের কাছে ঘুরে বেড়ায়, দরজা ধ'রে দাঁড়িয়ে থাকে। দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে নানা রকম শব্দ করে, বাবা কিন্তু ফিরেও তাকায় না বা ডাকেও না। মনে হয় যেন ঘুমিয়ে প'ড়েছে। সেই শব্দ শুনে মা রান্নাঘর থেকে ব্যস্ত হ'য়ে ছুটে আসে। হাত ধ'রে টেনে নিয়ে যায়। মৃদু ভর্ৎসনার সঙ্গে বলে, ছিঃ বাবা! পূজোর সময় অমন ক'রতে নেই। চলো, রান্নাঘরে চলো। সে নিরুপায় হ'য়ে মার সঙ্গে যায়। যেতে যেতে নানা প্রশ্ন করে। মা কিন্তু ঠিকমত জবাব দিতে পারে না। শুধু বলে, তুমি বড় হও, তখন সব জানতে পারবে। তার কিন্তু ধৈর্য্য শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছে। সে জানতে চায়—ঐ কটা পাথরের নুড়ো নুড়ির মধ্যে কি আছে? যাদের দিকে চেয়ে বাবা সব ভুলে যায়, ঘুমিয়ে পড়ে?

আজ কয়েকদিন থেকে এই কৌতূহলটা জেগেছে। কিন্তু বাবাকে কাছে পেয়ে আর মনে থাকে না। কথায় কথায় ভুলে যায়। আজ পূজো ক'রতে না দেখে মনে প'ড়েছে। কিন্তু পিতাকে নীরব দেখে গদাধর আবার জিজ্ঞাসা করে, পূজো ক'রলে কি হয় বাবা ?

ক্ষুদিরাম আর চুপ ক'রে থাকতে পারে না। এবার একটা কিছু ব'লতেই হবে। তাই বলে, এই ধরো, তোমার মা, তোমার ধাই মা ব'ক্‌লে তোমার দুঃখ হয়। তুমি কাঁদতে কাঁদতে আমার কাছে আসো। আমি তোমাকে শান্ত করি। আর আমার যখন দুঃখ হয় তখন রঘুবীরের কাছে যাই। রঘুবীর আমাকে শান্ত করেন, সব দুঃখ দূর ক'রে দেন।

গদাধর চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে তন্ময় হ'য়ে শোনে। বাবা চুপ ক'রতেই অগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করে, লঘুবীল বুঝি তখন তোমালে ঘুম পালিয়ে দেয় ?

ক্ষুদিরাম পুত্রের মুখের দিকে স্নেহভরা দৃষ্টিতে চেয়ে বলে, হ্যাঁ বাবা ! তুমি যখন ঘুমিয়ে পড়ো তখন কি তোমার ক্ষিদের কথা, দুঃখ কষ্টের কথা মনে থাকে ?

গদাধর জবাব দেয় না। বাবার মুখের দিকে চেয়ে ভাবে, সত্যিই তো, ঘুমিয়ে প'ড়লে আর কিছু মনে থাকে না, কিন্তু তাকে যেমন—মা, বাবা কত মিষ্টি কথা ব'লে চুমো খেয়ে, আদর ক'রে ঘুম পাড়ায়, তেমন ক'রে কি রঘুবীর বাবাকে ঘুম পাড়ায় ? কিন্তু রঘুবীর তো একটা পাথরের নুড়ি। ওর না আছে হাত, না আছে পা, না আছে চোখ—তার উপরে কথা ব'লতে পারে না। ও কেমন ক'রে বাবাকে ঘুম পাড়ায় ? ভেবে কিছুতেই আর মীমাংসা ক'রতে পারে না। তাই আবার কৌতূহল নিয়ে প্রশ্ন করে, আল্‌ছা বাবা ! লঘুবীল তো এত্‌তা পাথলেল নুলী। ওল চোখ নেই, মুখ নেই, হাত নেই, পা নেই, ও কি ক'লে তোমালে ঘুম পালায় ?

পুত্রের কৌতূহল দেখে ক্ষুদিরাম এতটুকু বিরক্ত বোধ করে না, বরং উৎফুল্ল হয়। শিশুমনে যদি দেবতার অস্তিত্ব এবং রূপ সম্বন্ধে একটা নিখুঁত ছবি এঁকে দিতে পারে, আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে পারে,

আর তা যদি বদ্ধমূল হ'য়ে হৃদয়ে গেঁথে যায়, তবে—তবে পাষাণ দেবতা একদিন হয়তো জীবন্ত হ'য়ে দেখা দেবে। নিশ্চয় দেবে। যেমন দিয়েছিল ধ্রুবকে, যেমন প্রহ্লাদকে। তাই প্রসন্ন কণ্ঠে নয়ন বিস্ফারিত ক'রে হাত নেড়ে বলে, সব আছে বাবা। একমনে ওঁর কথা ভাবলেই উনি সমুখে এসে দাঁড়ান। কত কথা বলেন, তারপর ঘুম পাড়িয়ে দেন।

গদাধর অবাক হ'য়ে শোনে। পিতা থামতেই আবার জিজ্ঞাসা করে, আমি যদি তোমাল মত তোখ বুঁজে ওল কথা ভাবি, উলি আমাল কাথে আথবেন ? কথা ব'লবেন ? ঘুম পালাবেন ?

সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদিরাম বলে, হ্যাঁ। তোমার সব দুঃখ কষ্ট দূর ক'রে দেবেন।

গদাধর কি যেন ভেবে খুব বিজ্ঞের মত জিজ্ঞাসা করে, ওলে তেমন দেথতে বাবা ?

ক্ষুদিরাম কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না ক'রে আবেগের সঙ্গে বলে, ঠিক তোমার মত। টানা টানা ডাগর চোখ, তবে নীল পদ্মের মত। মাথায় এক মাথা রেশমের মত কোঁকড়ানো চুল। তবে ঝুঁটি বাঁধা। গায়ের রং কচি দূর্ব্বা ঘাসের মত। হাত দুটো খুব লম্বা, জানু পর্য্যন্ত এসে পড়ে। আর সেই হাতে তীর ধনুক। খালি গা। পরণে লাল চেলী। তুমি ভাতের সময় যে রকম চেলী প'রে ভাত খেয়েছিলে—সেই রকম চেলী।

শুনতে শুনতে গদাধর তন্ময় হ'য়ে যায়। চোখের উপর মূর্ত্তিটা যেন ভেসে ওঠে।

ক্ষুদিরাম পুত্রের ভাব-বিহ্বল মুখের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে থাকে।

আর গদাধর পিতার বর্ণিত ছবিটি চোখের উপর ভাসিয়ে রেখে ভাবে··· কবে সে রঘুবীরকে দেখতে পাবে। তার কথা শুনতে পাবে······

এমন সময় পুত্রবধূ ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। শ্বশুরের দিকে একবার দৃষ্টিপাত ক'রে জিজ্ঞাসা করে, বাবা, ঠাই ক'রবো ?

ক্ষুদিরাম পুত্রবধূর দিকে চেয়ে নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলে, হ্যাঁ, কর গে।

পুত্রবধূ ঘুরে দাঁড়ায়।

ক্ষুদিরাম গদাধরের তন্ময়তা ভেঙ্গে দিয়ে বলে, চলো বাবা, খাই গে।

গদাধর বাবার কোল ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় ও পিতাকে অনুসরণ ক'রে রান্নাঘরে আসে।

সাতাশ

সকাল বেলা গদাধর ঘুম থেকে উঠেই শোনে শিশুর কান্নার শব্দ। আনন্দ আর বিস্ময় নিয়ে শয্যা থেকে লাফিয়ে পড়ে। অদম্য কৌতূহল নিয়ে ছুটে আসে আঁতুড় ঘরের দরজায়। উৎসুক নয়নে দেখে—ধাইমার কোলে এক নবজাত শিশু ট্যাঁ ট্যাঁ ক'রে কাঁদছে।

ধনী গদাধরের কৌতূহলী দৃষ্টির দিকে চেয়ে বলে, তোমার বোন হ'য়েছে। দাদা ব'লে তোমাকে ডাকবে।

ধনীর কথা শুনে গদাধরের বিস্ময়ের অবসান হয় বটে, কিন্তু শিশুকে ভাল ক'রে দেখার ও কোলে নেবার বাসনাটা প্রবল হ'য়ে ওঠে। ধাই মা কোন বাধা-নিষেধ না করায় ভাবে—আর বোধ হয় ঘরে ঢোকায় দোষ নেই। তাই ঘরের ভিতর পা ঢুকিয়ে দিয়ে বলে, আমাল তোলে একবাল দাও না থাই মা। ব'লে ভিতরের দিকে এগুতে থাকে।

গদাধরকে ঘরের ভিতর আসতে দেখে, ধনী ব্যস্ত হ'য়ে বলে, হাঁ হাঁ— আসিস নে গদাই, আসিস নে! আসতে নেই, আসতে নেই।

ধাইমার কথায় গদাধরের সব আনন্দ ও উৎসাহ ঝড়ো হাওয়ায় প্রদীপ

নেভার মত নিভে যায়। মুখখানা অন্ধকার হ'য়ে ওঠে। অভিমানে চক্ষু সজল হ'য়ে আসে। ব্যথিত মনে ঘুরে দাঁড়ায়।

গদাধরের ভাবান্তর ধনীর দৃষ্টি এড়ায় না। ছেলেটাকে বার বার ফেরাতে বা বাধা দিতে সেও ব্যথা পায়। কিন্তু উপায় তো নেই। একে ব্রাহ্মণ বাড়ী, তার উপরে আবার গোঁড়া। এই বৌদিই হয় তো ব'লবে, ধনী, তোর কি মাথা খারাপ হ'ল? কি ব'লে ঐ ছেলেকে আঁতুড় ঘরে ঢুকতে দিলি?

আর দাদা শুনলে আরো এক কাঠি উপরে যাবে। যাচ্ছেতাই ক'রে ব'লবে। অবশ্য অন্য কাউকে ব'লতে বা ফেরাতে তার কিছুমাত্র মায়া মমতা জাগে না, কিন্তু গদাধরকে ব্যথা দিতে তারই বেশ কষ্ট হয়। এ রকম ঠুন্‌কো মন তার আগে ছিল না। মেয়েদের যেমন কথায় কথায় চোখে জল আসে, তার তা' আসে না। কবে যে তার চোখ দিয়ে একদিন জল ঝ'রেছিলো আজ আর মনেও পড়ে না। প্রায় এক রকম ভুলেই গেছিলো যে, সে মেয়েছেলে। কারণ পুরুষের মত তাকে খেটে খেতে হয়। তার উপরে স্নেহ বা মায়ার কোন বাঁধন না থাকায় হৃদয় একেবারে কঠোর হ'য়ে গেছিল। কিন্তু গদাধর জন্মাবার পর থেকে···আর হয় তো তাকে কোলে-কাঁখে ক'রে মানুষ ক'রেছে বা ক'রছে ব'লে বোধহয় এত মায়া প'ড়ে গেছে। গদাধরকে কোলে নিয়ে বেশ একটা মাতৃত্বের মাধুর্য্য অনুভব করে। আগে অবশ্য তার মনে কোন সন্তান-তৃষা ছিল না। অপরের ছেলেমেয়ে দেখে আর তার ঝামেলা পোয়াতে দেখে একটা বিতৃষ্ণা ছিল। হয় নি বা নেই ব'লে কোন দুঃখ বা ক্ষোভ ছিল না। বরং ভাবতো ভগবান তাকে রক্ষা ক'রেছেন। একে নিজেরই দিন চলে না, তার উপরে আবার—কিন্তু গদাধরকে নাড়াচাড়া ক'রতে ক'রতে আজ মনে হয়—তার যদি একটা থাকতো তবে চলার পথে একটা আবেগ থাকতো। শত দুঃখ কষ্ট একবার মাত্র মাতৃ-সম্ভাষণে অবসান হ'ত। এই যে মাঝে মাঝে তার মনে উদাস এবং বৈরাগ্যের ভাব আসে শুধু কোন অবলম্বন নেই

ব'লেই বোধ হয়। ভাবে—যাক্‌গে, ক'রলেই হবে। নিজের জন্যে কে আর লেঠা করে। এই জন্যে অনেকদিন অনেক বেলা খাওয়াই হয় না। কিন্তু যদি একটা ছেলে থাকতো তবে তার জন্যেও অন্ততঃ রাঁধতে হ'তো। তা' ছাড়া একটা অবলম্বনও বটে। কিন্তু সে সম্ভাবনা অনেকদিন হ'ল শেষ হ'য়ে গেছে। তাই আজ নারী জীবনের চরম সার্থকতা, চিরন্তন মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা গদাধরকে অবলম্বন ক'রে পরিতৃপ্ত হ'তে চায়।

অবশ্য সে অনেকের আঁতুড়ই তুলেছে। যথেষ্ট ছেলে মেয়েকেও নাড়াচাড়া ক'রেছে, কিন্তু কারো উপর এমন মায়া মমতা পড়ে নি—যেমন প'ড়েছে গদাধরের উপর। ছেলেটা অদ্ভুত মায়াবী। ধাই মা ব'লে ডাকলে বুকের ভিতরটা যেন বীণার মত বেজে ওঠে। মনে নেশা লাগে। সেই সঙ্গে মনে হয়—যদি গদাইয়ের সত্যিকারের মা হ'তে পারতো! অন্ততঃ ঐ জাতীয় একটা নিকট সম্বন্ধ পাতাতে পারতো···কিন্তু সে কামারের মেয়ে। আর গদাইরা ব্রাহ্মণ। বাসনা আর অনুরাগে রাঙা পথ বেয়ে নিকটে যাবার উপায় নেই। সামাজিক অনুশাসন রক্ত চক্ষু নিয়ে পথ আগলে ব'সে আছে নানা বাধা নিষেধের বেড়া দিয়ে। তার উপরে ক্ষুদিরাম দাদা হ'চ্ছে গোঁড়া ব্রাহ্মণ। যে শূদ্রের কোন দ্রব্যই নেয় না সে দেবে আত্মীয়তা পাতাতে? ভাবলেই দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। আশা মরীচিকা হ'য়ে যায়। মনের কথা মনেই থাকে। তবু মাঝে মাঝে তার মুখের মা ডাক শোনবার জন্যে মনটা বড় আকুলি-বিকুলি করে। অনেক কষ্টে সে বাসনাকে দমন ক'রে নিয়ে ভগবানের উপর ছেড়ে দেয়।

তাই গদাধর ঘুরে দাঁড়াতেই ধনী সহানুভূতির সঙ্গে বলে, আঁতুড় তোমায় ছুঁতে নেই কিনা তাই। আঁতুড়টা উঠে যাক, তখন নিও।

গদাধর কোন জবাব না দিয়ে বিমর্ষ মনে পিতার ঘরে এসে ঢোকে।

ক্ষুদিরাম পুত্রের ভারাক্রান্ত মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করে, কি হ'য়েছে বাবা? মুখ ধুয়েছো?

গদাধর মুখে কোন কথা না ব'লে ঘাড় নেড়ে জানায়, ধোয় নি।

ক্ষুদিরাম ব্যস্ত হ'য়ে বলে, যাও যাও, মুখ ধোও গে, দাঁত মাজো গে। ব্রাহ্মণের ছেলে—সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে আগে মুখ ধুয়ে দাঁত মেজে, ঠাকুর প্রণাম ক'রে তবে অন্য কাজ ক'রতে হয়।

গদাধর কোন কথা না ব'লে পিতার নির্দ্দেশ পালন ক'রতে চ'লে যায়।

ক্ষুদিরামের ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তেই প্রাতঃকৃত্যাদি সারা হ'য়ে যায়। আজও তার ব্যতিক্রম হয় নি। তবে অন্যদিন ফুল তোলা থাকে। ঠাকুর পূজো থাকে। পূজোর যোগাড় হ'তে দেরী থাকলে সেই অবসরে দেবদেবীর জন্যে ব'সে ব'সে মালা গাঁথে। কিন্তু এখন আর ও সব কোন কাজ নেই। তাই গীতাখানা খুলে নিয়ে বসে। তারপর এক সময়ে ডুবে যায়।

গদাধর মুখ ধুয়ে, দাঁত মেজে পিতার আদেশমত ঠাকুরঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। গভীর ভক্তি ও আকুল আগ্রহ নিয়ে রঘুবীরের শিলা-মূর্ত্তিটির দিকে চায়। পিতার কথিত রূপটা মনে মনে চিন্তা করে। চোখের উপর ভেসেও ওঠে বালকবেশী রামচন্দ্রের সেই নবদূর্ব্বাদল শ্যামল মূর্ত্তি, কিন্তু রূপ পরিগ্রহ করে না। শিলা—শিলাই থাকে।

হঠাৎ তন্ময়তা ভেঙ্গে দিয়ে বৌদি ডাকে, গদাই! তোমার জলখাবার নিয়ে যাও। আমি ঘাটে যাবো।

বৌদির আহ্বানে গদাধরের তন্ময়তা ভেঙ্গে যায়। ঠাকুরঘরের দরজার উপরে মাথা নত ক'রে ভক্তিভরে প্রণাম ক'রে রান্নাঘরে এসে দাঁড়ায়।

বৌদি টেকই ক'রে চারটি মুড়ি আর একটু গুড় এনে গদাধরের হাতে দেয়।

গদাধর মহানন্দে টেকটা নেয়। একগাল মুড়ি মুখে ফেলে। চিবুতে চিবুতে আবার পিতার ঘরে এসে ঢোকে।

ক্ষুদিরাম তখন গীতার মধ্যে মগ্ন হ'য়ে গেছে। আবেগের সঙ্গে সুর ও ছন্দ ক'রে প'ড়ে চ'লেছে—

সর্ব্বধর্ম্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

পদশব্দে তন্ময়তা টুটে যায়। গীতা থেকে দৃষ্টি তুলে পুত্রের দিকে চায়। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মনে মনে বলে, সব কিছু পরিত্যাগ ক'রে তোমার শরণ আর নিতে দিলে কই প্রভু? মায়া দিয়ে—

গদাধর পিতার ভাবান্তর উপেক্ষা ক'রে সপ্রতিভ ভাবে এগিয়ে এসে কোলের উপর বসে। তারপর মুড়ি চিবুতে চিবুতে খুব খুশীর সঙ্গে বলে, বাবা, আমাল এত্‌তা বোন হ'য়েতে।

ক্ষুদিরাম অনিচ্ছা সত্বে গীতাখানা বন্ধ ক'রতে ক'রতে ভাব ও ভাবনায় সমাপ্তি দিয়ে বলে, হ্যাঁ বাবা।

গদাধর টেকে থেকে আর একগাল মুড়ি মুখে ফেলে উৎসুক ভরে জিজ্ঞাসা করে, ওল তি নাম বাবা?

ক্ষুদিরাম সহসা কোন জবাব দিতে পারে না। কারণ এ জাতকের কথা সে কোনদিনই ভাবে নি বা ভাবিয়েও সে আসে নি। তাই তার সম্বন্ধে উদাসীনই ছিল। কিন্তু পুত্রের কথায় হুঁস হয়। ভাবে···ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক যখন এসেছে তখন বেঁচে থাক, সুখে ও শান্তিতে থাক, আনন্দরূপিনী হ'য়ে সংসারে বিরাজ করুক। সকলের মঙ্গল হোক।

পিতাকে নীরব দেখে গদাধর আবার জিজ্ঞাসা করে, তি নাম বাবা?

ক্ষুদিরাম আর চিন্তা না ক'রে বলে, সর্ব্বমঙ্গলা।

নাম শুনে গদাধর পিতার কোল থেকে লাফিয়ে ওঠে। ধনীর উদ্দেশ্যে চীৎকার ক'রে ডাকে, ও থাইমা! থাইমা! ডাকতে ডাকতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে।

গদাধরের আহ্বানে আঁতুড় ঘর থেকে ধনী সাড়া দিয়ে জিজ্ঞাসা করে, কি বাবা?

গদাধর আঁতুড় ঘরের দরজার কাছে এসে বলে, আমাল বোনের নাম তি দানো?

ধনী নব জাতককে তেল মাখাতে মাখাতে কৌতূহলের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে, কি বাবা?

গদাধর ধনীর দিকে চেয়ে উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে, থব্যমন্দলা।

গদাধরের কথা শুনে ধনী খিল্ খিল্ ক'রে হেসে ওঠে। তারপর চন্দ্রমণির দিকে চেয়ে বলে, শুনলে বৌদি!

চন্দ্রমণি কোন কথা না ব'লে ম্লান হাসে।

ধনী খিল্ খিল্ ক'রে হেসে ওঠাতে গদাধর কেমন যেন অপ্রস্তুত হ'য়ে যায়। বুঝে উঠতে পারে না, নাম শুনে হাসার কি হ'ল? তাই আর কথা না ব'লে বোকার মত ঘুরে দাঁড়ায়।

এমনি করে দিন যায়, মাস ঘোরে। চন্দ্রমণি আঁতুড় ঘর থেকে বেরিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। আবার শুচি হ'য়ে গৃহকর্ম্মে মনোনিবেশ করে। আর এই পৌঢ় বয়সে দুটি নাবালক সন্তান গৃহকর্ম্মকে দীর্ঘ এবং জটিল ক'রে তোলে। বিশ্রাম ও আরামের অবসর দেয় না। প্রায় সব সময়ই হয় তাদের নয় সংসারের পরিচর্য্যা ক'রতে হয়

সর্ব্বমঙ্গলা হবার পর থেকে গদাধর আর আগের মত মার কোল এবং আদর পায় না। তাই পিতাকে নিবিড় ভাবে জড়িয়ে ধরে। তা'ছাড়া বাবার সঙ্গে যত জায়গায় যেতে পারে, যত কথা জানতে পারে সেটা মার কাছ থেকে পায় না।

আর ক্ষুদিরাম হয় বিব্রত। জীবন-সায়াহ্নে এই মায়া-ডোরে সে যেন জড়িয়ে পড়ে। অপত্য স্নেহের জোয়ারে পরকালের চিন্তা ভেসে যায়। গদাধর এসে বায়না ধ'রলে আর তাকে ফেরাতে পারে না। এটা ওটা কিনে দিতে হয়। সঙ্গে নিয়ে বেরুতে হয়। নানা প্রশ্ন করে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব কিছুর উত্তর দিতে হয়। শিশুমন যা দেখে, যা শোনে তাই বিস্ময়। আর সেই বিস্ময়ের নিরসন ক'রতে হয় তাকে। এক এক সময় ভাবে, কঠোর হবে, গম্ভীর হবে, কিন্তু পারে না। গদাধর এসে যখন ছলছল চোখে আধো আধো স্বরে ডাকে, বাবা! তখন তার মন যেন মাধ্যাকর্ষণে শূন্য থেকে দ্রুত নেমে আসে একেবারে মাটিতে। সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ধূলিসাৎ হ'য়ে যায়। রঘুবীরের স্থান জুড়ে এসে দাঁড়ায় রক্ত-

মাংসের দেহ নিয়ে ঔরসজাত পুত্র গদাধর। আদর আর আব্দার রক্ষা ক'রতে হয়। গীতা বন্ধ ক'রে নিয়ে বেরুতে হয় বাইরে। বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় করাতে হয়। এটা কি পাখী? ওটা কি গাছ? সেটা কি পোকা ইত্যাদি বহু প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। রঘুবীর এবং পরকালের কথা ভাববার এতটুকু অবকাশ দেয় না। অথচ বেশ জানে—

যতো যতো নিশ্চলতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ।

কিন্তু মনকে আর বশে রাখতে পারে না। সে অস্থির হ'য়ে তার গদাইয়ের আহ্বানে ছুটে যায়। নিজের আত্মার মুক্তিপথ রুদ্ধ ক'রে দেয়। আবার পৃথিবীতে ফিরে আসার সূচনা করে। এক একবার ভাবে—আর না, আর না। অনেক হ'য়েছে, অল্প বয়সে পিতৃহারা হ'য়ে এক নাগাড়ে সংসার ক'রেছে। অনেক ঘাতপ্রতিঘাত সয়েছে। তার দুই নাবালক ভাই ও ভগ্নীকে মানুষ ক'রেছে। বে'থা দিয়ে সংসারী ক'রেছে। নিজে দু'বার বিয়ে ক'রেছে। প্রথমা স্ত্রী অবশ্য বিয়ের অল্পদিন পরেই মারা যায়। তারপর বিয়ে করে চন্দ্রাকে। উঃ! সে কি আজকের কথা! প্রায় ত্রিশ বছর হ'য়ে গেল। আর এই দীর্ঘকাল ধ'রে যথাকর্ত্তব্য ক'রে এসেছে। রামকুমারকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ ক'রেছে। পৈতে দিয়েছে। রামেশ্বরের পৈতে দিয়েছে। অর্থাৎ সংসার-ঘানিতে কলুর বলদের মত ক্রমান্বয়ে ঘুরপাক খেয়েছে এবং আজো খাচ্ছে। কিন্তু আর না। এখনও সময় আছে, এই মায়ার বাঁধন ছিঁড়তে হবে। গদাধরের আদর আর আব্দার থেকে দূরে স'রে দাঁড়াতে হবে। ভুলতে হবে স্নেহ সম্ভাষণ।

আঁতুড় উঠতেই ক্ষুদিরাম শুচি হ'য়ে ফুল তুলে আনে। গভীর নিষ্ঠা ও ভক্তি নিয়ে গাঁথতে বসে মালা।

শিশুসুলভ চপলতা নিয়ে গদাধর এসে দাঁড়ায়। একদৃষ্টে দেখে। তারপর কৌতূহলী হ'য়ে জিজ্ঞাসা করে, এ মালাতা কাল বাবা?

ক্ষুদিরাম মালার প্রতি মন এবং দৃষ্টি রেখেই বলে, রঘুবীরের।

পিতার কথা শুনে গদাধর চুপ ক'রে কি যেন ভাবে। সুন্দর মালা-গাছি দেখে লোভ হয়। তাই গাঁথা শেষে হ'তেই আব্দার ক'রে বলে, মালাতা আমালে দাওনা বাবা।

সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদিরাম ঈষৎ ভর্ৎসনার সঙ্গে বলে, ছি বাবা! ঠাকুরের মালা গলায় দিতে নেই। যাও, তুমি খেলা কর গে।

বাবা চ'লে যেতে বলে বটে কিন্তু গদাধর যায় না। ভরাক্রান্ত মনে একই ভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মালা গাঁথা দেখে।

পুত্রের বিমর্ষ মুখের দিকে চেয়ে ক্ষুদিরামের কষ্ট হয় কিন্তু আবার আনন্দও হয় এই ভেবে, ধীরে ধীরে এমনি ক'রে কঠোর হ'তে হবে। মিছে মায়াডোর ছিঁড়ে ফেলতে হবে। পরিপূর্ণ ভাবে রঘুবীরের চরণে স্মরণ নিতে হবে।

এমন সময় চন্দ্রমণি পূজার গোছ ক'রে দিয়ে ঠাকুরঘর থেকে বেরিয়ে আসে। ক্ষুদিরামের দিকে চেয়ে বলে, যাও—হ'য়েছে! তারপর পুত্রের বিষণ্ণ মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা ক'রে, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছো কেন?

গদাধর কোন জবাব দেয় না।

ক্ষুদিরাম বেশ বুঝতে পারে পুত্রের অভিমান হ'য়েছে। তা' হোক। কিন্তু আর প্রশ্রয় দেওয়া উচিৎ হবে না। এমনি ক'রেই গদাধরের কাছ থেকে দূরে স'রে আসতে হবে। তাই আর পুত্রকে কিছু না ব'লেই গম্ভীর ভাবে মালা ক'গাছা নিয়ে ঠাকুরঘরে গিয়ে ঢোকে।

পিতার গম্ভীর মূর্ত্তি এবং উদাসীনতা গদাধরকে আরো বেশী আহত করে। ব্যথায় ও অভিমানে চোখ ছলছল ক'রে ওঠে। ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা করে। অনেক কষ্টে চোখের জল এবং বুকের কাঁদন দমন ক'রে নিয়ে ভাবে—বাবা কেন তার প্রতি এমন উদাসীন হ'ল? যে বাবা তার একটুখানি মুখভার দেখলে কত আদর করতো। কত কি কিনে দেবার, কত জায়গায় নিয়ে যাবার প্রস্তাব দিত, আর সেই বাবা

মালাটাতো দিলই না—তার উপরে একটি কথাও না ব'লে ঠাকুরঘরে গিয়ে ঢুকলো। ভাবতে ভাবতে দুঃখে ও অভিমানে চোখ দিয়ে এক সময় জল ঝ'রে পড়ে। তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চ'লে আসে। বাড়ীর বাইরে এসে দাঁড়ায়। উদাস মনে ফুলটা ছেঁড়ে। ডালটা ভাঙ্গে। বড় গাছের ডালে উপবিষ্ট ঘুঘুটাকে ঢিল ছুঁড়ে তাড়ায়। কিন্তু ব্যথাটাকে আর কিছুতেই ভুলতে পারে না। কাঁটার মত মনের মধ্যে খচখচ ক'রে বিঁধতে থাকে। হঠাৎ মনে পড়ে—বাবা ব'লেছিল রঘুবীরকে ডাকলে সে এসে দুঃখ ভুলিয়ে দেয়। সে রঘুবীরকেই ডাকবে। তাই আবার বাড়ী ঢোকে। ঠাকুরঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। ভিতরে দৃষ্টি ফেলে দেখে—বাবা অন্যান্য দিনের মত ঘুমিয়ে প'ড়েছে। ভিতরে ঢুকে ব'সলে পাছে মা আবার হাত ধ'রে টেনে নিয়ে যায়, তাই দরজার কাছে বসে। চোখ বুজে রঘুবীরের কথা ভাবে। ছবিটা চোখের উপর ভেসে আসে, কিন্তু না, রঘুবীর আসে না। ভাবে—কেন আসছে না? হঠাৎ মনে হয় বাবার মত ঐ রকম লাল কাপড় পরে না ডাকলে বোধ হয় রঘুবীর আসবে না। আবার উঠে পড়ে। রান্না-ঘরে এসে চন্দ্রমণিকে বলে, মা! আমালে তেলির কাপল পলিয়ে দাও।

চন্দ্রমণি ছেলের কথা শুনে বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, কেন বাবা?

গদাধর সাধ্যমত গম্ভীর ভাবে বলে, আমি লঘুবীলকে দাকবো।

ঠাকুর দেবতার উপর ছেলের ভক্তি ও অনুরাগ দেখে চন্দ্রমণি উৎফুল্ল হয়। তাই উৎসাহ দিয়ে বলে, বেশ তো ডাকো গে না।

গদাধর ক্ষুণ্ণমনে বলে, দাকছি তো—আততে না। বাবাল মত তেলি প'লে না দাকলে আতবে না।

চন্দ্রমণির হাতে অনেক কাজ। এতটুকু সময় নষ্ট করার মত অবকাশ নেই। কিন্তু ছেলে যখন জেদ ধ'রেছে তখন সে না ক'রে ছাড়বে না। যতক্ষণ না কাপড় প'রিয়ে দেওয়া হবে জ্বালাতন ক'রে মারবে। শান্তিতে কিছু ক'রতে দেবে না। তাই অনিচ্ছা সত্বে যায় এবং কাপড়ও পরিয়ে দেয়।

গদাধর কাপড় প'রে আবার ঠাকুরঘরের দরজার কাছে এসে বসে। মনে মনে রঘুবীরকে ডাকে। ডাকতে ডাকতে তন্ময় হ'য়ে যায়। বালকবেশী শ্রীরামচন্দ্রের শ্যামল মূর্ত্তিটা চোখের উপরে ভেসে আসে। ক্রমে ক্রমে মূর্ত্তিটা সজীব হ'য়ে ওঠে। তারপর হাসতে হাসতে তার দিকে এগিয়ে আসে।

দেখে—গদাধরের সর্ব্বশরীর থর থর ক'রে কাঁপে। জ্ঞান লুপ্ত হবার মত হয়। ভুলে যায়—বাপ, মা, ভাই, বোনদের কথা। আর ঠিক সেই সময় মূর্ত্তিটা এসে তার দেহের মধ্যে প্রবেশ করে। সঙ্গে সঙ্গে সে সম্মোহিত হ'য়ে যায়। আর কিছুতেই ভাবতে পারে না যে, সে বাপমার স্নেহের গদাই। তখন তার মনে হয় সেই-ই ঐ রঘুবীর। বাবা যার পূজো ক'রছে। ধীরে ধীরে ধারণাটা বদ্ধমূল হ'য়ে যায়। আর সেই অনুভূতি ও ভাব নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। সম্মোহিতের মত ঠাকুরঘরের ভিতর এসে ঢোকে। পূজোর চন্দন নিয়ে কপালে বুকে লেপন করে। পিতার সযত্নে গাঁথা রঘুবীরের উদ্দেশ্যে মালাটা গলায় পরে। তারপর আধো আধো স্বরে ডেকে বলে, বাবা! দেখ তোমাল লঘুবীল কেমন থেজেথে!

ক্ষুদিরামের তবু ধ্যান ভাঙ্গে না।

পিতার উপর ভাব-বিহ্বল দৃষ্টি তুলে আবার বলে, বাবা তেয়ে দেখো! মালা তন্দন প'লে তোমাল লঘুবীলকে তি থুন্দর দেথতে হ'য়েথে।

এইবার ক্ষুদিরামের ধ্যান ভাঙে। স্বপ্নোত্থিতের মত আঁখি মেলে চায় পুত্রের দিকে। দেখে শিউরে ওঠে। সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হয়। যবনিকার মত চক্ষের স্থূল পর্দ্দাটা স'রে যায়। সেই সঙ্গে ভুলে যায় বিশ্বসংসারের কথা, পুত্র পরিবারের কথা, ইহকাল পরকালের কথা। কিছুতেই আর মনে হয় না—মালা-চন্দন প'রে যে তার চোখের সম্মুখে দাঁড়িয়ে র'য়েছে সে তার পুত্র গদাধর। পঞ্চভূতের সমন্বয়। রক্তমাংসের দেহধারী মানুষ। শুধু মনে হয়—সারা জীবন যার সে তপস্যা ক'রে আসছে —ঘুমে জাগরণে, ধ্যানে জ্ঞানে যাকে সে চেয়েছে, সে ঐ তার সম্মুখে

মালা-চন্দনে ভূষিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার সারা জীবনের তপস্যার ফল, পরকালের পাথেয়।

ক্ষুদিরাম ভাবে, ভক্তিতে, আনন্দে, আবেগে গদাধরকে বুকে টেনে নিয়ে স্থান কাল ভুলে চীৎকার ক'রে ওঠে—পেয়েছি—পেয়েছি।

চীৎকারে চন্দ্রমণি রান্নাঘর ছেড়ে ছুটে আসে। মালা-চন্দনে ভূষিত পুত্রকে পিতার কোলে ব'সে থাকতে দেখে বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, কি হ'ল ?

মার সাড়া পেয়ে গদাধর পিতার আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে ভীত ও সন্ত্রস্ত হ'য়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে।

সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদিরামের ভাব বিনষ্ট হ'য়ে যায়। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে, না—কিছু হয় নি।

চন্দ্রমণি আর কিছু না ব'লে আবার রান্নাঘরে ফিরে আসে।

আঠাশ

এরপর ক্ষুদিরামের হৃদয় শান্ত হয়। গদাধরকে নিবিড় স্নেহে আবার জড়িয়ে ধরে। আর মনে হয় না...মিছে মায়া ডোর। মুক্তি পথের অন্তরায়। আবার পুত্রকে কোলে ব'সিয়ে বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারতের গল্প শোনায়। পূর্ব্বপুরুষদিগের নামাবলী শেখায়। বলে, বলো তো গদাই তোমার ঠাকুর দাদার নাম ?

গদাই আধো আধো স্বরে বলে, য়িত্বর মানিত লাল তত্তোপাধ্যায়।

ক্ষুদিরাম আবার জিজ্ঞাসা করে, বলো তো তোমার বাবার নাম ?

সঙ্গে সঙ্গে গদাই জবাব দেয়, খিলি ক্ষুদিলাম তত্তোপাধ্যায়।

—গ্রাম ?

—কামালপুকুর।

—জেলা ?

—হুগলি।

এমনি ক'রে ক্ষুদিরামের জীবন-বেলা গড়িয়ে যায় সন্ধ্যার দিকে। আর গদাধরের কেটে যায় চতুর্থ বর্ষ।

আরো হয়তো অনেকদিন যেত। কিন্তু চন্দ্রমণি যখন বলে, হ্যাঁগা! ছেলেতো পাঁচ বছরে প'ড়লো—এবার পাঠশালায় দেবার ব্যবস্থা করো।

ক্ষুদিরামের তখন হুঁস হয়। সত্যিই তো! গদাধর তার যাই হোক, যখন দেহ ধারণ ক'রে এসেছে তখন শিক্ষা দীক্ষা, রীতি নীতি সব কিছুই শেখাতে হবে। তারপর তার ভাগ্য এবং কর্ম্ম যে পথে নেয় নিক। তাই একটা শুভদিন দেখে গদাধরকে সঙ্গে নিয়ে পাঠশালার উদ্দেশ্যে রওনা হয়।

পাঠশালাটা ধর্ম্মদাসের বাড়ীর সম্মুখে এবং তারই বিস্তৃত নাটমণ্ডপে। এই পাঠশালার যাবতীয় ব্যয়ভার ধর্ম্মদাসই বহন করে।

ক্ষুদিরাম গদাধরের হাত ধ'রে পাঠশালার সমুখে আসতেই শিক্ষক রাজেন সরকার আসন ছেড়ে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ায়। বিনীত ভাবে বলে, আসুন চাটুয্যেমশায়, আসুন!

শিক্ষকের দেখাদেখি ছাত্ররাও উঠে দাঁড়ায়।

ক্ষুদিরাম গদাধরকে সঙ্গে নিয়ে পাঠশালার ভিতরে প্রবেশ করে।

রাজেন সরকার এগিয়ে এসে ভক্তিভরে পায়ের ধূলো নেয়। তারপর নিজের আসনটার দিকে নির্দ্দেশ ক'রে বলে, বসুন বসুন!

ক্ষুদিরাম যথাস্থানে দাঁড়িয়েই বলে, থাক থাক, ব্যস্ত হ'তে হবে না। তুমি ব'সো। তারপর তার জিজ্ঞাসু দৃষ্টির দিকে চেয়ে বলে, ছেলেটাকে ভর্ত্তি ক'রতে এলাম।

রাজেন সরকার বিনয়ের সঙ্গে বলে, বিলক্ষণ বিলক্ষণ। আপনার না এলেও হ'ত। লোক মারফৎ.........

ক্ষুদিরাম শিক্ষককে কথাটা শেষ করার অবকাশ না দিয়ে বলে, এখন বলো দেখি—কি কি বই এর লাগবে ?

রাজেন সরকার একটু চিন্তা ক'রে বলে, বর্ণবোধ...

ক্ষুদিরাম সঙ্গে সঙ্গে বলে, বর্ণবোধ প্রথম, দ্বিতীয় ভাগ আমি বাড়ীতেই শেষ ক'রিয়ে দিয়েছি।

রাজেন সরকার আবার চিন্তা ক'রে বলে, আচ্ছা, খোকা কাল পাঠশালায় এলে ভেবেচিন্তে পুস্তকের একটা তালিকা ক'রে পাঠিয়ে দেবো।

ক্ষুদিরাম সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে বলে, সেই ভালো। তারপর গদাধরের দিকে চেয়ে বলে, চলো বাবা, এখন আমরা যাই। কাল থেকে তা' হ'লে তুমি পাঠশালায় এসো, কেমন ?

গদাধর মহানন্দে ঘাড় নাড়ে।

পাঠশালায় এসে গদাধরের গণ্ডী বিস্তীর্ণ হ'য়ে যায়। ছোট ছোট বাধা নিষেধের আড়াল থাকে না। সমবয়সী সহপাঠিদের সঙ্গ পেয়ে দিনগুলি হৈ হৈ ক'রে কাটে।

পাঠশালা বসে দিনে দু'বার। একবার সকালে আর একবার বিকালে। সকাল বেলা ছটা থেকে নটা দশটা পর্য্যন্ত। আর বিকাল চারটে থেকে ছটা পর্য্যন্ত। গদাধরের মত অল্পবয়সী ছেলেদের অতক্ষণ পর্য্যন্ত প'ড়তে হয় না। ঘণ্টা দেড়েক পড়ার পরই তাদের নিষ্কৃতি। তবে ছুটি না হওয়া পর্য্যন্ত পাঠশালার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকতে হয়। তা হ'লেও কারো কোন কষ্ট হয় না। কারণ পাঠশালার সম্মুখস্থ

বিস্তৃত প্রাঙ্গণে মহানন্দে খেলাধূলা ক'রে সময় কেটে যায়। এবং অল্প দু'চার দিনের মধ্যেই গদাধর তার মধুর ব্যবহারের জন্যে সহপাঠিদের বেশ প্রিয় হ'য়ে ওঠে। এমন কি খেলাধূলায় ও অন্যান্য বিষয়ের অধিনায়ক হয়। এই সহপাঠিদের মধ্যে আবার সব চেয়ে বেশী বন্ধুত্ব হয় ধর্ম্মদাসের ছেলে গয়াবিষ্ণুর সঙ্গে। বাপ মার চেয়েও বন্ধুবান্ধবের সঙ্গ গদাধরকে বেশী আকর্ষণ করে। পাঠশালার ছুটির পর বিশেষ ক'রে বিকালের দিকে এদের সঙ্গে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বনে-বাদাড়ে, মাঠে-ঘাটে বন্ধনহারা পাখীর মত উড়ে বেড়ায়। সারা গ্রামের কোন জায়গা এখন আর গদাধরের অপরিচিত নয়। এমন কি পুরীধামের যে পথটা তাদের বাড়ীর সমুখ দিয়ে চ'লে গেছে এবং যার আদি অন্ত আছে কিনা সে জানে না, সেই পথের উপরে তাদের গ্রাম ছাড়িয়ে অনেক দূরে…পুরীযাত্রীদের জন্যে যে ধর্ম্মশালা আছে তাও একদিন গিয়ে দেখে এসেছে। সেই সঙ্গে দেখে এসেছে কয়েকটা সাধু বৈরাগীকে। অবশ্য অনেক সাধু সন্ন্যাসীকে তাদের বাড়ীতেই ভিক্ষা নেওয়া কালে বা ভোজন কালে দেখেছে, কিন্তু তখন অত বুঝতো না। তাই তাদের সম্বন্ধে কোন কৌতূহলও ছিল না। কিন্তু ধর্ম্মশালায় তাদের বিচিত্র সংসার দেখে ও রান্নাবান্না ক'রে খেতে দেখে শুধু বিস্মিতই হয় না, নানা প্রশ্নও মনের মধ্যে এসে জড়ো হয়। এরা কেন বাড়ী ঘর ছেড়ে, স্ত্রী পুত্র ছেড়ে বেরিয়েছে ? সারা জীবন পথে পথে ঘুরে বেড়ায় কেন ? এই কষ্ট ক'রে লাভ কি ? এই ধরণের বহু প্রশ্ন।

তারপর গ্রামের শ্মশান ভূতির খালও দেখে এসেছে। ভূরসুবোর মাণিক রাজার আমবাগান। এমনকি তার দিদির শ্বশুরবাড়ী আনুরের বিশালাক্ষির মন্দির পর্য্যন্ত।

আর বাড়ীর বাইরে এলেই কেন জানে না মনটা যেন কি রকম হ'য়ে যায়। তখন বাড়ীর কথা মোটেই তার মনে পড়ে না। সব ভুলে যায়। বিশেষ ক'রে সঙ্গী সাথী না থাকলে কি যেন একটা অনির্ব্বচনীয় ভাব তাকে পেয়ে বসে। ঐ দূরে…অনেক দূরে…যেখানে আকাশটা নেমে এসে

মাটির সঙ্গে মিশেছে—ওখানে যেতে ইচ্ছে করে। মনে হয়...ওখানে সেই অযোধ্যা, যেখানে শ্রীরামচন্দ্রের বাড়ী। যার কথা সে তার বাবার মুখে শুনেছে। আর ঐ অযোধ্যা ছাড়িয়ে গেলেই শ্রীকৃষ্ণের বাড়ী ও লীলাভূমি মথুরা বৃন্দাবন। ওখানে যেতে পারলেই সকলের সঙ্গে দেখা ক'রে আসতে পারে। দু'একদিন ওখানে যাবে ব'লে এগিয়েও যায়। অনেকটা পথ হেঁটে এসে দেখে—আকাশ আর মাটির সমন্বয় যতখানি দূরে ছিল ততখানি দূরেই আছে। ব্যবধান এতটুকু কমাতে পারে নি। পরিশেষে হতাশ হ'য়ে আবার ফেরে। হতাশ হ'লেও একেবারে নিরাশ হয় না। একদিন সে ঠিকই যাবে। এখনই সে যেতে পারে। কিন্তু ফিরতে যদি দেরী হ'য়ে যায় তাহ'লে বাবা মা ভাববে। খোঁজাখুঁজি ক'রে বেড়াবে। তারপর ফিরে এলে বাবা মা কিছু ব'লুক না ব'লুক বড়দা যাচ্ছে-তাই ক'রে ব'কবে। সেই কারণে অনিচ্ছা সত্বে ফিরে আসে, আর ভাবে —কবে সে বড় হবে।

ভাবতে ভাবতে গয়াবিষ্ণুর বাড়ীর পথ ধরে। তার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে যদি আগে যাওয়া যায় তার একটা উপায় উদ্ভাবন করতে। কিন্তু আর যাওয়া হয় না। কৃষ্ণ কুম্ভকারের বাড়ীর সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে। দেখে—কেষ্টদা নিবিষ্টমনে কালীপ্রতিমা নির্ম্মাণ ক'রছে। গয়া-বিষ্ণুর কথা ভুলে কেষ্টর বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়ে।

পদশব্দে কেষ্ট ঘাড় তুলে চায়। গদাধরকে দেখে উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে, বসো ছোড় দাঠাকুর! ব'লে আবার কাজে মনোনিবেশ করে।

গদাধর এগিয়ে এসে কেষ্টর পাশটিতে গিয়ে বসে। একদৃষ্টে তন্ময় হ'য়ে মূর্ত্তি নির্ম্মাণকৌশল দেখে। দেখতে দেখতে ইচ্ছা হয় সেও ঐ রকম একটা মূর্ত্তি তৈরী করে। বাসনাটা ক্রমে প্রবল হ'য়ে ওঠে। কেষ্টর হাতের কাছ থেকে খানিকটা কাদার ডেলা তুলে নেয়। তারপর কেষ্টর মতন ক'রে গড়বার চেষ্টা করে।

দিনের আলো নিভে আসায় কেষ্ট কাজ বন্ধ করে। স্ত্রীকে একটা

আলো দিয়ে যেতে ব'লে গদাধরের দিকে চায়। তার তৈরী কিম্ভূত-কিমাকার মূর্ত্তিটা দেখে হো হো ক'রে হেসে ওঠে। পরে হাসি থামিয়ে বলে, ও কি হ'চ্ছে দাঠাকুর ?

কেষ্টর হাসির শব্দে গদাধরের তন্ময়তা টুটে যায়। মুখখানা লজ্জায় রাঙা হ'য়ে ওঠে। সলজ্জ কণ্ঠে বলে—কালী !

কেষ্ট গদাধরের লজ্জারাঙা মুখের দিকে চেয়ে তার সৃষ্টি সম্বন্ধে আর কোন মন্তব্য না ক'রে বলে, সন্ধ্যে হ'য়ে এল, এখন বাড়ী যাও। আবার কাল এসে ক'রো।

গদাধর অনিচ্ছা সত্ত্বে উঠে দাঁড়ায়। হঠাৎ মনে হয়—এটা তো গরম কাল। এখন তো কালীপূজো হয় না। তবে কেষ্টদা এখন কালীঠাকুর তৈরী ক'রছে কেন ? তাই কৌতূহলী হ'য়ে জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা কেষ্টদা ! এখন তো কালীপূজো হয় না। তবে ঠাকুর ক'রছ কেনে গো ?

এমন সময় কেষ্টর স্ত্রী একটা প্রদীপ দিয়ে যায়।

কেষ্ট প্রদীপটাকে সুবিধামত জায়গায় ব'সিয়ে দিয়ে বলে, এটা হ'চ্ছে রক্ষেকালী। এর পূজো এই সময়েই হয়। আর এই কালী একদিনের মধ্যে তৈরী ক'রে পূজো ক'রতে হয়। তা' ছাড়া আরো অনেক রকম কালী আছে—শ্মশানকালী, ডাকাতেকালী, ভদ্রকালী······অন্ধকার নিবিড় হ'য়ে আসছে দেখে ব্যস্ত হ'য়ে প্রসঙ্গটা ছেড়ে দিয়ে বলে, কাল এসো। তোমাকে সব ব'লবো। এখন বাড়ী যাও। আঁধার হ'য়ে এলো। এরপর হয় তো তোমার বাবা কিংবা দাদারা খুঁজতে বেরুবে।

গদাধর অদম্য কৌতূহল এবং ঔৎসুক্য বুকে চেপে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। কেষ্টর নিকটস্থ জলের কলসীটার মধ্যে কাদামাখা হাতখানা ঢুকিয়ে দেয়। হাতের কাদাগুলো র'গ্‌ড়ে র'গ্‌ড়ে ধোয়। তারপর নিজের ও কেষ্টর নির্ম্মিত মূর্ত্তি দুটোর দিকে চেয়ে ক্ষুণ্ণমনে বাড়ীর পথ ধরে।

বাড়ীতে এসে যখন ঢোকে তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে। তখনো

তাকে ফিরতে না দেখে বাড়ীর সকলে বেশ চিন্তিত হ'য়ে উঠেছে। ক্ষুদিরাম খুঁজতে বেরুবে কিনা ভাবছে।

তাই গদাধর বাড়ী ঢুকতেই রামেশ্বর মৃদু ভৎর্সনার সঙ্গে বলে, কোথায় গেছিলি ? সন্ধ্যে হ'য়ে গেছে হুঁস নেই ?

গদাধর কোন কথার জবাব দেয় না। নীরবে নত মস্তকে বাড়ীর উঠানে দাঁড়িয়ে থাকে।

রামেশ্বর আরো কিছু ব'লতে যাচ্ছিলো। ক্ষুদিরাম বিরত ক'রে বলে, রামেশ্বর ! আর কিছু ব'লিসনে বাবা ! তারপর গদাধরের কুণ্ঠিত ও পাংশু মুখের দিকে চেয়ে সস্নেহে বলে, হাতমুখ ধুয়ে উঠে এসো বাবা ! ব্রাহ্মণের ছেলে, সন্ধ্যের সময় বাড়ী থাকবে। রঘুবীরের আরতির সময় কাঁসর ঘণ্টা বাজাবে। পৈতে হ'লে তুমিই রঘুবীরের সন্ধ্যারতি ক'রবে······

পিতার বক্তব্যটা শেষ না হ'তেই রামেশ্বর তাচ্ছল্য ভরে বলে, হুঁ— ক'রবে ? জিজ্ঞেস করুন তো কোথায় ছিলো ?

পিতা প্রশ্ন করার আগেই গদাধর কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না ক'রে সহজ ভাবে বলে, কেষ্টদার বাড়ী।

পিতার হ'য়েই রামেশ্বর প্রশ্ন করে, কেষ্টদার বাড়ী কি ক'রছিলি ?

গদাধর একই ভাবে বলে, কালীঠাকুর তৈরী ক'রছিলাম।

রামেশ্বর গদাধরের উপর থেকে দৃষ্টি তুলে নিয়ে পিতার উপর অর্থপূর্ণ ক'রে ফেলে।

ক্ষুদিরাম কিন্তু কিছুই বলে না বরং গদাধরের নির্ভীকতা এবং সত্যবাদিতা দেখে পরম তুষ্ট হয়। তাই প্রশান্ত কণ্ঠে গদাধরকে লক্ষ্য ক'রে বলে, হ্যাঁ ! এই রকম সত্য কথা সব সময়ই ব'লবে। এতে আর যেই বিরূপ হোক না কেন, ভগবান বিরূপ হবেন না। প্রসঙ্গটা চাপা দিয়ে সস্নেহে বলে, যাক্ এখন হাত পা ধুয়ে ঘরে উঠে এসো।

পিতার কথা শুনে রামেশ্বরের মুখের উপর বিরক্তির চিহ্ন ফুটে ওঠে। মনে মনে ভাবে—গদাইয়ের পরকালটা বাবাই নষ্ট ক'রবে। আর বাবা

জীবিত থাকতে ও সম্মুখে থাকতে গদাইকে শাসন করা তার উচিৎও নয়, শোভনও নয়। তাই আর দ্বিরুক্তি না ক'রে বিরস মনে পাঠ্যপুস্তকে মনোনিবেশ করে।

গদাধর হাত পা ধুয়ে ঘরে উঠে আসে।

এমনি ক'রে বাপ মার স্নেহ ভালবাসায় গদাধরের দিনগুলো কেটে যায়। কোন কোনদিন সেটা সীমা লঙ্ঘন করে। রামকুমার, রামেশ্বর বিরক্ত হ'য়ে ওঠে। কিন্তু পিতার জন্যে শাসন ক'রতে পারে না। কিছু ব'লতে গেলেই পিতা মাতা হাঁ হাঁ ক'রে আসে। বলে, যাক্‌গে যাক্‌গে, ছেলেমানুষ···ক'রে ফেলেছে···বড় হ'লে সব ঠিক হ'য়ে যাবে।

রামকুমার, রামেশ্বর নিরস্ত হয়, কিন্তু খুশী হয় না। নিরুপায় হ'য়ে সহ্য করে। সেই সঙ্গে গদাধরের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশ হয়।

ক্ষুদিরামও বোঝে। শাসন করার প্রয়োজনীয়তাও মনে মনে স্বীকার করে কিন্তু পারে না। শাসন ক'রতে গেলেই চোখের উপর ভেসে ওঠে—মালা-চন্দন ভূষিত গদাধরের সেই মূর্ত্তি ও কথা—বাবা দেখো! তোমার রঘুবীর কেমন সেজেছে! আর সেই দৃশ্য মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সব ক্রোধ ও বিরক্তি স্তিমিত হ'য়ে আসে। তার পরিবর্ত্তে স্নেহ করুণায় হৃদয় ভ'রে ওঠে।

বাপ মার অত্যধিক স্নেহ ভালবাসা পেয়ে গদাধর ক্রমেই বেপরোয়া হ'য়ে ওঠে। সকালবেলা পাঠশালার ছুটির পর সহপাঠিদের সঙ্গে এসে হালদারপুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পুরুষদের ঘাটে ভীড় থাকলে মেয়েদের ঘাটেই নামে, জল তোলপাড় ক'রে তো'লে। স্নানার্থিনীরা বিরক্ত হয়। জপতপের সময় জলের ছিটে লাগিয়ে বিঘ্ন ঘটায়। বার বার

নিষেধ করে। শেষে অসহ্য হ'য়ে গদাধরকে লক্ষ্য ক'রে বলে, তোরা মেয়েদের ঘাটে কেন এসেছিস ? পুরুষদের ঘাটে যেতে পারিস্ নে।

গদাধর সপ্রতিভ ভাবে জিজ্ঞাসা করে, এসেছি তাই কি হ'য়েছে ?

গদাধরের কথা শুনে মহিলা আরো ক্রুদ্ধ হয়। রাগতঃ স্বরে বলে, জানিস না, মেয়েরা এখানে আদুল হ'য়ে কাপড় চোপড় কাচে—

গদাধরের কৌতূহল ক্রমেই বেড়ে ওঠে। তাই বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, তাতে কি হ'য়েছে ?

গদাধরের কথা শুনে মহিলা রাগে ফেটে পড়ে। চীৎকার ক'রে বলে, দূর্ হ ডেক্‌রা, দূর্ হ ! ব'লে গদাধরকে লক্ষ্য ক'রে তেড়ে আসে।

গদাধর ভীত ও নিরুপায় হ'য়ে উঠে পড়ে। তার দেখাদেখি সঙ্গী-সাথীরাও উঠে আসে। সেদিনের মত স্নান শেষ হয় এবং যে যার বাড়ী চ'লে যায়।

গদাধরও বাড়ী আসে কিন্তু অদম্য কৌতূহল এবং প্রশ্ন নিয়ে। মনে মনে চিন্তা ও বিশ্লেষণ ক'রে কিছুতেই সমাধান ক'রতে পারে না—মেয়েদের নগ্নদেহ দেখলে কি হয় ? একবার ভাবে—মাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রবে। পরে আবার ভাবে—জিজ্ঞাসা ক'রলে একটা উত্তর হয়তো মা দেবে কিন্তু নগ্নদেহ দেখলে কি হয় সেটা সে অনুভব ক'রতে পারবে না। আর এই ধরণের প্রশ্ন ক'রলে মা হয় তো বিরক্ত হবে। চিরাচরিত ভাবে ব'লবে, বড় হও তখন বুঝবে। অথচ অতদিন পর্য্যন্ত তার পক্ষে ধৈর্য্য ধরা অসম্ভব। এখনই সে সব কৌতূহলের নিরসন ক'রতে চায়। নিজেকে দিয়ে উপলব্ধি ক'রতে চায়।

পরের দিন সকাল সকাল পাঠশালা থেকে বেরিয়ে গদাধর বাড়ী না গিয়ে একেবারে পুকুরপাড়ে এসে হাজির হয়। ঘাটের অনতিদূরে একটা গাছের আড়ালে গিয়ে আত্মগোপন ক'রে দাঁড়ায়। চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে চেয়ে থাকে মেয়েদের ঘাটের দিকে। একটি যুবতীর নগ্নদেহও দেখে, কিন্তু মনে কোন ভাবান্তর ঘটে না বা মেয়েপুরুষের মধ্যে কি যে প্রভেদ

তাও বুঝতে পারে না। ভাবতে ভাবতে বাড়ীর পথ ধরে। কিন্তু সমাধান আর কিছুতেই হয় না।

আবার তার পরের দিন এসে দাঁড়ায়। সেদিন দেখে দুটি যুবতীর নগ্নদেহ।

তার পরের দিন তিনটির। কিন্তু কিছুই সে বুঝতে পারে না! পরিশেষে সেই মহিলাটিকে—যে তাকে ভর্ৎসনা ক'রে ঘাট থেকে উঠিয়ে দিয়েছিল তাকে স্নান সেরে উঠে আসতে দেখে গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে। পথ রোধ ক'রে দাঁড়ায়। সপ্রতিভ ভাবে বলে, তুমি তো সেদিন আমাকে ঘাট থেকে তুলে দিলে। ব'ললে, মেয়েদের স্নান করা দেখতে নেই। কিন্তু আমি তো তিনদিন ধ'রে গাছের আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখলাম, কই আমার তো কিছু হ'ল না।

গদাধরের কথা শুনে মহিলাটি বিস্ময় বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। সহসা কোন জবাব দিতে পারে না।

মহিলাকে নীরব দেখে গদাধর আবার জিজ্ঞাসা করে, কি? কিছু ব'লছো না যে?

গদাধরের কথা শুনে মহিলাটির যদিও হাসি পায় কিন্তু অনেক কষ্টে দমন ক'রে কপট রাগের সঙ্গে তিরস্কার ক'রে বলে, দূর হ ডেক্‌রা, দূর হ!

ভীত হ'য়ে গদাধর স'রে আসে। কিন্তু রহস্য রহস্যই থেকে যায়।

মহিলাটি দ্বিপ্রহরে গদাধরদের বাড়ী বেড়াতে আসে। নানা কথার ভিতর হাসতে হাসতে চন্দ্রমণিকে গদাধরের কাহিনীটা বলে।

চন্দ্রমণি শুনে লজ্জায়, ঘৃণায় মরমে মরে যায়। পুত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শঙ্কিত হ'য়ে পড়ে। ছিঃ ছিঃ! তার গদাই নারীর নগ্নরূপ দেখার জন্যে গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকে। আর বাল্যকালেই যদি এই রুচি ও প্রবৃত্তি জন্মায় বড় হ'লে না জানি কি আকার ধারণ ক'রবে। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবারের কলঙ্ক হ'য়ে দাঁড়াবে। স্বামীর উন্নত শির ধূলায় লুটিয়ে দেবে। ভেবে শিউরে ওঠে।

মহিলাটি গল্প-গুজব ক'রে চ'লে যাবার পর চন্দ্রমণি গদাধরকে ডেকে মৃদু ভৎসনার সঙ্গে বলে, গদাই, শুনলাম তুমি নাকি গাছের আড়ালে লুকিয়ে থেকে মেয়েদের স্নান করা লক্ষ্য করো ?

মার কথায় গদাধর কিছুমাত্র কুণ্ঠিত না হ'য়ে বেশ সহজ ভাবে বলে, হ্যাঁ মা।

পুত্রের জবাব শুনে চন্দ্রমণি মর্ম্মাহত হয়। ঘৃণার সঙ্গে বলে, ছিঃ ছিঃ......

মার কথা শেষ না হ'তেই গদাধর কৌতূহলী হ'য়ে জিজ্ঞাসা করে, কেন মা, কি হয় ?

এ প্রশ্নের কি যে জবাব দেবে চন্দ্রমণি ভেবে পায় না। তাই একটু ইতস্ততঃ করে।

মাকে নিরুত্তর দেখে গদাধর আবার প্রশ্ন করে, কি হয় মা ?

চন্দ্রমণি একটু চিন্তা ক'রে নিয়ে বলে, মেয়েদের স্নানের সময় কোন বেটাছেলে যদি তাদের দিকে চেয়ে থাকে তাহ'লে তারা লজ্জা পায়। অপমান বোধ করে। আর তাদের অসম্মান করা মানে আমাকে অসম্মান করা। সব মেয়েছেলেকেই মার মত দেখবে, বুঝলে ? আর এমন কাজ কখনো করো না ?

গদাধর নীরবে ঘাড় নাড়ে।

চন্দ্রমণি গদাধরকে নিবিড় স্নেহে বুকে জড়িয়ে ধরে। মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলে, হ্যাঁ বাবা! এমন কাজ আর কখনও করো না। লোকে শুনলে নিন্দে ক'রবে। আর তাই শুনলে আমারও খুব দুঃখ হবে। আমি দুঃখ পাই, ব্যথা পাই তা কি তুই চাস গদাই ?

মাতৃস্নেহে আপ্লুত হ'য়ে গদাধর গদগদ হ'য়ে বলে, না মা !

পুত্রকে আলিঙ্গনমুক্ত ক'রে দিয়ে চন্দ্রমণি বলে, যাও, খেলা করো গে !

গদাধর মাকে ছেড়ে নীরবে স'রে আসে।

●

উনত্রিশ

যদিও চন্দ্রমণি গদাধরকে ঐরূপ আচরণ না করার উপদেশ দিয়ে ছেড়ে দেয়, কিন্তু নিজের মনকে কিছুতে সান্ত্বনা দিতে পারে না। বারবার পুত্রের ঘৃণ্য রুচি ও প্রবৃত্তি ছবির মত চোখের উপর ভেসে ওঠে। মনটাকে ভারাক্রান্ত ক'রে রাখে। কিছুতেই শিশুসুলভ চপলতা এবং কৌতূহল ব'লে মন থেকে দূর ক'রতে পারে না। উচ্চশিক্ষা না থাকলেও সে জানে এবং লোকমুখে শুনেও এসেছে—বাল্যজীবন দেখেই শিশুদের ভবিষ্যৎ বুঝা যায়। পরবর্ত্তী জীবনে যে যা হবে, যার যা রুচি, তার আভাস পাওয়া যায়। তা ছাড়া তার আরো দুই পুত্র আছে এবং একদিন তারাও বালক ছিল, কিন্তু কোনদিন এইরূপ হীন রুচির পরিচয় দেয় নি বা এই ধরণের কোন কৌতূহলও তাদের মনে জাগে নি। তার দুই পুত্রের জন্যে কারো কাছ থেকে কোন অভিযোগ শুনতে হয় নি আর বোধ হয় হবেও না। কারণ বাল্যকালের উদ্দামতা এবং চপলতা অতিক্রম ক'রে এসেছে। আর এখন তো তারা সাবালক। ভাল মন্দ বিচার ক'রতে শিখেছে, ন্যায়-অন্যায় বুঝতে পেরেছে। অথচ তারা তার গদাধরের মতন অলৌকিক ভাবে গর্ভে আসে নি বা অসামান্যতারও কোন নিদর্শন দেখিয়ে আসে নি। সাধারণ ভাবে এসেছে। যেমন আর পাঁচজনের হয়। কিন্তু যার সম্বন্ধে এত উচ্চ ধারণা পোষণ ক'রে রেখেছিল, শুধু সে নয়, তার স্বামী পর্য্যন্ত সেই পুত্রের একি রুচি ? লোকে শুনলে ব'লবে কি ? আর লোকে কি না শুনবে ? যে তাকে শুনিয়ে গেছে সেই-ই হয় তো সারা গ্রামে ছড়িয়ে দেবে। তার কাছে উপেক্ষা ভরে হাসতে হাসতে ব'লেছে, কিন্তু অন্যত্র গম্ভীরভাবে ঘৃণার সঙ্গে স্বামীর নাম ক'রে ব'লবে, শুনেছ ? ক্ষুদিরাম ঠাকুরের ছোট ছেলের কাণ্ড ?

তারা উৎকর্ণ হ'য়ে উঠবে। কৌতূহলী হ'য়ে জিজ্ঞাসা করবে, কি কি ?

পুত্র তার যত না অন্যায় এবং অপরাধ ক'রেছে তার চেয়ে অনেক বেশী ক'রে মহিলা হাত নেড়ে, মুখ বিকৃত ক'রে ব'লবে, চাটুয্যেবাড়ীর গদাই গো—গদাই। দেবতার বরপুত্র। মেয়েদের স্নান করার সময় গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব লক্ষ্য করে। আবার ডেক্‌রা আমাকে বলে কিনা—মেয়েদের আমি আতুল হ'য়ে স্নান ক'রতে দেখেছি। শুনে আমি তো অবাক ! ঘেন্নায় মরে যাই···

ভাবতে ভাবতে ছবিটা চন্দ্রমণির চোখের উপর ভেসে ওঠে। লজ্জায় ঘৃণায় মরমে মরে যায়। ভবিষ্যৎ ভেবে শঙ্কিত হয়। একবার ভাবে— স্বামীকে ব'লবে। কারণ তার অত্যধিক আদর পেয়েই গদাইয়ের উচ্ছৃঙ্খলতা বেড়ে উঠেছে এবং এখন শাসন করা দরকার। তা না হ'লে ক্রমে ক্রমে একেবারে বেপরোয়া হ'য়ে যাবে। মান-সম্মান, বংশগৌরব সব ধূলায় লুটিয়ে দেবে। তার স্বামীর উন্নত মুখ হেঁট ক'রবে।

আবার ভাবে—কিন্তু স্বামী শুনলে একেবারে ক্ষিপ্ত হ'য়ে যাবে। দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে। শাসন ক'রতে গিয়ে নির্দ্দয় ভাবে প্রহার ক'রবে। আর সেই প্রহারের চোটে ছেলেটা হয়তো বেহুঁস হ'য়ে যাবে। আরও হয় তো অনেক কিছু হ'তে পারে—চন্দ্রমণি আর ভাবতে পারে না, শিউরে উঠে। স্বামীকে বলার সঙ্কল্প ত্যাগ করে। মনে মনে গৃহদেবতা রঘুবীরকে ডেকে বলে, ঠাকুর ! গদাইয়ের মতিগতি ফিরিয়ে দাও।

কিন্তু যার জন্যে এত আশঙ্কা, ঠাকুরের কাছে আকুল প্রার্থনা, সে বেশ নির্ব্বিকার। তার আচরণে একবারও মনে হয় না যে, 'সে কোন অন্যায় বা অপরাধ ক'রেছে। আগের মতই দিব্যি হেসে খেলে ফেরে। তবে বিস্মিত হয়—যখন দেখে মা বিস্ফারিত নেত্রে তার মুখের দিকে চেয়ে কি যেন দেখছে। কৌতূহলী হ'য়ে জিজ্ঞাসাও করে— কি দেখছো মা ?

মা একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে দৃষ্টি নত ক'রে বিষণ্নকণ্ঠে বলে, কিছু না বাবা!

যদিও বালক, তবু মার বেদনার সুরটা বেশ বোঝে। হৃদয়-তন্ত্রীতে এসে ঘা দেয়। কিন্তু কারণ যে কি তা' আর বুঝতে পারে না। তার দিকে বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে মা কি দেখে এইটে মনে মনে বিশ্লেষণ ক'রতে ক'রতে বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে আসে। তারপর দূর দিগন্তের দিকে চেয়ে সব ভুলে যায়।

সেদিন পাঠশালায় যেতে গিয়ে মাকে পরিষ্কার জামাকাপড় প'রতে দেখে থম্‌কে দাঁড়ায়। বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, মা, কোথায় যাচ্ছ?

চন্দ্রমণি একটু ইতস্ততঃ ক'রে বলে, সরাইঘাটা মায়াপুর? তোমার মামার বাড়ী।

মার কথার কোন জবাব না দিয়ে গদাধর বই শ্লেট যথাস্থানে রেখে মার সঙ্গে যাবার জন্যে প্রস্তুত হ'য়ে এসে দাঁড়ায়।

চন্দ্রমণি ছেলের হাবভাব দেখে বেশ বুঝতে পারে সে তার সঙ্গ নেবে। সহসা তাকে নিবৃত্তি ক'রে রাখা যাবে না। যদিও তার পিত্রালয় খুব দূর নয়, পাশেরই গ্রাম। বড় জোর ক্রোশখানেক হবে। কিন্তু বালকের পক্ষে অনেকটা পথ। তা ছাড়া এই দুপুর রোদে খুব কষ্ট হবে। একটুখানি যেতে না যেতেই ব'লবে, মা কোলে নাও। তখন ওকে কোলে নিয়ে পথ অতিক্রম ক'রতে তারও বেশ কষ্ট হবে। ঘুরে আসতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'য়ে যাবে। একেই তো কোলের মেয়েটাকে রেখে যাচ্ছে তার উপর ফিরতে যদি দেরী হয় তখন মেয়েটাও কেঁদে-কেটে সংসারের সবাইকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলবে। এই সব সাতপাঁচ ভেবে শঙ্কিত হ'য়ে বলে, না বাবা, তুমি যেও না। দুপুর রোদে খুব কষ্ট হবে—তা ছাড়া আমি এখুনি ফিরে আসবো।

মার অনুরোধ উপেক্ষা ক'রে গদাধর বেশ দৃঢ়কণ্ঠে বলে, না, আমি যাবো।

গদাধরের ভাব দেখে চন্দ্রমণি বেশ বুঝতে পারে তাকে কোনমতে নিবৃত্তি করা যাবে না। আর তা ক'রতে গেলে একটা বিভ্রাট ঘটিয়ে ব'সবে। সমগ্র পরিবারের মধ্যাহ্নের শান্তি ভঙ্গ ক'রে তুলবে। শেষ কালে হয়তো তারই যাওয়া পণ্ড হবে। স্বামী বিরক্ত হ'য়ে ব'লবে, থাক্ তোমারও গিয়ে কাজ নেই। কারণ তার আর দুই ছেলের চেয়ে গদাই অত্যন্ত জেদি এবং একরোখা। যা' ধ'রবে তা' ক'রে ছাড়বেই। বুঝিয়ে, ভয় দেখিয়ে নিবৃত্তি করা যাবে না। তা ছাড়া ছেলেটার ভয় ডর ব'লতেও কিছু নেই। কেমন ধারা যেন সৃষ্টিছাড়া। তবু একবার শেষ চেষ্টা ক'রে অনুরোধের সুরে বলে, লক্ষী সোনা আমার! মাণিক আমার! তুমি যেও না। কষ্ট হবে। আমি যাবো আর আসবো। তুমি ছোট বোনটাকে নিয়ে খেলা করো। আসার সময় মামারবাড়ী থেকে তোমার জন্যে মিষ্টি আনবো। কথাগুলো ব'লে মিনতি-করুণ দৃষ্টিতে পুত্রের মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

গদাধর কিন্তু আগের মতই মার কাতর অনুরোধ এবং সকরুণ দৃষ্টি সব উপেক্ষা ক'রে একই ভাবে বলে, না, যাবো।

চন্দ্রমণি হতাশ হয়। রুক্ষকণ্ঠে ঝাঁজের সঙ্গে বলে, তবে চল্। বাবা বাবা! জ্বালিয়ে মারলে! কোথাও যদি যাবার নাম শুনলো তবে আর রক্ষে নেই। ব'লতে ব'লতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে। দাওয়ায় এসে পুত্রবধূকে সংসারের কাজকর্ম্মের নির্দ্দেশ দিয়ে ও সতর্ক ক'রে দুর্গা দুর্গা ব'লে বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে।

গ্রাম অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রমণির আশঙ্কা সত্যে পরিণত হয়।

গদাধর পথিমধ্যে দাঁড়িয়ে ক্লান্ত স্বরে বলে, মা, কোলে নাও।

রাগে, দুঃখে, ক্ষোভে চন্দ্রমণির পিত্রালয়ে যাবার সব আনন্দ ও উৎসাহ মিলিয়ে যায়। মুখখানা ভার হ'য়ে ওঠে। একবার মনে হয়, আর বাপের বাড়ী গিয়ে কাজ নেই, বাড়ী ফিরে যাই। এ যাওয়ায় কোন সুখও হবে না আর শান্তিতে দু'দণ্ড ব'সে গল্প-গুজবও করা যাবে না।

ওখানে গিয়েই হয়তো ছেলে জেদ ধ'রবে—মা, বাড়ী চলো। আবার ভাবে বাড়ী ফিরে গেলে আর হয়তো সহসা বাপের বাড়ী যাওয়া হবে না, এই কতদিন থেকে তোড়জোড় ক'রতে ক'রতে তবে আজ বেরুতে পেরেছে। এখন ফিরে গেলে আর কি সহসা আসা হবে? তাই ফিরে যাওয়ার বাসনা ত্যাগ ক'রে হাত দু'খানা পুত্রের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বিরক্তির সঙ্গে বলে, এস। যা ভেবেছিলাম, তাই হ'ল।

গদাধর ছুটে এসে মার কোলে ঝাঁপিয়ে ওঠে। তারপর আব্দারের সুরে বলে, মা, আমার মাথায় আঁচল চাপা দাও। রোদ লাগছে।

চন্দ্রমণি সমান বিরক্তির সঙ্গে পুত্রের নির্দ্দেশ পালন ক'রে দ্রুতপদে মাঠের পথ অতিক্রম করে। কিন্তু কিছুদূর আসতে না আসতে গদাধর কাপড়ের আঁচলখানা মাথা থেকে ফেলে দিয়ে আবার বলে, মা আমাকে নামিয়ে দাও।

বৈশাখের রৌদ্র। তার উপরে ছায়ালেশহীন মাঠের পথ। আর সেই মধ্যাহ্নের রৌদ্রটুকু মাথার উপর নিয়ে, সেই সঙ্গে পুত্রকে কোলে ক'রে পথ অতিক্রম ক'রতে ক'রতে চন্দ্রমণির শরীর ও মন একেই উত্তপ্ত হ'য়ে উঠেছিল, তার উপরে ছেলের আব্দারে সেটার উপর ঘৃতাহুতি পড়ে। ক্রোধের মাত্রা শুষ্ক কুশের মত দপ ক'রে জ্বলে ওঠে। তাই পুত্রকে কোল থেকে সরোষে নামিয়ে দিয়ে তীব্রকণ্ঠে বলে, যাও। বাবা বাবা! একটুখানি যদি সুস্থির হ'য়ে থাকে।

মার রাগ ও বিরক্তি গদাধরের মনে কোন রেখাপাত করে না। সে কোল থেকে নেমে বেশ নির্ব্বিকার ভাবে অনতিদূরে ছায়াঘেরা এক বনতলের দিকে এগিয়ে যায়।

স্থানটা সত্য পীরের পীঠস্থান। দিগন্তবিথারী মাঠের মাঝখানে কয়েকটা আম জাম গাছের তলায় এই পীরের স্থান। আশেপাশের গ্রাম থেকে হিন্দু, মুসলমান অনেকেই এসে তাদের মানতের পূজো দিয়ে যায়। যারা বিপদে প'ড়ে হাতী ঘোড়া ইত্যাদি মানত করে, বিপন্মুক্ত হ'য়ে দেখে

—হাতী ঘোড়া ইত্যাদি কিনে দেওয়া সাধ্যাতীত। নিরুপায় হ'য়ে তখন মৃত্তিকা নির্ম্মিত হাতী ঘোড়া দিয়ে মানত শোধ ক'রে যায়। স্থানটা লোকালয় থেকে কিঞ্চিৎ দূরে এবং ভীতি-শঙ্কুল ব'লে বালকদের খেলার এবং অপহরণের হাত থেকে মাটির হাতী ঘোড়া রক্ষা পেয়ে যথাযথভাবে প'ড়েই থাকে। সহসা স্থানচ্যুত হয় না।

গদাধরকে ঐ ধারে এগিয়ে যেতে দেখে চন্দ্রমণি শঙ্কিত হয়। ভাবে—ছেলেটা হয় তো দেবতাকে অর্পিত হাতী ঘোড়াগুলো নেবে, হয়তো অনেক কিছু অনাচার ক'রে ব'সবে ও শেষে দেবতার কোপানলে প'ড়বে। আর এই সত্যপীর জাগ্রত। যে যা' মানত করে তার তা হয়। আর সেই দেবতার স্থানে গিয়ে যদি অনাচার বা অত্যাচার করে, বালক ব'লে তিনি ক্ষমা ক'রবেন না। তাই ভীতি-বিহ্বল কণ্ঠে ডাকে, গদাই যাস্‌নে যাস্‌নে। ওখানে যেতে নেই।

গদাধর কিন্তু নির্ব্বিকার। মার কথায় কর্ণপাতও করে না বা ফিরেও তাকায় না। গন্তব্যস্থান লক্ষ্য ক'রে দ্রুতপদে এগিয়ে যায়।

চন্দ্রমণি ভয়ে ভাবনায় বিহ্বল হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কি যে ক'রবে ভেবে পায় না। সব রাগ এবং রোষ গিয়ে পড়ে নিজেরই উপর। কেন ম'রতে সে ঐ দুরন্ত ছেলেকে নিয়ে বেরিয়েছিল ? ছেলেটা পাঠশালায় গেলে যদি বেরুতো তবে আর এই বিপদে প'ড়তে হ'তো না। এমনিও বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে অমনিও নয় যেত। কিন্তু মাঠের মাঝখানে একি বিড়ম্বনা!

গদাধর মাকে আরো ভাবিয়ে ও শঙ্কিত ক'রে পীরের স্থানে এসে দাঁড়ায়, আর চন্দ্রমণি ভীতি-বিহ্বল নেত্রে উদ্‌গ্রীব হ'য়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে ও আকুল মিনতি ক'রে বলে, গদাই! চ'লে আয় বাবা। আর যেও না। যেতে নেই। অপরাধ হবে। ব'লতে ব'লতে পুত্রের দিকে ব্যস্ত হ'য়ে এগিয়ে যায়।

গদাধর কিন্তু মৃত্তিকা-নির্ম্মিত, বিচিত্র রঙে রঞ্জিত হাতী, ঘোড়া কিছুই

স্পর্শ করে না। এমন কি সেগুলোর দিকে একবার ফিরেও তাকায় না। পীরের বেদীতলে এসে চক্ষু মুদে আসনপিঁড়ি হ'য়ে বসে।

গদাধরের রকম সকম দেখে চন্দ্রমণি প্রথমে ভাবে এও বুঝি একরকম খেলা। পীরের কোন জিনিষ স্পর্শ ক'রতে না দেখে আশ্বস্ত হয়। কিন্তু নিকটে এসে ছেলেকে বাহ্যজ্ঞান রহিত ও স্পন্দনহীন হ'য়ে ব'সে থাকতে এবং বুক ও মুখ আরক্তিম দেখে ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ে। জনমানবহীন দ্বিপ্রহরে এই তেপান্তরের মাঠে ছেলেকে নিয়ে কি যে ক'রবে ভেবে পায় না। সেই সঙ্গে মনে পড়ে আঁতুড় ঘরে এই রকম নিঃস্পন্দ হ'য়ে যাওয়ার কথা। সেই কথা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বশরীর ঠকঠক ক'রে কাঁপতে থাকে। হাত পাও অবশ হ'য়ে আসে। নিজেরই বাহ্যজ্ঞান লোপ হবার মত হয়। অনেক কষ্টে সে ভাবটা দমন ক'রে ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে ডাকে, বাবা গদাই! ও গদাই! গদাই রে! ডাকে বটে কিন্তু কোন সাড়া পায় না।

ভয়ে চন্দ্রমণির মাথা ঘুরে যায়। চোখে অন্ধকার নামে, তার সঙ্গে নামে জল। আর আত্মসম্বরণ ক'রে থাকতে পারে না। নারীসুলভ ব্যাকুলতা ক্রন্দন হ'য়ে বেরিয়ে আসে। হাউ মাউ ক'রে কাঁদতে কাঁদতে সত্যপীরের উদ্দেশ্যে বলে, বাবা সত্যপীর! এ তুমি আমার কি ক'রলে? এখন আমি কি করি? ব'লতে ব'লতে উন্মাদিনীর মত ছুটে এসে গদাধরের গায়ে হাত দিয়ে ক্রন্দন-বিজড়িত কণ্ঠে গভীর উৎকণ্ঠা নিয়ে পুনরায় ডাকে, গদাই! বাবা গদাই!

তারপর সত্যপীরের উদ্দেশ্যে মিনতি ক'রে কাঁদতে কাঁদতে বলে, ঠাকুর! আমার গদাইকে ভাল ক'রে দাও। তোমার আমি পূজো দেবো। ব'লে গদাধরকে মৃদু ধাক্কা দিতে দিতে সমভাবে ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকে, গদাই! গদাই!

চন্দ্রমণির হস্তস্পর্শে ও নাড়া পেয়ে গদাধর নিদ্রোত্থিতের মত আঁখি মেলে চায়। কিন্তু কোন কথা বলে না।

গদাধরকে আঁখি মেলে চাইতে দেখে চন্দ্রমণি আশ্বস্ত হয়। সেই সঙ্গে ভাবনাও দূর হয়। ব্যগ্রভাবে কোলে তুলে নিয়ে আবার ডাকে, গদাই! গদাই!

মার ডাকে এবার গদাই সাড়া দেয়। বলে, হুঁ।

গদাইয়ের সাড়া পেয়ে চন্দ্রমণির সব দুশ্চিন্তা দূর হয়। পুত্রকে কোলে নিয়ে আবার পথ হাঁটে ও বিচিত্র আচরণটা মনে মনে বিশ্লেষণ করে। ছেলে পীরের স্থানে গিয়ে হাতী ঘোড়া কিছুই স্পর্শ না ক'রে আসনপিঁড়ি হ'য়ে পূজোয় ব'সল কেন? আর ব'সেই একেবারে ধ্যানস্থ হ'য়ে গেল। অথচ বালক। কিবা তার জ্ঞান, আর কতটুকুই বা বোঝে? তবে কি সত্যই এ গয়ার গদাধর?

ভাবতে ভাবতে পথের ব্যবধান দূর ক'রে আনে। সম্মুখে একটা আম কাঁঠালের বাগান। বাগানটা পেরুলেই মায়াপুর। কিন্তু আবার গদাধর নামতে চায়। বায়না ধরে। বলে, মা আমাকে নামিয়ে দাও।

চন্দ্রমণি আর দ্বিরুক্তি না ক'রে পুত্রকে কোল থেকে নামিয়ে দেয়। ভাবে—এসে তো গেছে, আর কি। বাগানটা পেরুলেই বাপের বাড়ী।

গদাধর মায়ের কোল থেকে নেমে বাগানের দিকে দ্রুতপদে ছুটে যায়। তাকে দেখে বিভিন্ন গাছের ডাল থেকে হুপ্ হুপ্ ক'রে কতকগুলো মুখপোড়া হনুমান নেমে আসে।

গদাধর কিন্তু ভয় পায় না। সে মহানন্দে একটা ডাল কুড়িয়ে নিয়ে তাদের লক্ষ্য ক'রে একই ভাবে এগিয়ে যায়।

গাছের ডালে যে হনুমান ছিল আগে তা' চন্দ্রমণি লক্ষ্যও করে নি, বা ভাবতেও পারে নি। কিন্তু গদাধরকে কোল থেকে নেমে ঐ ধারে ছুটে যেতে দেখে এবং সঙ্গে সঙ্গে গাছের ডাল থেকে হনুমানগুলোকে নেমে আসতে দেখে ভয়ে শিউরে ওঠে। আপোষা বন্যজন্তু। এখনই হয় তো ছেলেটাকে কামড়ে খিমচে রক্তারক্তি ক'রে দেবে। অবোধ বালক

ব'লে কোন ক্ষমা ক'রবে না। তাই তারস্বরে ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে চীৎকার ক'রে বলে, গদাই! যাস্‌নে, যাস্‌নে, ফের—ফের।

গদাধর মার কথায় কর্ণপাত না ক'রে একই ভাবে এগিয়ে যায়। হনুমানগুলোও লাফাতে লাফাতে তার দিকে এগিয়ে আসে। গদাধর ছড়ি তোলে। সঙ্গে সঙ্গে একটা হনুমান হাত থেকে ছড়িখানা কেড়ে নিয়ে দৌড় দেয়। গদাধরও তাকে লক্ষ্য ক'রে ছোটে। অন্যান্য হনুমান-গুলো তার পিছু পিছু ছোটে।

চন্দ্রমণি ভয়ে চোখ বোজে। কি যে ক'রবে ভেবে পায় না। চীৎকার ক'রে যে কারো সাহায্য চাইবে তারও উপায় নেই। কারণ একে বেলা দ্বিপ্রহর তার উপরে আশেপাশে কোন জনমানবের সাড়া নেই, লোকালয়ও খানিকটা দূরে। তার কণ্ঠের আর্ত্তনাদ লোকালয় পর্য্যন্ত পৌঁছাবে কিনা সন্দেহ। আর যদিও পৌঁছায় কেউ আসতে না আসতে ছেলেটাকে কাঁমড়ে খিমচে একেবারে অর্দ্ধমৃত ক'রে ফেলবে। তাই অপরের সাহায্য চাওয়ার বাসনা ত্যাগ ক'রে রঘুবীরকে স্মরণ ক'রে বলে, ঠাকুর! তুমি রক্ষা কর। আবার আঁখি মেলে ভয়ে ভয়ে চায়। দেখে—হনুমানগুলো গৃহপালিত জন্তুর মত তার সঙ্গে খেলা ক'রছে। কোন রকম হিংস্র আচরণ নেই। যেন কত চেনা, একেবারে পোষমানা।

চন্দ্রমণি দেখে শুধু বিস্মিতই হয় না রোমাঞ্চিত হ'য়ে ওঠে। যে জন্তু মানুষ দেখলেই মুখ বিকৃত করে, দাঁত ভেংচায়, তেড়ে আসে তাদের এ কি ব্যবহার? কোন্ মন্ত্রবলে তারা তার শিশুপুত্রের কাছে বশ্যতা স্বীকার ক'রল?

দৃষ্টি ক্রমেই বিস্ময়ে বিস্ফারিত হ'য়ে ওঠে। আর সেই বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দেখে—হনুমানের সঙ্গে যে খেলা ক'রছে সে তার পুত্র গদাই নয়, যেন বালকবেশী রামচন্দ্র। কিছুতেই আর মনে হয় না তার গর্ভজাত পুত্র। এই মাটির মানুষ। ষড়রিপুর অধীন। বাসনা আর লালসা নিয়ে পৃথিবীতে এসেছে। নারীর নগ্নদেহ দেখেছে, তবে চির জীবনের মতই

দেখেছে। কামনা ও কৌতূহলের চির সমাধি দিয়েছে। ভাবতে ভাবতে ভাবে ও ভক্তিতে চোখ দিয়ে হু হু ক'রে জল নেমে আসে।

●

ত্রিশ

এরপর চন্দ্রমণির পুত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সব শঙ্কা ও সংশয় দূর হয়। মনের বিষণ্ণ ভাবও মিলিয়ে যায়। আর মনে হয় না এই পুত্র হ'তে স্বামীর বংশ কলঙ্কিত হবে। উন্নত শির ধূলায় লুটাবে।

তবে পুত্রের চরিত্র ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যতখানি নিঃসন্দেহ হয়, ততখানি আবার ভাবনা জাগে সংসারানুরাগী হওয়া বিষয়ে। বাল্যকালেই যার দেবদেবীর উপর এত ভক্তি আর বিশ্বাস, বড় হ'লে তা' বহুগুণে বৃদ্ধি হবে এবং হওয়াও স্বাভাবিক। আর সেই ভক্তি ও বিশ্বাস নিয়ে গৃহত্যাগী হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। তাই একটা ভাবনা গিয়ে আর একটা এসে উপস্থিত হয়। স্বামীর মুখে শুনেছেও তাই। গৌতম বুদ্ধ, ভগবান শঙ্কর, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, কেউ গৃহী হন নি। সবাই সংসার ত্যাগ ক'রে গিয়েছিলেন, এবং তাঁদেরও বাল্যজীবনেই ঈশ্বরের উপর এমনি অনুরাগ জন্মেছিল। তাই একদিন জননী ও জায়াকে পরিত্যাগ ক'রে বৈরাগী হ'য়ে গেলেন। তাদের ব্যাকুল ক্রন্দন, আকুল মিনতি কিছুই আর পিছু টেনে রাখতে পারল না। সব উপেক্ষা ক'রে চ'লে গেলেন। তার গদাই যদি তাকে কাঁদিয়ে এমনি ক'রে চ'লে যায়।

আর ভাবতে পারে না। ভয়ে শিউরে ওঠে। না না—গদাইয়ের ঈশ্বরানুরাগে দরকার নেই, সে কামাসক্ত হ'য়েই সংসারে থাক। দেখুক নারীর নগ্নদেহ। ভোগ লালসায় ভেসে যাক, কিন্তু সন্ন্যাস যেন না নেয়। পুত্রের সন্ন্যাসীবেশ সহ্য ক'রতে পারবে না। পারবে না তাকে ভস্মাচ্ছাদিত অবস্থায় দেখতে। হ'তে চায় না সে ভগবানের জননী।

চায় না তার অক্ষয় কীর্ত্তি—অবিনশ্বরতা। আর পাঁচজনের মতনই দেখতে চায় গৃহী হ'তে। পুত্র কন্যার জনক হ'য়ে সংসার ক'রতে।

কিন্তু অল্প ক'দিন পরেই পুত্রের কোনরূপ ভাব ও ভাবান্তর না দেখে, এবং আগের মতনই হেসে খেলে বেড়াতে দেখে নিশ্চিন্ত হয়।

এমনি ক'রে গদাধর বাপ, মার মনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার ক'রে ক্রমেই স্বাধীন এবং বেপরোয়া হ'য়ে ওঠে। বাড়ীর চেয়ে বাইরে বাইরে সময়টা কাটে বেশী। পড়াশুনার চেয়ে মাটি দিয়ে দেবদেবীর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ ক'রে আনন্দ পায় অনেক। তার সঙ্গে আবার আর একটি মোহ জন্মেছে গানের উপর। তা সে বাউলের গানই হোক আর বোষ্টমের গানই হোক। তন্ময় হ'য়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোনে। শোনার সঙ্গে সঙ্গে কথা ও সুর সব মুখস্ত হ'য়ে যায়। বাউল চ'লে গেলে অনুরূপ ভাবে আপন মনে গায়। নিজের গানে নিজেই মোহিত হ'য়ে যায়। তার সঙ্গে মুগ্ধ হয় ক্ষুদিরাম ও চন্দ্রমণি।

ক্ষুদিরাম পুত্রের অদ্ভুত অনুকরণ করার শক্তি ও মেধা দেখে যেমন একেধারে মুগ্ধ হয়, তেমনই হতাশ হয় লেখাপড়ায় অবহেলা দেখে। পড়াশুনা সে করে বটে কিন্তু নিরুপায় হ'য়ে। না ক'রতে হ'লেই যেন বেঁচে যায়। নেহাৎ মা, বাবা, দাদারা অসন্তুষ্ট হবে তাই। মোটামুটি যদিও লিখতে প'ড়তে পারে, বা কিছুটা শিখেছে, কিন্তু গণিত সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন। কোন আগ্রহই নেই। কেন যে পড়াশুনায় এমন বিতৃষ্ণা ক্ষুদিরাম মনে মনে বিশ্লেষণ ক'রে কোন কারণই খুঁজে পায় না। অথচ ছেলে তার বোকা নয়। বেশ চালাক চতুর। যা' দেখে, যা' শোনে তা' আর ভোলে না। অবশ্য যদি তার মনের মত হয়। এই গ্রামের কুম্ভকারদের বাড়ী গিয়ে এই বয়সেই কেমন প্রতিমা নির্ম্মাণ ক'রতে, ছবি আঁকতে শিখেছে। একটা গান অথবা স্তোত্র একবার দু'বার

শুনলে অবলীলাক্রমে শিখে নেয়। কিন্তু এই মৃৎশিল্প জাত-ব্যবসাও নয় বা কেউ তাকে হাতে ধ'রে শেখায়ও নি, চিত্রশিল্পও তাই। একমাত্র সৃষ্টির আনন্দ ছাড়া এতে আর কিছু নেই। পরবর্ত্তী জীবনে সংসারের কোন সহায়তা ক'রবে না। ক'রলেও ব্রাহ্মণ তনয়ের তা' গ্রহণ করা উচিৎ নয়। বিশেষ ক'রে তার তনয়ের। পুত্ররা খুলবে টোল, দেবে বিদ্যা, ন্যায়ের বিধান। ক'রবে কূটতর্কের মীমাংসা। অর্জ্জন ক'রবে পাণ্ডিত্য। জ্ঞানী পণ্ডিত ব'লে সমাজে সুপরিচিত হবে। এই আশা সে করে। তাতে দুঃখ মোচন হোক বা না হোক অন্ততঃ গৌরব ক্ষুণ্ণ হবে না। কিন্তু গদাধরের মতিগতি দেখে বেশ শঙ্কিত এবং হতাশই হয়।

অবশ্য গ্রাম্য পরিবেশটা উচ্চশিক্ষার অনুকূল নয়। অধিকাংশ লোকই ব্যবসায়ী, ভূ-সম্পত্তির মালিক। ব্যবসা চালাবার মত সামান্য লেখাপড়া শিখলেই এখানকার লোক যথেষ্ট মনে করে। হিসাব নিকাশ শিখে গেছে আর কি? কিন্তু তার তো কোন ব্যবসাও নেই বা জমিজমাও নেই। অতএব পুত্রদের বিদ্যাকে মূলধন ক'রে জীবিকা অর্জ্জন ক'রতে হবে। সেই বিদ্যাকে অবহেলা ক'রলে ক'রবে কি? তার উপর সঙ্গী সাথীও হ'য়েছে ভাল। গ্রামের যত রাখাল ছেলেরা তার বন্ধু। তাদের সঙ্গে মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াতে তার যে কি ভাল লাগে সেই জানে। কি ক'রে ছেলেটাকে বোঝান যায় যে রাখাল ছেলেদের সঙ্গে মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়ালে দিন চ'লবে না, ভবিষ্যৎ আছে। ভাবে বটে, কিন্তু কঠোরও হ'তে পারে না আর কিনারাও ক'রতে পারে না। মিছে ভাবনা নিয়ে দিন কেটে যায়।

গদাধর কিন্তু কিছুই ভাবে না, বা পিতার ভাবনা-কাতর মুখের দিকে চেয়েও দেখে না। সন্ধ্যার আগেই বাড়ীতে না ব'লে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে এসে বসে যাত্রার আসরে। উন্মুখ হ'য়ে থাকে আরম্ভের প্রতীক্ষায়। একবারও মনে পড়ে না যে, সে না ব'লে এসেছে। ফিরে যেতে রাত্রি ভোর হ'য়ে যাবে। দাদারা খুঁজবে। না পেয়ে ক্রুদ্ধ হবে। তারপর যে

নির্য্যাতন এবং তিরস্কার তাকে সইতে হবে......তার জন্যে এতটুকু ভয় জাগে না। সব ভুলে সে তখন দৃষ্টি বিস্ফারিত ক'রে ফেলে রাখে যাত্রা দলের সাজঘরের দিকে। কখন আসবে কানাই, বলাই, শ্রীদাম, সুদাম, বসুদাম ? রাই, ললিতা, বিশাখা ?

রাত্রি ক্রমেই বেড়ে যায়। আসরও লোকাকীর্ণ হয়। কিন্তু না, যাদের জন্যে এত লোকসমাগম তারা আর আসে না। গদাধরের ধৈর্য্য শেষ সীমায় এসে উপস্থিত হয়। একবার ভাবে, সাজঘরে গিয়ে দেখে আসে কত দেরী। উঠেও দাঁড়ায়, কিন্তু জনসমাগম দেখে কৌতূহল দমন ক'রে আবার বসে। গেলে ফিরে এসে আর জায়গা পাবে না। তার উপরে এত লোকজন পেরিয়ে যাওয়া...সে এক বিভ্রাট। কিন্তু একবারও মনে হয় না—যাক্‌গে, আর দেখবো না। বাড়ী ফিরে যাই।

পরিশেষে সব উৎকণ্ঠা এবং ব্যাকুলতার অবসান ক'রে ঐক্যতান সুরু হয়। ঢোলকের বাজনা শুনে বুকের মধ্যে গুর গুর করে। হতাশ দৃষ্টি আবার বিস্ফারিত হ'য়ে ওঠে। কৌতূহল নিয়ে পড়ে গিয়ে সাজঘরের দরজায়।

তারপর বহু আকাঙ্ক্ষিত কানাই, বলাই বেরিয়ে আসে রূপসজ্জা নিয়ে। কৃষ্ণের অঙ্গে ধড়া চূড়া! মাথায় পটে দেখা ছবির মতন ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া একমাথা কোঁকড়া চুল। কাঁজল টানা ডাগর চোখ। গোলাপ রাঙা অধর। হাতে শিখি পাখায় শোভিত মুরলী।

বলরামের বেশও ঐ রূপ। শুধু মুরলীর বদলে হাতে হল। এরপর আসে বিভিন্ন সাজসজ্জায়, সুবল, শ্রীদাম, সুদাম, বসুদাম। বৃন্দাবন-বিহারীর যত লীলাসঙ্গী। অভিনয়ও সুরু করে।

গদাধর মুগ্ধ হ'য়ে যায়। দৃষ্টি পলক হারিয়ে প'ড়ে থাকে কৃষ্ণের মুখের উপর। মনে হয় না—এরা এই পৃথিবীর মানুষ। তাদের মতন। পেটের দায়ে কেউ কৃষ্ণ, কেউ বলরাম সেজেছে। সে যা ব'লছে সব মুখস্ত করা কথা। এদের মধ্যে ঐ ভাবের এক কণাও নেই।

না থাক। মন তার মুগ্ধ হ'য়ে ঐ কৃষ্ণকে অনুসরণ ক'রে চলে যায় বৃন্দাবনে, যমুনাতীরে। তমালকুঞ্জের ছায়ায় ছায়ায়। ভাবে ভক্তিতে হৃদয় কানায় কানায় ভ'রে ওঠে। কথাগুলো মনে দাগ কেটে বসে। সেই সঙ্গে গান।'

এরপর আসে শ্রীরাধা। গদাধরের স্তিমিত আঁখি আবার ডাগর হ'য়ে ওঠে। শ্রীরাধা যে তারই মতন একটা ছেলে মনে ক'রতে পারে না। অঙ্গে ঘাগরার মতন ক'রে একখানা কাপড় পরা। মাথায় মেয়েদের মতন একমাথা চুল। কাজল টানা ডাগর চোখ। অধর গোলাপী। কাঁখে গাগরী।

গদাধর বিস্মিত ও মুগ্ধ হয় তার কণ্ঠস্বর শুনে। অঙ্গ ভঙ্গী দেখে। একেবারে হুবহু যেন নারী। কিছুতেই মনে হয় না—একজন পুরুষ ঐ চরিত্রে রূপ দিচ্ছে। আসরে আসার আগে ব'সে ব'সে বিড়ি টানছিলো। মন যেন ওসব বিচার বিশ্লেষণও ক'রতে চায় না। শুধু মুগ্ধ ও বিস্মিত হ'য়েদেখে যায়, ও শুনে যায়।

কৃষ্ণের উপর শ্রীরাধার অনুরাগ। প্রেমে রাই হয় উন্মাদিনী। ভুলে যায় ঘর সংসার, শাশুড়ী, ননদিনীর কথা। গভীর নিশীথে আসে অভিসারে। যমুনাতীরে, কদমতলে। জ্যোছনাপ্লাবিত রাত্রি রাঙা করে তোলে, অনুরাগে। কদমের মালা কৃষ্ণের গলায় পরিয়ে সুরে ও ছন্দে বলে—

"জনম জনম হাম ও রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।"

বালক হ'লে কি হবে সব বোঝে। বুকে দাগ কেটে বসে। অভিভূত হ'য়ে যায়। শ্রীরাধার সঙ্গে সেও ভুলে যায় বাড়ীর কথা, মা বাপ, ভাই বোনেদের কথা। তিরস্কার, লাঞ্ছনা, অনুশাসন।

তারপর আসে বিরহ। অক্রূর এসে কৃষ্ণকে নিয়ে যায় মথুরায়।

শ্যাম বিরহে রাই হয় পাগলিনী। গানে গানে বলে—

"মোর চাঁদ যদি ডুবিল গো সখী
কেন জাগে চাঁদ আকাশে,
মালার কুসুম শুকাইল যদি
সুরভি কেনগো বাতাসে ?"

ললিতা, বিশাখা, সান্ত্বনা দেয়। গানে গানে বলে—

"মিছে হায় সখী কাঁদা,
ও ফুলমালায় রহিবে না হায় নিঠুর কানাই বাঁধা।"

কিন্তু কৃষ্ণ আর ফিরে না। চোখের জলে শ্রীরাধার রজনী অবসান হয়। আর এধারেও রজনী অবসান হ'য়ে আসে। ঢোলকে সমাপ্তির আঘাত পড়ে। হৈ হৈ ক'রে সবাই উঠে দাঁড়ায়। আসরের মধ্যে কোলাহল সুরু হয়।

গদাধরের কাণে সে কোলাহল ঢোকে না। সে তখন চোখে জল ও কৃষ্ণের বিরহ নিয়ে বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ব'সে থাকে। মনে মনে শ্রীরাধার মত ব্যাকুলতা নিয়ে খুঁজে ফেরে কৃষ্ণকে। মন কামারপুকুর ছেড়ে চ'লে যায় মথুরায়।

কৃষ্ণকে খুঁজে আনার আগে তার খোঁজে রামেশ্বর এসে দাঁড়ায় পিছনে। সজোরে কাণে একটা পাক দিয়ে বলে, এখনো ব'সে আছিস্ কেন ? যাত্রা ভেঙ্গে গেছে দেখছিস্ নে ?

কাণ মোলা খেয়ে গদাধর চম্‌কে ওঠে। ভাব বিনষ্ট হয়। মৃদু আর্ত্তনাদ ক'রে ভীত ও কুণ্ঠিত হ'য়ে উঠে দাঁড়ায়।

রামেশ্বর কাণটা ছেড়ে দিয়ে তীব্র ভর্ৎসনার সঙ্গে বলে, বলা নেই কওয়া নেই যাত্রা শুনতে এসেছে। একেবারে লায়েক হ'য়ে গেছে ! তারপর হাতখানা ধ'রে একটা টান দিয়ে একই ভাবে আবার বলে, চলো, বাড়ী চলো ! আজ তোমার কি হয় দেখ্‌বে ! যত কিছু না বলা

হয়……কথাটা অসমাপ্ত রেখে গদাধরের হাত ধ'রে আসর থেকে বেরিয়ে আসে।

গদাধর নির্ব্বিকার। এতটুকু ভয় বা ভাবনা মনে রেখাপাত করে না। শুধু ভাবে…হোক দেহের উপর নির্য্যাতন। তার জন্যে কোন দুঃখ নেই, কিন্তু সেই ভয়ে এ সুযোগ যদি হারাতো তবে এমন সুন্দর গান শুনতে পেত না। কৃষ্ণ আর শ্রীরাধাকেও চিনতে পারতো না। পটে আঁকা কৃষ্ণকে সে দেখেছে। সে কৃষ্ণ ছিল শুধুই ছবি। তার চরিত্র, লীলা, সবই ছিল অজানা। সে তখন ছবির দিকে চেয়ে চেয়ে ভেবেছে…এ কে ? কেন এর ছবি প্রায় প্রতি ঘরে ঘরে ? এত সমাদর কেন ? কি জন্যে সকলে পূজা করে ?

এতদিনে সে কৌতূহলের অবসান হ'ল। তারও মন কৃষ্ণানুরাগী হ'য়েছে। নির্য্যাতন এবং পীড়নের চিন্তা ছাপিয়েও কৃষ্ণ বিরহ প্রভাব বিস্তার ক'রে আছে। শুধু তার মনে হ'তে থাকে—ছোড়দা যদি না এসে প'ড়তো তবে সে ঠিক কৃষ্ণকে খুঁজে এনে শ্রীরাধার সঙ্গে মিলন করিয়ে দিতে পারতো। ছোড়দা এসেই সব পণ্ড ক'রে দিল। শ্রীরাধার বিরহ বেদনার অবসান ক'রতে দিল না। যাক্—বাড়ী গিয়ে একটা হেস্ত-নেস্ত হবার পর সে শ্রীরাধার বেদনা দূর ক'রে দেবে। কৃষ্ণকে খুঁজে আনবেই। ভাবতে ভাবতে রামেশ্বরের সঙ্গে বাড়ী ঢোকে।

ঠিক সেই সময় ক্ষুদিরাম প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে বাড়ী আসে। রামেশ্বরের সঙ্গে গদাধরকে দেখে থম্‌কে দাঁড়ায়। ক্রোধ ও বিরক্তিতে মুখখানা গম্ভীর হ'য়ে ওঠে। গদাধরের মুখের উপর জ্বলন্ত দৃষ্টি ফেলে, নির্ব্বাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ভুলে যায় পুত্র তার দেবতার অংশ সম্ভূত।

রামেশ্বর গদাধরের হাতখানা ছেড়ে দিয়ে পিতার ক্রোধান্ধ মুখের দিকে চেয়ে টিপ্পুনী কেটে বলে, এই যে বাবা গদাই। সন্ধ্যের সময় বাড়ী না এসে যাত্রার আসরে গিয়ে ব'সেছিলো। ভেঙ্গে গেছে তবু হুঁস নেই। তন্ময় হ'য়ে ব'সে ব'সে কাঁদছিলো। আমি না গেলে কতক্ষণে যে আসতো……

রামেশ্বরের কথা শুনে ক্ষুদিরামের সব ক্রোধ জল হ'য়ে যায়। জ্বলন্ত দৃষ্টি নিভে আসে। তার পরিবর্ত্তে বিস্ময়ে, স্নেহে, করুণায় আঁখি ভাব-বিহ্বল হ'য়ে ওঠে। আর সেই চোখ দিয়ে দেখে—মুখখানা প্রভাতের শিশির ভেজা ঘাসের মত। বেদনায় সিক্ত। নয়নে কোথাও ভয়ের চিহ্ন নেই। দৃষ্টি যেন ব্যথায় উদাস। অপার্থিব। কি এক ভাব যেন তখনও জাল বিস্তার ক'রে আছে। হয়তো কোন অলকবিহারীর সন্ধানে ছুটেছে।

রামেশ্বরের সাড়া পেয়ে চন্দ্রমণি ঠাকুরঘর ছেড়ে ব্যস্ত হ'য়ে বেরিয়ে আসে। গদাধরের মুখের উপর বিস্মিত ও বিস্ফারিত দৃষ্টি ফেলে ভৎর্সনার স্বরে বলে, ধন্যি ছেলে বাবা! মনে এতটুকু ভয় ডর নেই। বলা নেই, কওয়া নেই সারাটা রাত একেবারে কাটিয়ে দিয়ে এল। একে নিয়ে কি যে করি……

এমন সময় রামকুমারও প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে বাড়ী ঢোকে। গদাধরকে প্রাঙ্গণের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রাগে জ্বলে ওঠে। এই ভাইটার জন্যে দুর্ভাবনায় দুশ্চিন্তায় বাপ মার কাল সারা রাত্রি ঘুম হয় নি। এক রকম বিনিদ্র রজনীই কাটিয়েছে। শাসনের অভাবে এত বাড় বেড়েছে। তা' ছাড়া এই বয়সেই যদি এ রকম বেপরোয়া হয় তবে আর একটু বড় হ'লে সে তো পারিবারিক নিয়ম, শৃঙ্খলা, পরিবারস্থ কাকেও মানবে না। আপন খেয়াল-খুশীতে চ'লবে। আর এই সব ভেবে রামকুমার বাপ মার সম্মুখেই গদাধরের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে ক্রুদ্ধস্বরে বলে, একেবারে সাবালক হ'য়ে গেছ—না? যা' খুশী তাই ক'রবে। ভেবেছ কি?

আরো কিছু ব'লতে যাচ্ছিল। ক্ষুদিরাম বাধা দিয়ে বলে, যাক্‌গে যাক্‌গে! আর কিছু বলিস্ নে বাবা! আমি সব বুঝিয়ে ব'লছি।

পিতার কথায় রামকুমার নিরস্ত হয়। কিন্তু ক্ষুণ্ণমনে ঘরে ঢোকে। রামেশ্বরও একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে প্রাতঃকৃত্যাদি সারতে বেরিয়ে যায়। গদাধর নির্ব্বাক হ'য়ে নতমস্তকে একই ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে।

তার উদাস এবং কুণ্ঠিত মুখের দিকে চেয়ে ক্ষুদিরাম বলে, যাও এখন হাতমুখ ধোও গে।

পিতার আদেশ পেয়ে গদাধর হাতমুখ ধুতে যায়। ক্ষুদিরাম কাপড় ছেড়ে ঠাকুরঘরে গিয়ে ঢোকে।

●

একত্রিশ

দ্বিপ্রহরে খাওয়া দাওয়া ক'রে উঠতেই ধনী বাড়ীর ভিতর ঢুকতে ঢুকতে জিজ্ঞাসা করে, বৌদি, গদাই ফিরেছে ?

চন্দ্রমণি উচ্ছিষ্ট বাসনগুলো নিয়ে উঠানের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলে, হ্যাঁ। সকালবেলা রামেশ্বর গিয়ে যাত্রার আসর থেকে ধ'রে এনেছে।

ধনী রান্নাঘরের দাওয়ার উপর উঠে এসে একখানা পিঁড়ি টেনে নিয়ে ব'সে বলে, আসরের মধ্যেই বুঝি ঘুমিয়ে প'ড়েছিলো ?

ধনীর কথা শুনে গদাধর চোখ ড'লতে ড'লতে শোবার ঘর থেকে রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে আসে।

গদাধরকে দেখে ধনী বিস্মিত কণ্ঠে বলে, ওমা! এই তো গদাই! তারপর গদাধরকে জিজ্ঞাসা করে, হ্যাঁ বাবা! পাঠশালায় যাও নি ?

গদাধর উত্তর দিবার আগেই চন্দ্রমণি মুখ ধুতে ধুতে বলে, ওমা! কাল সারা রাত্রি জেগেছে তাই আর যেতে দিই নি। পুত্রের দিকে চেয়ে বলে, ছেলেকে ঘুমোতে ব'ললাম তা' উনি উঠে এলেন। এত দুরন্ত হ'য়েছে……

গদাধর জবাব দিবার আগে ধনী হাসতে হাসতে বলে, কত ঘুমাবে বৌদি! যাত্রা কি আর দেখেছে, প'ড়ে প'ড়ে ঘুমিয়েছে।

গদাধর রান্নাঘরের দাওয়ায় উঠে এসে ধনীর সম্মুখে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ ক'রে বলে, হুঁ—ঘুমিয়েছি বৈকি!

গদাধরের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রসন্ন বাড়ীর ভিতর ঢুকে চন্দ্রমণির উদ্দেশ্যে বলে, কি গো বাড়ীর গিন্নী! বলি খাওয়া দাওয়া সব চুকল?

চন্দ্রমণি মুখ ধোয়া শেষ ক'রে আবার রান্নাঘরের দিকে এগুতে এগুতে বলে, হ্যাঁ, এই চুকল। আয় বোস! ব'লে চন্দ্রমণি দাওয়ায় উঠে আসে। পিছু পিছু প্রসন্নও উঠে আসে।

চন্দ্রমণি হস্তস্থিত জলের ঘটিটা দাওয়ার একধারে নামিয়ে রেখে পুত্রবধূর উদ্দেশ্যে বলে, বৌমা! একখানা মাতুর বিছিয়ে দাও।

পুত্রবধূ মাতুর বিছিয়ে দেয়। প্রসন্ন ও ধনী উভয়ে বেশ পরিপাটী ক'রে বসে। চন্দ্রমণিও ঘর থেকে পানের ডাবরটা এনে ওদের পাশে বসে।

ধনী গদাধরের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করে, ঘুমাও নি? তবে কি দেখেছ বলো তো শুনি?

গদাধর জবাব দিবার আগে প্রসন্ন ধনীর দিকে চেয়ে কৌতূহল ভরে জিজ্ঞাসা করে, কি?

ধনীকে জবাব দিবার সুযোগ না দিয়ে চন্দ্রমণি পান সাজতে সাজতে বলে, আর বলিস কেন। ছেলেটা একেবারে জ্বালিয়ে মারল। না ব'লে কয়ে পাইনদের বাড়ী যাত্রা শুনতে গেছিল। সারা রাত্রি ভেবে মরি। দু'চোখ এক ক'রতে পারি নি। আর শুধু কি আমি। উনি পর্য্যন্ত জাগা।

প্রসন্ন দৃষ্টি বিস্ফারিত ক'রে বিস্মিত কণ্ঠে বলে, ওমা, তাই নাকি! সারা রাত্রি ব'সে ব'সে যাত্রা শুনেছে?

এইবার ধনী প্রসন্নর দিকে চেয়ে উপেক্ষাভরে বলে, যাত্রা কি আর শুনেছে। প'ড়ে প'ড়ে ঘুমিয়েছে। ছেলেমানুষ···কিই বা বোঝে। শুধু হুজুগে প'ড়ে···

ধনীর মুখ থেকে কথাটা কেড়ে নিয়ে গদাধর প্রতিবাদ ক'রে বলে, হুঁ—ঘুমিয়েছি বই কি! সব দেখেছি।

ধনী গদাধরের দিকে চেয়ে বলে, আচ্ছা বলো না কি দেখেছ ?

গদাধর আর কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না ক'রে যেমন ভাবে কৃষ্ণ আসরে এসে অভিনয় সুরু ক'রেছিলো ঠিক তেমনি ক'রে অভিনয়ের ভঙ্গিতে ব'লতে আরম্ভ করে।

ধনী ও প্রসন্ন কাল যাত্রা দেখেছে। উভয়ের মনের মধ্যে ছবির মত আঁকা হ'য়ে আছে। বিশেষ বিশেষ দৃশ্যের কৃষ্ণ ও রাধিকার উক্তিও কিছু কিছু মনে আছে, কিন্তু গদাধরকে হুবহু অঙ্গভঙ্গিসহ ব'লতে দেখে বিস্ময়ে শুধু স্তম্ভিত হয় না; বাক্‌শক্তি হারিয়ে অভিভূত হ'য়ে থাকে। স্থান, কাল সব যেন ভুলে যায়।

সেই সঙ্গে চন্দ্রমণিও ছেলের অনুকরণ করার ও স্মরণ রাখার শক্তি দেখে মুগ্ধ হ'য়ে যায়। সেও নির্ব্বাক হ'য়ে ব'সে থাকে। বেলা যে অপরাহ্ন হ'য়ে যাচ্ছে তা' কারোই হুঁস থাকে না।

গদাধর আপন ভাবে বিভোর হ'য়ে একের পর এক বিভিন্ন চরিত্র যথাযথভাবে অভিনয় ক'রে চ'লে যায়। এমন কি শ্রীরাধার বামাকণ্ঠ ও হাবভাব সহ।

চন্দ্রমণি, ধনী, প্রসন্ন কারো মনে হয় না—এ তাদের গদাইয়ের কণ্ঠস্বর। তারপর গান শুনে আরো মোহিত হয়। কাল রাত্রে যাত্রার আসরের চেয়েও ভাল লাগে! মনে হয় এমনধারা গান জীবনে কখনো শোনে নি। তাদের গদাই যে এত ভাল গান গাইতে পারে এমন মধুর কণ্ঠস্বর তা তারা কল্পনাই ক'রতে পারে নি। শুনে যেন আশ মেটে না।

গদাধর শ্রীরাধার বিরহ বেদনার রূপ দিতে দিতে নিজেই অভিভূত হ'য়ে পড়ে। স্থান, কাল, পাত্র সব ভুলে যায়। চক্ষু অশ্রুসজল হ'য়ে ওঠে। কণ্ঠরোধ হ'য়ে আসে, মনে থাকে না যে অভিনয় ক'রছে।

সম্মুখে তার শ্রোতা ব'সে আছে, আর তারা সকলেই জননীসমা। সব কিছু বিলীন হ'য়ে কৃষ্ণের বিরহে অন্তর কেঁদে ওঠে। শেষ পর্য্যন্ত কেঁদেও ফেলে। আর অভিনয় করা সম্ভব হয় না।

গদাধরের চোখের জলে সকলের চক্ষুই অশ্রুসজল হ'য়ে ওঠে।

ধনী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে অশ্রুভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলে, সত্যিই বৌদি, গদাই তোমার সামান্য ছেলে নয়, একেবারে হুবহু নকল করে এনেছে।

ধনী থামতেই প্রসন্ন বলে, আর গান যা গাইল কালকের যাত্রাদলের কেষ্ট রাধিকার চেয়েও ভাল। তবুতো ওদের গানের সঙ্গে অনেক বাদ্যি ছিল। আর গদাই খালি গলায় গাইল। কিন্তু আমার তো কালকের চেয়েও ভাল লাগ্‌ল। আরও শুনতে ইচ্ছে ক'রছে।

ধনী সায় দিয়ে বলে, আমারও! তারপর গদাধরের দিকে স্নেহ করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে বলে, গদাই! ঐ গানটা আর একবার গাতো।

এই আলোচনার ভিতর গদাধর ধীরে ধীরে প্রকৃতিস্থ হ'য়ে ওঠে। ভাবও মিলিয়ে যায়। সেই সঙ্গে কেমন যেন লজ্জা বোধ করে। তাই আর না দাঁড়িয়ে বা কোন জবাব না দিয়ে রান্নাঘর ছেড়ে চ'লে আসে।

চন্দ্রমণি ব্যস্ত হ'য়ে বলে, আজ আর না, বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে। কাল আবার শুনিস।

ধনী দাঁড়িয়ে উঠে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে, সত্যি বৌদি! গদাই মন দিয়েই শুনেছে, ও দেখেছে। তাই ওর সব মনে আছে। গানগুলো সুরসুদ্ধু কেমন তুলেছে। আর মনেও তো ঠিক রেখেছে!

ধনীর দেখা দেখি প্রসন্নও উঠে দাঁড়ায়। ধনীর দিকে চেয়ে বলে, ভুলে যাচ্ছিস্ কেন ধনী যে, ছেলেটা আমাদের ঘরের ছেলে নয়। দেবতার অংশ থেকে জন্ম হ'য়েছে। প্রসঙ্গটা ছেড়ে দিয়ে বলে, না, আর না, আজ অনেকক্ষণ বসা হ'ল। মা আবার হয় তো বকাবকি ক'রবে। ব'লে

দাওয়া থেকে নেমে আসে। তারপর চন্দ্রমণির দিকে চেয়ে বলে, আজ আসি খুড়ি।

সঙ্গে সঙ্গে ধনীও প্রসন্নকে অনুসরণ ক'রে নেমে এসে বলে, আমিও আসি।

ক্রমে ক্রমে গদাধরের ক্ষমতা ও কণ্ঠ মাধুর্য্য সারা গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। দ্বিপ্রহরে গ্রামের অনেক মহিলাই চন্দ্রমণির বাড়ী আসে। গদাধরকে গান শুনাতে অনুরোধ করে।

গদাধর তার খাতির এবং সমাদর দেখে বেশ খুশী হয়। মনে মনে গর্ব্বও অনুভব করে। সে কটা গানই বা জানে, কিন্তু তাতেই তার এত সমাদর। অনেক গান শিখলে না জানি কি হ'ত? অনুরোধে প'ড়ে সে অবশ্য গান করে। সকলের ভালও লাগে। কিন্তু তার একই গান রোজ রোজ গাইতে ভাল লাগে না। তাই অনেক সময় গাইতে চায় না।

কিন্তু যারা আসে তারা মুড়ি, মুড়কী, চিড়ের মোয়া, নারকেল নাড়ু, ক্ষিরের নাড়ু, তিলের ছাঁচ ইত্যাদি অনেক মুখরোচক খাবার আনে। অনিচ্ছা প্রকাশ ক'রলে হাতের মধ্যে সে গুলো গুজে দিয়ে বলে, লক্ষ্মী সোনা আমার! মাণিক আমার! গাও, শুনি। কাল তোমার জন্যে আর একটা নূতন খাবার আন্‌বো। অন্যান্য শ্রোতারাও সেই কথার জের টেনে বলে, আমরাও আনবো।

এক গাদা মুখরোচক খাবার ও তার সঙ্গে মধুর আপ্যায়ণ এবং আগামী কালের আশায় গদাধর অনিচ্ছা ত্যাগ ক'রে সেই পুরানো গানই সুরু করে।

প্রায় প্রতিদিনই গান গাইবার ফলে কণ্ঠ অনেক স্বচ্ছ, সুন্দর এবং সাবলীল হ'য়ে ওঠে। তার সঙ্গে লজ্জা ও জড়তাও দূর হ'য়ে যায়।

স্থর যেন যাতুকরের মত কণ্ঠে এসে খেলা করে। কোথাও এতটুকু বাধে না বা বিকৃত হয় না। যেন দীর্ঘ সাধনা ক'রে সে সরস্বতীর আশীর্ব্বাদ লাভ ক'রেছে।

আর সেই স্থর-লহরী যখন পর্দ্দায় পর্দ্দায় উঠে বাতাসে বাতাসে ছড়িয়ে যায় তখন অনেককেই আকৃষ্ট ক'রে আনে। তারা বাড়ীর ভিতর ঢুকে তন্ময় হ'য়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোনে। চিত্ত ভাবে বিভোর হ'য়ে যায়। পুরুষরা ভুলে যায় এটা গৃহস্থ বাড়ী, সাড়া না দিয়ে বাড়ীর ভিতর ঢোকা যে নীতিবিরুদ্ধ সেটা তাদের মনে থাকে না।

তাই গান শেষ হ'তেই হাত জোড় ক'রে বিনীত ভাবে বলে, কিছু যেন মনে ক'রবেন না মাঠাকুরুণ! গান শুনে আর না ঢুকে পারলাম না। আহা! মা সরস্বতী যেন কণ্ঠে বিরাজ ক'রছেন। এমন গান জীবনে শুনি নি। তারপর গদাধরের দিকে চেয়ে অনুরোধ ক'রে বলে, আর একটা গাওনা শুনি।

গদাধর কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না ক'রে বলে, আর গান জানি নে।

লোকটাও নাছোড়বান্দা। মনে তার নেশা লেগেছে। সাড়া না দিয়ে যখন সে বাড়ীর মধ্যে ঢুকেইছে তখন স্থরের স্থধা আকণ্ঠ পান না ক'রে যাবে না। তা' বেলা সন্ধ্যেই হোক আর কাজের ক্ষতিই হোক। তাই মিনতি ক'রে বলে, তবে যে গানটা গাইলে সেইটাই না হয় আর একবার গাও।

অত্যধিক লোকসমাগম দেখে ও স্বামী বিরক্ত হবে ভেবে চন্দ্রমণি ব্যস্ত হ'য়ে বলে, না না, আজ আর নয়। বেলা গড়িয়ে গেল। আমাদের আবার সংসারের কাজকর্ম্ম আছে। ব'লে উঠে পড়ে।

চন্দ্রমণিকে উঠ্‌তে দেখে নিরুপায় ও মনঃক্ষুণ্ণ হ'য়ে সকলেই উঠে পড়ে। মনে মনে মানুষটার মুণ্ডপাত করে। ভাবে—লোকটা এসে এমন স্থন্দর আসরটাকে ভেঙ্গে দিল। সত্যিই তো, বাড়ীর মধ্যে যদি বাইরের লোক একগাদা ঢোকে তা' হ'লে বন্ধ না ক'রে উপায় কি! ভাবতে

ভাবতে কেউ চন্দ্রমণির কাছে বিদায় নিয়ে, কেউ না নিয়ে চ'লে যায়।

গানে সমাদর ও প্রশংসা পেয়ে গদাধর খুব উৎসাহিত হয়। যাত্রা, গান, কথকতা ইত্যাদির দিকে মন আরো আকৃষ্ট হয়। গ্রামে কারো বাড়ী অথবা বারোয়াড়ির আসরে এই সব হ'লে সে যেমন ক'রে হোক যাবার ব্যবস্থা করে। তবে না ব'লে যায় না। প্রথমে হয় মাকে, নয় বৌদিকে প্রলুব্ধ ক'রে সঙ্গ নেয়। এরা শারীরিক অসুস্থতা এবং কাজের অজুহাত দেখিয়ে যেতে না চাইলে ধনীর স্মরণাপন্ন হয় ও ধনীকে দিয়ে মার কাছ থেকে সম্মতি আদায় ক'রে নেয়।

চন্দ্রমণি প্রথমে স্বামী, পুত্ররা অসন্তুষ্ট হবে ব'লে আপত্তি ক'রে বলে, না না, উনি শুনলে রাগ ক'রবেন। একেই তো বলেন—ঐ সব নেশায় মাতলে আর পড়াশুনা হবে না। তার উপরে পড়াশুনায় ছেলের মনও নেই।

ধনী গদাধরের পক্ষ সমর্থন ক'রে প্রতিবাদের সঙ্গে বলে, কি যে বলো বৌদি! ঠাকুর দেবতার কথা শুনলে বোকে যাবে! তা'ছাড়া আমার সঙ্গে যাবে আবার আমার সঙ্গেই আস্‌বে। এতে আপত্তির কি আছে! ছেলেমানুষ, বায়না ধ'রেছে······

ধনীর অনুরোধ আর গদাধরের মিনতি-করুণ চোখের দিকে চেয়ে চন্দ্রমণি শেষ পর্য্যন্ত অনুমতি দেয়।

ক্ষুদিরাম শুনে গম্ভীর হ'য়ে যায়। পত্নীকে কোন কথা না ব'লে শুধু ভাবে—কি ক'রে ছেলের এ নেশা কাটানো যায়? যদিও বুঝতে পারে দিন তার সংক্ষিপ্ত হ'য়ে এসেছে। জীবনের খেয়াতরী পারঘাটায় ভিড়তে বেশী দেরী নেই। এখন আর হিসাব নিকাশ না করাই ভাল। কিন্তু না ক'রেও পারে না। হিসাব ক'রে দেখে, গদাধর তার ছ'বছরে প'ড়েছে। আর অত্যধিক আদর পেয়ে যেভাবে খেয়াল-খুশীতে ভেসে চ'লছে তাতে ভবিষ্যৎ অত্যন্ত অন্ধকার। এখন থেকে জীবনের গতি ও পথ ফেরাতে না পারলে পরিণামে কুম্ভকারদের মত মাটির পুতুল তৈরী ক'রে, প্রতিমা

গড়ে, নয় যাত্রাদলে গান গেয়ে জীবিকার সংস্থান ক'রতে হবে। কিন্তু তাতে বংশগৌরব ক্ষুণ্ণ হবে। ওটা নেশা হিসাবে থাকলে তার কোন আপত্তি নেই, কিন্তু পেশা হিসাবে গ্রহণ ক'রলে মাথা হেঁট হবে। লোকে ব'লবে—ক্ষুদিরাম চাটুয্যের ছেলে শেষে জাত-ব্যবসা ছেড়ে কুমোর হ'ল। সেদিন হয়তো এ কথা তাকে স্বকর্ণে শুনতে হ'বে না সত্য, কারণ তার অনেক আগেই পৃথিবী থেকে সে বিদায় নিয়ে যাবে। তবু তারই বংশধরের সুদূর পরিণাম দর্শন ক'রে শঙ্কিত হয়। পরকালের চিন্তায় বিঘ্ন ঘটে।

পরিশেষে ঠিক করে, অন্য প্রভাবশালী লোককে দিয়ে তার মনের উপর প্রভাব বিস্তার ক'রতে হবে। শিক্ষার মাহাত্ম্যটা উপলব্ধি করাতে হবে। উচ্চ সংসর্গের গুণ-গরিমা সম্বন্ধে অভিহিত করাতে হ'বে। তাই এক-দিন পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে অর্দ্ধক্রোশ দূরে ভুরসুবো গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা হ'ল।

ভুরসুবো গ্রামের জমিদার রাজা মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায় উভয়ের সঙ্গেই তার বেশ হৃদ্যতা আছে। যদিও দীর্ঘকাল দেখা-সাক্ষাৎ নেই, কিন্তু আজ দেখে খুব আনন্দ পাবে। তাদের দ্বারা গদাধরের মনের উপরে প্রভাব বিস্তার করাতে হবে। বিদ্যার্জ্জন সম্বন্ধে উৎসাহিত ক'রে তুলতে হবে।

গদাধর অনেকদিন পরে বাবার সঙ্গ পেয়ে মহানন্দে পথ হাঁটে। নানা কথা জিজ্ঞাসা করে। এতটুকু ক্লান্তি বোধ করে না।

পুত্রের সঙ্গে গল্প ক'রতে ক'রতে ক্ষুদিরাম যখন মাণিক রাজার বাড়ীর দরজায় এসে উপস্থিত হয় মধ্যাহ্ন তখন যায় যায়। মাণিকরাজ দিবানিদ্রা সেরে সদ্য বাইরের ঘরে এসে ভৃত্যকে তামাক দিতে নির্দ্দেশ ক'রেছে। এমন সময় সপুত্র ক্ষুদিরামকে বাড়ীর দরজায় দেখে যেমন বিস্মিত হয় তেমনি উৎফুল্ল হয়। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে আন্তারকতার সঙ্গে বলে, আরে সখা যে! এস এস! ব'লে চেয়ার ছেড়ে উঠে হাত ধ'রে এগিয়ে আনে। একখানা খালি চেয়ারের দিকে নির্দ্দেশ ক'রে বলে, ব'সো, ব'সো।

ক্ষুদিরাম ক্লান্ত দেহে চেয়ারে বসে। গদাধর বাবার কোল ঘেঁষে দাঁড়ায়। ইতিমধ্যে ভৃত্য তামাক সেজে এনে ঘরে ঢোকে। মাণিকরাজ ভৃত্যের দিকে চেয়ে বলে, ওঁকে দাও।

ক্ষুদিরাম ব্যস্ত হয়ে ক্লান্ত স্বরে বলে, না না, তুমি খাও। আমি পরে খাচ্ছি।

মাণিকরাজ ভৃত্যের হাত থেকে গড়গড়াটা নেয়। মৃদু মৃদু টান দিতে দিতে গদাধরের দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

ইতিমধ্যে মাণিকরাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামজয়ও বাইরের ঘরে আসে। ক্ষুদিরামকে দেখে উৎফুল্ল হয়, কুশল জিজ্ঞাসা করে, পরে পদাধরের দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে চায়।

ক্ষুদিরাম মাণিকরাজ ও রামজয়ের জিজ্ঞাসু দৃষ্টির দিকে চেয়ে বলে, এটি আমার কনিষ্ঠ পুত্র।

মাণিকরাজ গড়গড়ার নলটা মুখ থেকে বার ক'রে নিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে খুশীর সঙ্গে বলে, বেশ বেশ, এরই কথা গণকঠাকুর একদিন ব'লছিল বটে।

রামজয় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে গদাধরের আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ ক'রতে ক'রতে বলে, হুঁ, ছেলেটার মধ্যে দেবতার অংশ বিদ্যমান ব'লে মনে হ'চ্ছে।

ক্ষুদিরাম উপেক্ষা ভরে বলে, আমিতো কিছুই বুঝতে পাচ্ছি নে। লেখা-পড়ায় মোটে মন নেই। কাদামাটি নিয়ে পুতুল গ'ড়ে আর যাত্রা গান, কথকতা এই সব নিয়েই সময় কাটিয়ে দেয়।

রামজয় গদাধরের উপর দৃষ্টি রেখেই বলে, হুঁ।

ক্ষুদিরাম আগের কথার জের টেনে আবার বলে, ব্রাহ্মণের ছেলে··· লেখাপড়া না শিখলে ক'রবে কি? এই সব ক'রে তো আর দিন যাবে না। তারপর উভয়ের দিকে চেয়ে অনুরোধের সুরে বলে, তোমরা একটু বুঝিয়ে বলতো ভাই। তোমাদের মত লোকের কথায় যদি ওর মতিগতি ফেরে।

মাণিকরাজ গড়গড়ার নলটা ক্ষুদিরামের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে সস্নেহ দৃষ্টিতে চেয়ে গদাধরকে নিকটে ডাকে।

গদাধর কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না ক'রে সপ্রতিভ ভাবে মাণিকরাজের কোল ঘেঁষে মুখের উপর ডাগর আঁখি তুলে দাঁড়ায়।

মাণিকরাজ তার মাথায় পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে জিজ্ঞাসা করে, তোমার নাম কি ?

গদাধর বেশ সহজ ভাবে বলে, শ্রীগদাধর চট্টোপাধ্যায়।

মাণিকরাজ গদাধরের সহজ সরল নিঃসঙ্কোচ ব্যবহারে মুগ্ধ হয়। ছেলেটার জন্যে বেশ একটু স্নেহ, মমতা জাগে। মনে হয় যেন বড় আপনার। কোথায় একটা যোগসূত্র রয়ে গেছে। সেই সঙ্গে পূর্ব্বের ধারণাটা বদ্ধমূল হ'য়ে যায়। নিঃসন্দেহ হয়…এ ছেলে পিতৃকুল কলঙ্কিত ক'রতে পারে না। তাই ক্ষুদিরামের দিকে চেয়ে বলে, না সখা, এর সম্বন্ধে তুমি নিশ্চিত থাকতে পারো। আর যাই করুক না কেন, তোমার মাথা হেঁট ক'রবে না। তারপর গদাধরের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করে, তুমি গান গাইতে পারো ?

গদাধর একই ভাবে ঘাড় নেড়ে বলে, হুঁ।

গদাধরের জবাব শুনে মাণিকরাজ যেমন বিস্মিত হয়, তেমনি কৌতুক বোধ করে। সহাস্যে বলে, একটা গান গাওতো শুনি।

গদাধর জিজ্ঞাসু নেত্রে পিতার দিকে চায়।

ক্ষুদিরাম সম্মতি দেয়।

গদাধর আর ইতস্ততঃ না ক'রে অকুণ্ঠ চিত্তে গান ধরে।

মাণিকরাজ জমিদার। অনেক ভূ-সম্পত্তির মালিক। বাৎসরিক আয় লক্ষাধিক টাকা। বিরাট বাড়ী। অনেক দাসদাসী। নিশ্চিন্ত জীবন। তাই গান বাজনায় বেশ অনুরাগ আছে। এদিকে কোন সঙ্গীতজ্ঞ গুণী ব্যক্তি এলে এখানে একদিন আসর না ক'রে যায় না। সেই সব গান শুনে শুনে তারও বেশ কিছু জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা জন্মেছে। প্রথমে সে ভেবেছিলো

গদাধর কিইবা গান জানে—যা' গাইবে তা' হয় তো হাসিরই খোরাক হবে। এ হ'চ্ছে গুরুমুখী বিদ্যা—গুরুর কাছে না শিখলে হয় না। তার উপরে দীর্ঘ সাধনার দরকার।

কিন্তু গান শুনে মোহিত হ'য়ে যায়। সুর, তাল, লয়, ব্যাকরণ, ইত্যাদির ঊর্দ্ধেও যে একটা কিছু আছে আজ তা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করে। মন ভাবে বিভোর হ'য়ে ওঠে। কথাগুলো সুরে সুরে অন্তরের গোপন দুয়ার খুলে দিয়ে যায়।

আর ক্ষুদিরাম গদাই গান গাইতে শিখেছে এইটুকুই শুধু শুনেছিল। কিন্তু কোনদিন তার গান মন দিয়ে শোনে নি বা শোনার আগ্রহও জাগে নি। আজ দিবা দ্বিপ্রহরে সেই পুত্রের গান শুনে শুধু মুগ্ধ হয় না, অভিভূতও হ'য়ে যায়। গান যেন তার কণ্ঠে এসে প্রাণ পেয়েছে, রূপ পেয়েছে, ভাব পেয়েছে। সুরের যে একটা মাদকতা আছে, বেদনা ভুলাবার ক্ষমতা আছে, আজ মর্ম্মে মর্ম্মে তা উপলব্ধি করে।

গদাধর আপন ভাবে বিভোর হ'য়ে গেয়ে যায়। সুর পর্দ্দায় পর্দ্দায় উঠে বাতাসে বাতাসে ছড়িয়ে যায়। সেই সুরে আকৃষ্ট হ'য়ে অন্দরমহল থেকে মেয়েরা পর্য্যন্ত এসে কপাটের আড়ালে দাঁড়ায়। তন্ময় হ'য়ে শোনে।

গান থামলে ঝিকে দিয়ে গদাধরকে অন্দরমহলে ডেকে আনে। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ও রামজয়ের পত্নী, পাড়া-প্রতিবেশিনীরা গান শুনে ও তার মিষ্টি মধুর সহজ ব্যবহারে মুগ্ধ হয়। নানাবিধ মুখরোচক খাদ্য দিয়ে পরিতোষ ক'রে খাওয়ায়। সহসা ছাড়তে চায় না।

বেলা অবসানের সূচনা দেখে ক্ষুদিরাম ব্যস্ত হ'য়ে ওঠে। আর ব'সতে চায় না। বন্ধুর কাছে বিদায় নিয়ে পুত্রকে ডেকে পাঠায়।

মাণিকরাজের পত্নী ব্যথিত মনে অশ্রুসজল চোখে বিদায় দেয়। বার বার বলে, আবার কিন্তু এস। না এলে আমি দুঃখ পাবো।

গদাধর সম্মতি দিয়ে বাইরের ঘরে এসে দাঁড়ায়। মাণিকরাজ ও রামজয়

ক্ষুদিরমকে বিদায় দেয়। রামজয় বলে, আজকের দিনটা বড় আনন্দে কাটল। ছেলেটা সত্যই দেবতার অংশসম্ভুত। আবার ছেলেটাকে নিয়ে এস। দেখলে আনন্দ হয়।

ক্ষুদিরাম সম্মত হ'য়ে পুত্রকে নিয়ে বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে আসে।

●

বত্রিশ

সন্ধ্যার একটু আগে গদাধরকে নিয়ে ক্ষুদিরাম ফিরে আসে। বাড়ী ঢুকে দেখে···ভগ্নী রামশীলা এসেছে। চন্দ্রমণির সঙ্গে আলাপ ক'রছে।

দাদাকে দেখে রামশীলা ব্যস্ত হ'য়ে উঠে দাঁড়ায়। বিস্মিত কণ্ঠে বলে, ওমা! দাদা এসে গেছে! তারপর নিকটে এসে ভক্তিভরে গলায় আঁচল তুলে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে। মুখের দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে বলে, তোমার কিন্তু শরীর খুব খারাপ হ'য়ে গেছে দাদা!

একটা অপরিচিত মহিলাকে বাবার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম ক'রতে দেখে গদাধর বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

ক্ষুদিরাম নীরবে আশীর্ব্বাদ ক'রে কথার জবাবে বলে, বয়স তো আর কম হ'ল না বোন। তারপর গদাধরের কৌতূহলী ও জিজ্ঞাসু দৃষ্টির দিকে চেয়ে বলে, তোমার পিসিমা। প্রণাম করো।

গদাধর পিতার কথায় উভয়কে প্রণাম করে। রামশীলা গদাধরকে বুকের ভিতর টেনে নিয়ে শির চুম্বন ক'রে আশীর্ব্বাদ করে। অনুযোগের সুরে বলে, আমাকে চিনতে পার্‌ছিসনে বাবা, আমি যে তোর পিসিমা হই।

পিসিমার কথায় গদাধর লজ্জা পায়। চিনতে না পারাটা অপরাধ

ব'লে মনে করে। তাই সহসা উত্তর দিতে পারে না, মুখখানাকে পিসিমার কোলের ভিতর প্রবেশ করিয়ে দেয়।

ক্ষুদিরাম পুত্রের লজ্জা দূর ক'রে দেবার জন্যে বলে, তা' বোন, তোকে তো জ্ঞান হবার পর দেখে নি···তাই আর কি······

—তাতে আর লজ্জা কি ? ব'লে রামশীলা গভীর স্নেহে গদাধরকে কোলে তুলে নিয়ে গণ্ডে চুমা খায়।

সন্ধ্যার সূচনা দেখে ক্ষুদিরাম চঞ্চল হ'য়ে ওঠে। রামশীলাকে বলে, সন্ধ্যে হ'য়ে এল, ঠাকুরের শীতল টিতল দিতে হবে। তুই তোর বৌদির সঙ্গে গল্প কর। ব'লে হাত পা ধুতে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ে। ঘাটের দিকে কয়েক পা এগিয়ে কি ভেবে দাঁড়ায়। রামশীলার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করে, হ্যাঁরে, রামচাঁদ ভাল আছে তো ? চিঠিপত্তর পেয়েছিস ? আমি তো অনেকদিন কোন সংবাদ পাই নি।

দাদার কথায় রামশীলা আবার ঘুরে দাঁড়ায়। মুখের দিকে চেয়ে বলে, হ্যাঁ, ভাল আছে।

ক্ষুদিরাম একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে, ভাল থাকলেই ভাল। রামশীলাকে আর কোন কথা বলার অবকাশ না দিয়ে আবার ঘাটের দিকে এগিয়ে যায়।

রামশীলা গদাধরকে কোলে নিয়ে রান্নাঘরের দাওয়ায় উঠে আসে। গদাধরকে কোলে নিয়ে বেশ একটু তৃপ্তি ও আনন্দ পায়। কি যেন একটা ভাবে মনটা ভ'রে ওঠে। যদিও তার নিজের সংসার আছে এবং রঘুবীরের দয়ায় বেশ স্বচ্ছলতাপূর্ণ। পুত্র রামচাঁদ কৃতী, কন্যা হেমাঙ্গিনীকেও সুপাত্রে অর্পণ ক'রেছে। স্বামী পুত্র নিয়ে সেও বেশ সুখেই ঘর-সংসার ক'রছে। আজ আর তার সংসারের জন্যে কোন দুর্ভাবনা বা দুশ্চিন্তা নেই। কিন্তু সংসার ছেড়ে সহসা বেরুতেও পারে না। রামচাঁদ থাকে মেদিনীপুরে। ছুটি-ছাটায় যদিও আসে কিন্তু ছিলিমপুরের সমস্ত ভার তারই উপর। জমি-জমা, বিষয়-আশয় সব কিছু তাকেই দেখাশুনা ক'রতে হয়। তার

উপরে পুত্রবধূও আবার তারই কাছে থাকে। অতএব ইচ্ছা হ'লেই বেরুনো যায় না, সংসারের সমস্ত ব্যবস্থা ক'রে তবে বেরুতে হয়। উপস্থিত পুত্রবধূ না থাকায় এবং ফসলও উঠে যাওয়ায় বেরুতে পেরেছে। এখন বয়স হ'য়েছে, দেহ মন ভেঙ্গে গেছে, অনেক সময় সুযোগ সুবিধা হ'লেও বার্দ্ধক্য হেতু আর ইচ্ছা করে না। কিন্তু এই ছেলেটার জন্যে এসেছে। এর সম্বন্ধে অনেক কথাই ছিলিমপুরে ব'সে ব'সে শুনেছে। তাই শুনে অন্নপ্রাশনের সময় এসে একবার দেখেও গেছিল, কিন্তু কোন বিশেষত্ব অন্ততঃ তার চোখে পড়েনি। দেবতাংশের এক অংশও সে দেখে নি। অতি সাধারণ ব'লেই জেনে গিয়েছিল। ক্ষুধা তৃষ্ণা, ব্যথা বেদনা সব নিয়েই জন্মেছে। তবে দাদার যা' চরিত্র, দেবদেবীর উপর যে ভক্তি, নিষ্ঠা, সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়ণতা যা সে দেখেছে তাতে তার ঔরসে অসামান্য ছেলে জন্মাতে পারে এ বিশ্বাস আছে। তার আরো দুই কনিষ্ঠ ভাই নিধিরাম ও কানাইরাম আছে, কিন্তু তারা কেউ দাদার মত হ'তে পারে নি। সম্পত্তি যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে যার শ্বশুরবাড়ী গিয়ে ঘর বাঁধল। দাদার মত দুঃখ কষ্ট বরণ ক'রে নিতে পারল না। তবে ছেলেটা দেবতার অংশ পাক বা না পাক, দাদার চরিত্রের কিছুটা অংশ যদি পায় তা হ'লেই সে খুশী হয়।

গদাধরকে কোলে নিয়ে রামশীলা রান্নাঘরের দাওয়ায় উঠতেই চন্দ্রমণি ব্যস্ত হ'য়ে চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে বলে, ওমা! ধেড়ে ছেলে কোলে উঠেছে! নামিয়ে দাও ঠাকুরঝি, নামিয়ে দাও। তারপর গদাধরকে লক্ষ্য ক'রে বলে, গদাই! পিসিমার কোল থেকে নাম। বুড়োমানুষ—এতটা পথ এসেছেন···

চন্দ্রমণির মুখ থেকে কথাটা কেড়ে নিয়ে রামশীলা সস্নেহে বলে, তা হোক, তা হোক—এরই জন্যে আমার আসা বৌদি। বয়স হ'য়েছে, কি জানি যদি আর দেখা না হয়······

চন্দ্রমণি বাধা দিয়ে বলে, কি যে বলো ঠাকুরঝি! প্রসঙ্গটা ছেড়ে দিয়ে বলে, তা ছাড়া সন্ধ্যেও হ'ল। জপতপ ক'রবে। সন্ধ্যা আহ্নিক না সেরে

তো জল গ্রহণ ক'রবে না। পূজাপাঠ শেষ ক'রে আবার নয় কোলে নিও।

সন্ধ্যা হ'য়ে আসছে দেখে রামশীলা অনিচ্ছা সত্ত্বেও গদাধরকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে বলে, এখন নাম। জপতপ সেরে নিই। আবার কোলে নেবোখন।

গদাধর কোন আপত্তি না ক'রে নেমে পড়ে।

রামশীলা হাত পা ধুয়ে, কাপড় ছেড়ে, ঠাকুরঘরে এসে আহ্নিক ক'রতে বসে।

গদাধরও অন্যান্য দিনের মত হাতমুখ ধুয়ে ঠাকুরঘরের দরজায় এসে দাঁড়ায়, কিন্তু বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। অনেকটা পথ বাবার সঙ্গে হেটে যাওয়া আসায় বেশ ক্লান্তি বোধ করে। ঘুমে চোখ ঢুলে আসে। তাই আরতি সুরু হবার আগেই দরজার উপর প্রণাম ক'রে বিছানায় এসে ঘুমিয়ে পড়ে।

পরের দিন দুপুর বেলা অন্যান্য দিনের মতই পাড়া-প্রতিবেশিনীরা গদাধরের গান শুনতে সমবেত হয়।

রামশীলা এত মহিলার সমাগম দেখে বিস্মিত হয়। ধনীকে জিজ্ঞাসা করে, এত মেয়েরা কেন এসেছে ধনী?

ধনী সহাস্যে বলে, ওমা! তা বুঝি জানো না দিদি, সব গদাইয়ের গান শুনতে এসেছে।

ধনীর কথা শুনে রামশীলা অবাক হয়। বিস্মিত কণ্ঠে বলে, সত্যি! গদাই কি খুব ভাল গাইতে পারে নাকি?

ধনী জবাব দিবার আগে প্রসন্ন চোখ দুটো ডাগর ক'রে বিস্মিত কণ্ঠে বলে, তুমি বুঝি গদাইয়ের গান শোন নি পিসিমা—

আরো কিছু ব'লতে যাচ্ছিল, কিন্তু রামশীলা বাধা দিয়ে বলে, কি ক'রে শুনব মা, এর আগে যখন এসেছিলাম তখন তো ছেলে কথা ব'লতেই শেখে নি—তা গান!

প্রসন্ন বলে, তবে আজ শোন। শুনলে বুঝবে কেন এরা আসে।

এবার ধনী বলে, শুধু কি গান। যাত্রা, কথকতা সব পারে। আর এমন ক'রে ব'লবে—বড় বড় কথুকে পণ্ডিত, আচ্ছা আচ্ছা যাত্রাওয়ালারা হার মেনে যাবে। অথচ কেউ তাকে শেখায় নি, সব শুনে শুনে শিখেছে।

রামশীলা চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে বলে, তাই নাকি! তবে তো শুনতে হয়। ব'লে গদাধরকে ডাকে।

গদাধর পাঠশালায় যাবার জন্যে প্রস্তুত হ'চ্ছিল। পিসিমার ডাকে সাড়া দিয়ে রান্নাঘরে এসে দাঁড়ায়। মুখের উপর কৌতূহলী আঁখি তুলে জিজ্ঞাসা করে, কি পিসিমা?

রামশীলা সস্নেহে বলে, কোথায় যাচ্ছ? আমাকে যে গান শোনাতে হবে।

গদাধর একটু ইতস্ততঃ ক'রে বলে, আমি যে পাঠশালায় যাচ্ছি।

রামশীলা জবাব দেবার আগে চন্দ্রমণি বলে, এ বেলা আর যেতে হবে না। পিসিমা যখন গান শুনতে চাইছেন, আর এত লোকজন তোমার গান শুনতে এসেছে—

গদাধরের শাঁপে বর হয়। লেখাপড়া ক'রতে তার ভাল লাগে না। অথচ না ক'রলে বাবা ও দাদারা রাগ করে। যা তা বলে। তাই সে পাঠশালায় যায়। তা ছাড়া সহপাঠিদের সঙ্গটা ভাল লাগে। পড়ার চেয়ে তাদের আকর্ষণটা আরো বেশী আকৃষ্ট করে। সেই আকর্ষণেই সে নিয়মিত পাঠশালায় যায়। পড়ার চেয়ে গল্প ক'রে, খেলাধূলায় সময় কাটায় বেশী। তাই মার কথায় মহানন্দে গান গাইতে বসে।

রামশীলা ব্যতীত আর সকলেই গদাধরের গান শুনেছে। তাদের ভালও লাগে, তাই তারা নিয়মিত আসে। কিন্তু রামশীলা গদাধরের গান এই প্রথম শুনছে। বয়স তার ঢের হ'ল। জীবনে অনেক গানই শুনেছে। নানা ধরণের—কীর্ত্তন, বাউল, শ্যামা-বিষয়, দেহতত্ত্ব। অবশ্য গানের সুর, তাল, লয় এ সব কিছু বোঝে না। কিন্তু কণ্ঠমাধুর্য্য, দরদ, এগুলো বেশ

বোঝে। তাই অনেক কণ্ঠহীন গুণীর গানের চেয়ে, সুকণ্ঠ বাউল, বোষ্টম ও বোষ্টমীর গান তার ভাল লাগে। অনুরোধ ক'রে শোনেও। কিন্তু গদাধর যখন সুরে সুরে বলে—

আর কবে দেখা দিবি মা
হর মনোরমা!
ফুরালো মা ভবের খেলা
আয় মাগো এই বেলা,
দিনে দিনে তনুক্ষীণ
ক্রমে আঁখি জ্যোতিঃহীন,
এখন না এলে পরে
আর কি চিনিব শ্যামা।

তখন রামশীলার মনে হয়, এ রকম আবেগপূর্ণ, ভাবে ভরা গান সে জীবনে শোনে নি। এত দরদ দিয়ে, এমন করুণ ক'রে কেউ যে গাইতে পারে তা তার ধারণাতীত। গানের অর্থটা সুরের সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে এক অদ্ভুত ভাব বিস্তার করে। আর সেই ভাবে রামশীলা অভিভূত হ'য়ে যায়। মনে হয়— সত্যই তো জীবনের এই সুদীর্ঘ দিনগুলো সংসার ও পুত্রকন্যার চিন্তাতেই কেটে গেছে। ঐ চিন্তা ক'রতে ক'রতে তনু ক্ষীণ এবং আঁখিও জ্যোতিঃহীন হ'য়ে এসেছে। ভবের খেলা শেষ হ'তে আর বেশী দেরী নেই। কবে যে মৃত্যু শিয়রে এসে দাঁড়ায়—ভাবতে ভাবতে··· সংসার, পুত্রকন্যা, ইহকাল, পরকালের কথা ভুলে যায়। হরমনোরমার বেদনায় বুকখানা মোচড় দিয়ে ওঠে। চোখে শ্রাবণের ধারা নামে। বার বার মনে হয়—এ জীবনে বোধ হয় আর হরমনোরমার দেখা পাওয়া গেল না। একটা জন্ম বিফলেই গেল।

কিন্তু এ কে? যে এমন ক'রে বুকের ভিতর হরমনোরমার বেদনাকে জাগিয়ে দিল। গানতো সে অনেক শুনেছে, অনেক সাধু বৈরাগীর মুখেও শুনেছে—কিন্তু এমন ক'রে জীবনের ছবিতো কেউ এঁকে দিতে পারে নি।

হরমনোরমার বেদনায় মনকে অভিভূত ক'রে তুলতে পারে নি। আর সে জানে, দেখে ও শুনেও এসেছে বড় ভাবুক না হ'লে বড় গায়ক হয় না। তাই ছোট বড় সাধক সাধিকারা গান গাইতে পারতো বা পারে। এই গানের ভিতর দিয়েই নিজেরা পার্থিব জগতের চিন্তা মুক্ত হ'য়ে হর-মনোরমার চিন্তায় ডুবে থাকতো। এ গানখানাও এমনি কোন এক সাধকেরই গান। যে তার দর্শন পেয়ে মানব জীবন সার্থক ক'রে চ'লে গেছে। রেখে গেছে মানুষের কণ্ঠে কণ্ঠে হরমনোরমার দর্শনাকাঙ্ক্ষার আকুল বেদনা। এই গানই সে অনেকের মুখে শুনেছে। কিন্তু কোন ভাবান্তর ঘটে নি। আজ কিন্তু অনুতাপে ও অনুশোচনায় অন্তরটা জ্বলে যায়। সেই সঙ্গে মনে হয়—যে ছেলেটা তার বুকের মধ্যে এ আগুন জ্বালিয়ে দিল, সে সাধারণ নয়। রক্তমাংসের দেহ ধারণ ক'রে, ক্ষুধা, তৃষ্ণা নিয়ে এলেও—অসাধারণ, অনন্য। ভাবতে ভাবতে চৈতন্যের উপর বিস্মৃতির যবনিকা নামে। পার্থিব চিন্তা লোপ হয়। ব'সে থাকতে থাকতে শুয়ে পড়ে, ও গোঁ গোঁ শব্দ করে। সেই সঙ্গে দৃষ্টি বিস্ফারিত ও লাল হ'য়ে ওঠে। সর্ব্বদেহে একটা অস্থিরতা জাগে।

রামশীলার শারীরিকও মানসিক পরিবর্ত্তন দেখে চন্দ্রমণি ভীত ওব্যাকুল হ'য়ে ওঠে। সে জানে মাঝে মাঝে তার ননদের উপর মা শীতলার আবেশ হয়। কিন্তু সে কোন বিশেষ অবস্থায়। মনের উপর কোন কিছু গভীর রেখাপাত না ক'রলে হয় না। অবশ্য তার শ্বশুর বংশের সকলেই ভগবৎ-পরায়ণ এবং ভাবুক। কিন্তু এমন অসময়ে হ'ল কেন? তবে কি তার পুত্রের গান তার মনে রেখাপাত ক'রেছে? যাক—যা হবার হ'য়েছে। এখন এর বিহিত করা দরকার। তাই পুত্রবধূর দিকে চেয়ে ব্যস্ত ভাবে বলে, বৌমা! শীঘ্রি ক'রে ঠাকুরঘর থেকে গঙ্গাজলের পাত্রটা আর ধুনচিটা নিয়ে এস।

পুত্রবধূ দ্রুতপদে ঠাকুরঘরের দিকে এগিয়ে যায়।

রামশীলার অবস্থা দেখে সকলেই বেশ ভীত এবং উদ্বিগ্ন হ'য়ে পড়ে।

ধনী ব্যাকুল কণ্ঠে চন্দ্রমণিকে জিজ্ঞাসা করে, বৌদি! হঠাৎ কি হ'ল? ব'লে এগিয়ে রামশীলাকে ধ'রতে যায়।

চন্দ্রমণি হাত দু'খানা বাড়িয়ে দিয়ে হাঁ হাঁ ক'রে ওঠে। শঙ্কিত কণ্ঠে বলে, ছুঁস্‌নে! ছুঁস্‌নে! ওর উপর মা শেতলার ভর হ'য়েছে।

এই সব বিপর্য্যয়ে গদাধর গান বন্ধ করে। দৃষ্টি বিস্ফারিত ক'রে পিসিমার দিকে চায়। অন্যান্যরা ভয়ে, ভক্তিতে হাত জোড় ক'রে রামশীলার দিকে চেয়ে থাকে।

পুত্রবধূ ধুনচি ও গঙ্গাজলের পাত্র এনে শাশুড়ীর হাতে দেয়।

চন্দ্রমণি গঙ্গাজলের পাত্রটা নিয়ে ধুনচিতে একটু আগুন আনতে নির্দ্দেশ দেয়। তারপর রামশীলার কাছে এগিয়ে গিয়ে ভক্তিভরে চোখে-মুখে গঙ্গাজলের ঝাপ্‌টা দেয়।

ইত্যবসরে পুত্রবধূ ধুনচিতে আগুন ও ধুনো দিয়ে নিয়ে আসে।

জলের ঝাপ্‌টায়, ধুনোর গন্ধে, রামশীলা কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থা হ'য়ে গদাধরের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চায়। তারপর বলে, এসেছ—ভাল ক'রেছ। আজ তোমার আসার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু পারবে কি?

এই অর্থহীন কথা শুনে পরস্পর পরস্পরের মুখ চাওয়া-চায়ি করে। ধনী কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে চন্দ্রমণিকে মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, দিদি কি ব'লছে বৌদি?

চন্দ্রমণি রামশীলার উপর থেকে দৃষ্টিটা তুলে নিয়ে ধনীর উপর ফেলে বলে, এখন যা ব'লছেন তা ওর কথা নয়। যিনি ভর ক'রে আছেন তিনি ব'লছেন। ও কথার অর্থ বোঝা যায় না। স্বাভাবিক হ'লে উনিই ব'লতে পারবেন না কি ব'লছেন এবং কেন ব'লেছেন।

গদাধরের কিন্তু এ সব দেখে ভয় বা ভক্তি কিছুই জাগে না। সে বেশ কৌতুক বোধ করে। ভাবে—যে পিসিমার উপর ভর ক'রেছে সে যদি তার উপর ভর ক'রতো তা হ'লে বেশ হ'ত। কিছুক্ষণ অন্য এক ভাবে থাকা যেত। তাই শিশুসুলভ কৌতূহল এবং চপলতার সঙ্গে বলে,

যে পিসিমার উপর ভর ক'রেছে সে যদি আমার উপর ভর ক'রতো বেশ হ'ত।

চন্দ্রমণি পুত্রের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে মৃদু ভৎর্সনার সঙ্গে বলে, খুব হ'য়েছে আর অত বাহাদুরিতে কাজ নেই।

মার তিরস্কারে গদাধর চুপ করে বটে, কিন্তু বাসনাটা ত্যাগ ক'রতে পারে না। পিসিমার মতন ঐ রকম জ্ঞান ও অজ্ঞানের মধ্যবর্ত্তী অবস্থাটা মনে বেশ একটা মোহ সৃষ্টি করে। ভাবে···কবে তার ঐ রকম হবে ?

রামশীলা গদাধরের দিকে চেয়ে বিড় বিড় ক'রে আরো অনেক কিছু ব'লতে ব'লতে এক সময় চুপ ক'রে নিদ্রাচ্ছন্ন হ'য়ে যায়।

চন্দ্রমণি একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে যুক্তকর কপালে তুলে বলে, ছেড়ে গেলেন।

চন্দ্রমণির দেখাদেখি সকলেই ভক্তিভরে প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়ায় ও বিদায় নেয়।

গদাধরও ওদের পিছু পিছু বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে আসে।

●

তেত্রিশ

এমনি ক'রে শিশুমনের অনেক কৌতূহল, অনেক বিস্ময়ের কিছুটা নিরসন ক'রে ও কিছুটা নিয়ে গদাধর জীবনের আর একটা বৎসর অতিক্রম ক'রে আসে। ষষ্ঠ ছাড়িয়ে সপ্তমে পড়ে।

গদাধরের বয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর সকলেই ভাবে—এইবার হয় তো গদাইয়ের মতিগতি ফিরবে। পড়াশুনায় মন দেবে।

কিন্তু তাদের হতাশ ক'রে গদাধর আগের মতনই দিনগুলো কাটিয়ে

দেয়। পড়াশুনার চেয়ে মৃৎ এবং চিত্রশিল্পে মনযোগ দেয় বেশী। তার সঙ্গে যাত্রা, গান, কথকতা তো আছেই। আগে শুধু শিশুসুলভ কৌতূহল ও বিস্ময় নিয়ে দেখে যেত। বিচার বিশ্লেষণ ক'রতো না। এখন শুধু দেখে ও শুনে যায় না। ভালমন্দ বিচার ক'রে। কৃষ্ণের অভিনয় বলরামের চেয়ে ভাল লাগলো কেন ? এর ভাগবৎ পাঠ ওর চেয়ে ভাল হ'ল কেন ? আর সেই বিচার ক'রে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়—বলার গুণে ও সময়োপযোগী অভিব্যক্তির জন্যে। সেই সঙ্গে সঙ্গে নিজেরও বলার ভঙ্গী অভিব্যক্তির দিকে মনযোগ দেয়। বিশেষ ধরণের কথা, অস্বাভাবিক অঙ্গভঙ্গী দেখলেই নকল করার চেষ্টা করে। এর ফলে গ্রামের যার যা বিশেষত্ব এবং অস্বাভাবিক ধরণের বাচন ও ভঙ্গী দেখে সব নকল ক'রে নেয়। এমন কি পাঠশালার পণ্ডিত মশায় পর্য্যন্ত বাদ যায় না। কারো উপর কুপিত হ'লে পণ্ডিত মশায় কেমন তোঁতলা হ'য়ে যায়। দৃষ্টিটা কেমন বক্র ক'রে ফেলে। হাত দু'খানা ঘন ঘন কি রকম ক'রে নাড়ে। সেই সঙ্গে ঘাড়টা কোন দিকে কতখানি বেঁকে থাকে সব যথাযথ অনুকরণ ক'রে ফেলে। তারপর এক সময় পণ্ডিত মশায়ের অনুপস্থিতিতে তারই চেয়ারটিতে গিয়ে বসে।

সমবেত ছাত্ররা হৈ হৈ ক'রে ওঠে। কেউ বলে, ওকি পণ্ডিতমশায়ের চেয়ারে ব'সলি কেন ?

গদাধর সে কথার কোন জবাব না দিয়ে পণ্ডিতের মতন মুখভঙ্গী ও অঙ্গভঙ্গী ক'রে বলে, বিশে, কি হচ্ছে ? কড়াকিয়া মুখস্থ হ'য়েছে ?

গদাধরকে হুবহু পণ্ডিত মশায়ের মত কণ্ঠস্বর ও অঙ্গভঙ্গী নকল ক'রে ব'লতে দেখে ছাত্ররা শুধু বিস্মিত হয় না, বেশ কৌতূক বোধ করে। তাই সেটা আরো উপভোগ করার জন্যে ছাত্রের মতনই ভয়ের ভান করে। বিশে নামধারী ছেলেটা মুখখানাকে কাঁচুমাচু ক'রে ভয়ে ভয়ে বলে, না গুরুমশায়।

জবাব শুনে গদাধর এবার পণ্ডিতমশায়ের মত রাগের ভান করে। ঘাড় বেঁকিয়ে, বক্র দৃষ্টিতে চেয়ে, ছড়িশুদ্ধ হাতখানা শূন্যে নাড়তে নাড়তে তোঁতলামো ক'রে বলে, ত-ত-তবে-এ-এ এত-ক্ষ-ণ ধ-ধ-ধরে কি-কি-হ-চ্ছে-শু-শুনি! খালি-কা-র-বা-বা-বাগানে কি-কি-পে পেকেছে তা-তাই-ভা-ভা-ভাবছ?

গদাধরের কথা শুনে ছেলেরা হাসিতে ফেটে পড়ে।

আর ঠিক সেই সময় পণ্ডিতমশায় ঘরে ঢুকে গদাধরকে তার চেয়ারে উপবিষ্ট দেখে বজ্রগম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করে, কি হচ্ছে?

অতর্কিতে পণ্ডিতমশায়ের আবির্ভাবে সকলেই ভয়ে পাংশু হ'য়ে যায়। ভীত সন্ত্রস্ত হ'য়ে যে যার জায়গায় গিয়ে বসে। কেউ কথার জবাব দিতে পারে না।

পণ্ডিতমশায় বেশ বুঝতে পারে তার অবর্ত্তমানে উপভোগ্য একটা কিছু আলোচনা হ'চ্ছিল এবং হয় তো তাকে বলার মত নয়। সেই কারণেই সকলে নীরব ও সন্ত্রস্ত। কিন্তু বিদ্যালয়ে এই সব অপরিপক্ক ছাত্রদের এমন কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা উচিৎ নয়, যা সে জানতে পারে না বা তাকে বলা যেতে পারে না। তার উপরে পাঠশালে ঢুকে গদাধরকে তার চেয়ারে উপবিষ্ট দেখে নিঃসন্দেহ হয়। তাই তারই উপর সন্দিগ্ধ ও তীব্র দৃষ্টি ফেলে তীক্ষ্ণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, কি আলোচনা হ'চ্ছিল? আর তুমি ওখানে গিয়ে ব'সেছিলে কেন?

পণ্ডিতমশায়ের সাড়া পেয়ে যদিও গদাধর চেয়ার থেকে নেমে পড়েছিল, কিন্তু সেটা তার দৃষ্টি এড়ায় নি। তবে অন্যান্যের মত সন্ত্রস্ত হয় নি বা ভয়ে বিহ্বল হ'য়েও পড়ে নি। তাই পণ্ডিতমশায়ের কথার জবাবে বেশ নির্ভীক ভাবেই বলে, আপনি কেমন ক'রে পড়ান তাই দেখাচ্ছিলাম।

গদাধরের উত্তর শুনে পণ্ডিতমশায় শুধু বিস্মিতই হয় না, স্তম্ভিত হ'য়ে যায়। মুখখানা কঠোর হ'য়ে ওঠে। দৃষ্টি নিষ্ঠুর ও হিংস্র হয়। আরো

কয়েক পা এগিয়ে আসে। কি যে শাস্তি দেবে ভাবতে গিয়ে ছেলেটার সত্যবাদিতা এবং নির্ভীকতা দেখে মুগ্ধ না হ'য়ে পারে না। মনে মনে বিচার ক'রে দেখে…এ তো অনায়াসে মিথ্যা কথা ব'লতে পারতো, আর ব'ললে সহপাঠিরা প্রতিবাদ ক'রতো না। তাকেও নিরুপায় হ'য়ে বিশ্বাস ক'রে নিতে হ'ত। কারণ সে যখন নিজ কাণে শোনে নি বা বিষয়টা দেখে নি। আর তাকে বিদ্রূপ ক'রে তারই মুখের উপর ব'ললে কিনা—আপনি কেমন ক'রে পড়ান তাই দেখাচ্ছিলাম। ব'লতে এতটুকু ভয় পেল না! একবারও ভাবল না যে, এর জন্যে তাকে কঠোর শাস্তি নিতে হবে! পালিয়ে যেতে পারবে না—যাবার উপায়ও নেই। কারণ বিদ্যার্জ্জন ক'রতে হ'লে তারই কাছে আসতে হবে। গ্রামে আর কোন বিদ্যালয় নেই। যদিও বালক কিন্তু নিজের ভাল মন্দ বোঝার মত জ্ঞান হ'য়েছে। দূরদৃষ্টি না জন্মালেও আপাতঃ দৃষ্টি জন্মেছে। এই কথা ব'ললে তাকে যে শাস্তি নিতে হবে এটা সে ভাল ভাবেই জানে এবং তা জেনেই ব'লেছে। অথচ আগে সকলকেই জিজ্ঞাসা ক'রেছিল, কিন্তু কেউ তো সাহস ক'রে ব'ললো না। সকলেই ভয়ে নির্ব্বাক হ'য়ে রইল। অথচ যে অপরাধী সেই নির্ভীক কণ্ঠে দেহের উপর নির্য্যাতন হবে জেনেও দোষ স্বীকার ক'রল। আর অবলীলাক্রমে, একটু ইতস্ততঃ ক'রল না। কণ্ঠটা কাঁপল না পর্য্যন্ত। এ সাহস সে পেল কোথা থেকে? কে তার বুকের মধ্যে ব'সে সত্যবাদী ও নির্ভীক হবার ইঙ্গিত দিচ্ছে?

যদিও ছেলেটার সম্বন্ধে বহু গুজবই শুনেছে। অনেকেরই ধারণা ছেলেটা অসামান্য। এমন কি তার মনিব ধর্ম্মদাস লাহা পর্য্যন্ত ছেলেটাকে কেষ্ট-বিষ্টু ভেবে রেখেছে। তবে এ পর্য্যন্ত তার চোখে কোন বিশেষত্ব পড়ে নি। তার উপরে পড়াশুনাতেও তেমন কিছু নয়। ধারাপাতকে তো বাঘের মত দেখে। আজ পর্য্যন্ত কড়াকিয়া গণ্ডাকিয়া মুখস্ত ক'রতে পারল না। জিজ্ঞাসা ক'রলেই মুখখানাকে কাঁচুমাচু করে। পরিশেষে বলে, পড়া হয় নি। অতএব এই রকম মেধাবী ছাত্রকে অসামান্য ভাবে কি ক'রে?

কিন্তু আজকের এই ঘটনা এবং তা বিশ্লেষণ ক'রতে গিয়ে সব ধারণাটা ওলট পালট হ'য়ে যায়। ছেলেটা যে অনন্যসাধারণ আজ তার সত্যবাদিতা ও নির্ভীকতা দেখে নিঃসন্দেহ হয়। আর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সব ক্রোধ জল হ'য়ে আসে। দৃষ্টি স্নিগ্ধ ও শান্ত হয়। সস্নেহে কৌতূহল ভরে বলে,আচ্ছা দেখাও তো আমি কেমন ক'রে পড়াই ?

পণ্ডিতমশায়ের কথা শুনে ছাত্ররা যেমন আশ্বস্ত হয়, তেমনি বিস্মিত হয় গদাধরের সাহস ও নির্ভীকতা দেখে।

গদাধর কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না ক'রে অকুণ্ঠ চিত্তে পণ্ডিতমশায়ের চেয়ারে আবার উঠে বসে। তার কণ্ঠস্বর ও অঙ্গভঙ্গী অনুকরণ ক'রে যেমন ভাবে পড়ান ঠিক তেমনটি দেখায়—এমন কি কুপিত হ'লে যা যা করেন সেটা পর্য্যন্ত বাদ দেয় না।

নিজেরই বিভিন্ন ভাবের অনুকৃতি একটি বালকের মধ্যে দেখে পণ্ডিতমশায় আর হাসি চেপে রাখতে পারে না। হো হো ক'রে হেসে ওঠে। সেই সঙ্গে ছাত্ররাও যোগ দেয়। একটি ছাত্র বলে, গুরুমশায়, গদাই যাত্রার পালাও গাইতে পারে।

পণ্ডিতমশায়কে কথা বলার অবকাশ না দিয়ে আর একটি ছাত্র বলে, খুব ভাল গান গাইতে পারে গুরুমশায় !

গুরুমহাশয় বিস্মিত কণ্ঠে বলে, তাই নাকি ? তারপর গদাধরের দিকে চেয়ে বলে, আচ্ছা—একটা গান গাও তো শুনি !

পণ্ডিতমশায়ের আদেশে গদাধর গান সুরু করে।

গান শুনে পণ্ডিতমশায় শুধু মুগ্ধ হয় না ভাবে বিভোর হ'য়ে যায়। আর সেই ভাব অন্তর মথিত ক'রে চক্ষু সজল ক'রে আনে। অজ্ঞাতসারে কত জল যে ঝ'রে পড়ে তা নিজেই টের পায় না। হুঁস হয় গান থেমে যাবার কিছু পরে—ছাত্ররা যখন কোলাহল ক'রে ওঠে।

তাড়াতাড়ি চাদরের প্রান্তভাগ দিয়ে চোখের জল মুছে নিয়ে বলে, আজ তোমাদের ছুটি। যাও……

ছাত্ররা বই শ্লেট নিয়ে হৈ হৈ ক'রে উঠে পড়ে। গদাধরও তাদের সঙ্গ নেয়।

পণ্ডিতমশায় গদাধরের দিকে চেয়ে বলে, গদাই, তুমি যেও না, দাঁড়াও।

নিরুপায় ও মনোক্ষুণ্ণ হ'য়ে গদাধর দাঁড়ায়। পণ্ডিতমশায়ের মুখের উপর কৌতূহলী দৃষ্টি তুলে জিজ্ঞাসা করে, কেন গুরুমশায় ?

গদাধরকে দাঁড়াতে দেখে তার কয়েকজন ভক্ত অনুচরও দাঁড়িয়ে পড়ে। শঙ্কিত দৃষ্টিতে পণ্ডিতমশায়ের দিকে চায়।

পণ্ডিতমশায় পুনরায় তাদের চ'লে যেতে ব'লে গদাধরকে কাছে ডাকে। সস্নেহে গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে বলে, দেখ, তুমি আমাকে ঠিকই নকল ক'রেছ সত্যি, কিন্তু আমি তোমাদের গুরুমশায়। গুরু পিতার সমান, তাঁর দোষ ত্রুটী নিয়ে বা বিশেষত্ব অনুকরণ ক'রে তুমি যদি এমন ক'রে সকলকে দেখাও...বিশেষ ছাত্রদের ; তবে তারা আর আমাকে মান্য ক'রবে না বা ভয় ক'রবে না। ভয় ও ভক্তি যদি আমার উপর না থাকে তা হ'লে আর আমার পক্ষে পড়ান সম্ভব হবে না। ব'লতে ব'লতে দৃষ্টি করুণ এবং কণ্ঠ ভারী হ'য়ে আসে।

পণ্ডিতমশায়ের করুণ দৃষ্টি এবং ব্যথিত কণ্ঠস্বর শুনে গদাধর মর্ম্মাহত হয়। এতক্ষণ পরে বুঝতে পারে সে মহা অন্যায় ক'রেছে। বিশেষ ক'রে পিতৃস্থানীয় বা শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের বিশেষত্ব অনুকরণ ক'রে প্রকাশ করাটা সত্যই অপরাধ। সকলের কাছে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়। তাই সলজ্জ কণ্ঠে বলে, আমাকে ক্ষমা করুন গুরুমশায়! এমন কাজ জীবনে কখনো ক'রব না।

পণ্ডিতমশায় গভীর আবেগে ও সস্নেহে গদাধরকে বুকে টেনে নিয়ে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে বলে, তোমাকে আশীর্ব্বাদ করার সাহস আমার নেই গদাই! শুধু বলি, ভগবান তোমার সহায় হোন। তারপর আলিঙ্গনমুক্ত ক'রে দিয়ে বলে, এবার তুমি যাও!

গদাধর আর দ্বিরুক্তি না ক'রে নত মস্তকে বেরিয়ে আসে। পথে এসে দেখে সঙ্গী সাথীরা সব চ'লে গেছে। ক্ষুণ্ণমনে বাড়ীর পথ ধরে।

বাড়ী ঢুকে একটি অপরিচিতা মহিলাকে রান্নাঘরের দাওয়ায় ব'সে মার সঙ্গে আলাপ ক'রতে দেখে বিস্মিত দৃষ্টিতে চায়।

চন্দ্রমণি পুত্রের বিস্মিত ভাব দেখে বলে, তোমাকে মাণিকরাজের বাড়ী থেকে নিতে এসেছে।

তাকে নিতে আসার কি যে কারণ গদাধর ভেবে পায় না। তাই কৌতূহলী হ'য়ে প্রশ্ন করে, কেন মা ?

চন্দ্রমণি জবাব দেবার আগে অপরিচিতা মহিলাটি বলে, তুমি অনেকদিন যাও নি কিনা তাই রাণীমা তোমাকে দেখার জন্যে ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছেন। নিয়ে যাবার জন্যে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন।

মাণিকরাজের বাড়ী যাবার আমন্ত্রণ পেয়ে গদাধর বেশ উৎফুল্ল হয়। লোকগুলোকে তার খুব ভালো লাগে, সবাই তাকে ভালোবাসে। আপন জনের মত ব্যবহার করেন। কত কি খাওয়ায়। বিশেষ ক'রে রাণীমা তো মার মত ব্যবহার করেন। খেতে না চাইলে কোলে বসিয়ে হাতে ক'রে খাইয়ে দেন। আর সে যে-যে জিনিষ খেতে ভালবাসে সেইগুলো ক'রেই খাওয়ান। তারপর আসার সময় সঙ্গে কত কি খাবার ও খেলার জিনিষ দেন, সেই সঙ্গে আবার আসার জন্যে বার বার অনুরোধ ক'রে বলে, আবার এস বাবা। ব'লতে ব'লতে চক্ষু সজল ও কণ্ঠ ভার হ'য়ে আসে। তবে বাবার অসুখের জন্যে অনেকদিন যাওয়া হয় নি। সেই কারণে তাদের কথা একরকম ভুলেই গিয়েছিল।

মহিলাটির কথার জবাবে চন্দ্রমণি বলে, কর্ত্তার শরীর খারাপ কিনা তাই আর যেতে পারেন নি।

মহিলাটি সহানুভূতির সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে, কি হ'য়েছে ?

চন্দ্রমণি বিমর্ষ কণ্ঠে বলে, পেটের অসুখ, শরীর খুব দুর্ব্বল। তাই আজকাল বড় একটা কোথাও বের হন না।

বেলা অপরাহ্ণের সূচনা দেখে মহিলাটি চঞ্চল হ'য়ে ওঠে। ব্যাধি-প্রতিকারের চিরাচরিত দু'একটা নির্দ্দেশ ও উপদেশ দিয়ে বলে, তা হ'লে মাঠান্, ছেলেকে কি আমার সঙ্গে পাঠাবেন ?

চন্দ্রমণি চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে বলে, সে কি কথা—রাণীমা যখন নিতে পাঠিয়েছেন……

মহিলাটি আর দ্বিরুক্তি না ক'রে গদাধরকে সঙ্গে নিয়ে ভুরসুবো গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়।

যাবার সময় চন্দ্রমণি পুত্রকে কাল সকাল বেলায় পৌঁছে দিয়ে যাবার জন্য বলে।

গদাধরকে পেয়ে রাজবাড়ীর সকলেই খুব উৎফুল্ল হ'য়ে ওঠে। রাজ-মহিষী গদাধরকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে অনুযোগের সঙ্গে বলেন, এতদ্দিন আসো নি কেন বাবা ?

গদাধর বেশ সপ্রতিভ ভাবে বলে, কি ক'রে আসবো বলো ? বাবার যে অসুখ। আর আমাকে তো একা একা আসতে দেবে না। তারপর আঁখি বিস্ফারিত ক'রে রাণীমার উপর ফেলে আবার বলে, আমি কিন্তু একা একা আসতে পারি। সব চিনি। শুধু বকাবকি ক'রবে ব'লে আসতে পারি নে।

রাজমহিষীর যদিও বয়স হ'য়েছে, পুত্রকন্যাও আছে, তারা উপযুক্তও বটে, তবু এই ছেলেটিকে তাঁর বড় ভাল লাগে। এর মধ্যে কি যে পেয়েছেন তা তিনি নিজেই জানেন না। বিচার বিশ্লেষণ ক'রে কোন বিশেষত্ব পান নি। তবে কথাবার্ত্তাগুলো খুব মিষ্টি এবং পাকা পাকা। কচি মুখে পাকা পাকা কথা শুনতে খুব ভাল লাগে। ব্যবহারটি বেশ সহজ। কোথাও জড়তা বা লজ্জা নেই। এমন ভাবে মেশে যেন ঘরের ছেলে। আমরা যে পর সে কথা নিজেও ভুলে যায়, আমাদেরও ভুলিয়ে দেয়। অবশ্য এ রকম সপ্রতিভ ও চালাক-চতুর অনেক ছেলেই আছে। আচার ব্যবহারও তাদের নিন্দনীয় নয়, কিন্তু তাদের মধ্যে

এমন আপনভোলা ভাব নেই! তা ছাড়া এর মধ্যে এমন কিছু আছে যার জন্যে একটা দুর্ব্বার আকর্ষণ বোধ করেন। পরের ছেলের উপর কেন যে এত মমতা সেটা খুঁজে পান না। কিছুদিন না এলেই মনটা বড় ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে। শুধু কি তাঁর—বাড়ীর কর্ত্তাদের পর্য্যন্ত। আজ আসে, কাল আসে ক'রতে ক'রতে দিন চ'লে যায়। শেষ পর্য্যন্ত আর আশাপথ চেয়ে থাকা সম্ভব হয় না, লোক পাঠিয়ে আনাতে হয়। কাছে পেয়ে মনে হয়, যেন হারানিধি পেলেন।

রাণীমা গদাধরকে বুকের ভিতর তেমনি নিবিড় ভাবে জড়িয়ে ধ'রে বলেন, একা একা চ'লে আসিস বাবা।

গদাধর অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে ঘাড় নেড়ে দেয়। তারপর আব্দারের সুরে বলে, আমার ক্ষিদে পেয়েছে রাণীমা!

গদাধরের কথা শুনে রাণীমা ব্যস্ত হ'য়ে উঠে দাঁড়ান। রান্নাঘরে এসে পরিপাটি ক'রে খেতে বসান।

গদাধর খেতে খেতে অনেক গল্প করে। রাণীমা তন্ময় হ'য়ে শোনেন আর ভাবেন—ছেলেটা যদি তাঁর হ'ত, তাহ'লে তিনি সব দুঃখ বেদনা ভুলে থাকতে পারতেন, কিন্তু তাতো হবার নয়। পরের ছেলে। রাত্রি ভোর হ'লেই চ'লে যাবে। রেখে যাবে স্মৃতি। কিন্তু সেটা ব্যথা হয়ে বুকে বাজবে। ভাবতে ভাবতে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে।

দীর্ঘ নিঃশ্বাসের শব্দে গদাধর ঘাড় তুলে রাণীমার দিকে বিস্মিত নেত্রে চায়।

গদাধরের বিস্মিত দৃষ্টির দিকে চেয়ে রাণীমা লজ্জা পান। তাড়াতাড়ি ভাব-পরিবর্ত্তন ক'রে বলেন, গদাই, আমাকে গান শোনাবে না?

গদাধর লুচির টুকরোটা মুখের ভিতর ফেলে চিবুতে চিবুতে বলে, হ্যাঁ। লুচির টুকরোটা উদরস্থ ক'রে আবার বলে, আমি রামপ্রসাদের গান শিখেছি রাণীমা! আজ তোমাকে তাই শোনাব।

রাণীমা খুশীমনে ঘাড় নেড়ে বলেন, বেশ।

খাওয়া দাওয়া সেরে গদাধর রামপ্রসাদী গান সুরু করে ঃ

"আসার আসা ভবে আসা
আসামাত্র সার হ'ল,
চিত্রের পদ্মেতে প'ড়ে
ভ্রমর ভুলে র'ল।"

সুরে আকৃষ্ট হ'য়ে বাড়ীর সবাই এসে জড় হয়। মাণিকরাজ, রামজয় পর্য্যন্ত বৈষয়িক কাজ ফেলে অন্দরমহলে আসে। মুগ্ধ চিত্তে শোনে। অন্তর ভাবে বিভোর হ'য়ে যায়। জীবনের অর্থ স্বচ্ছ হ'য়ে চোখের উপর ভেসে ওঠে। বিষয়ের উপর বৈরাগ্য জন্মায়। চক্ষু সজল হ'য়ে ওঠে।

গদাধর একাদিক্রমে অনেকগুলো গান গেয়ে ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে। সহসা বন্ধ ক'রে বলে, ঘুম পাচ্ছে রাণীমা।

রাণীমা ব্যস্ত হ'য়ে ওঠেন। সহানুভূতির সঙ্গে বলে, তবে খাবে চলো। একেবারে খেয়েদেয়ে শোও।

গদাধর খেতে চায় না। রাণীমা খাবার জন্যে আর পীড়াপীড়ি না ক'রে শয্যায় শুইয়ে দেন।

কিছুক্ষণের মধ্যে গদাধর ঘুমিয়ে পড়ে। সকাল বেলায় উঠে বাড়ী ফেরার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে ওঠে।

রাণীমা আর থাকবার জন্যে অনুরোধ করেন না। কারণ একটি রাত্রের কথা ব'লেই তাকে এনেছেন। তা ছাড়া বালক। বাড়ীর জন্যে মনও তার ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছে। কথামত পাঠিয়ে না দিলে বাপ-মা ভাববে, হয়তো একটু অসন্তুষ্টও হবে। তাই আর দ্বিরুক্তি না ক'রে গদাধরকে পরিপাটি ক'রে জলযোগ করান। নূতন জামা কাপড়, সেই সঙ্গে কয়েকখানা স্বর্ণালঙ্কারও পরিয়ে দেন। বুকের ভিতর জড়িয়ে ধ'রে অশ্রুসজল কণ্ঠে আবার আসার জন্যে অনুরোধ করেন। গণ্ডে ও শিরে চুম্বন দিয়ে যে মহিলাটি এনেছিল তার সঙ্গে পাঠিয়ে দেন।

সকলের কাছে বিদায় নিয়ে ও আবার আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গদাধর খুশীমনে রাজবাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে আসে।

●

চৌত্রিশ

গদাধরের দিনগুলো যেমন নদীর স্রোতের মত তর্ তর্ ক'রে ব'য়ে যায়, ক্ষুদিরামের কিন্তু তা যায় না। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শুধু জরাই আসে না, সেই সঙ্গে আসে ব্যাধি।

ব্যাধিটা অবশ্য আজ দেড় বছর হয় তার উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। একটু খাওয়া দাওয়ার অনিয়ম হ'লেই অম্বল হয়, চুঁয়া ঢেকুর ওঠে, পাতলা দাস্ত হয়। শরীর দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ে। শয্যা ছেড়ে আর উঠ্‌তে ইচ্ছা করে না। অবশ্য দু'একদিন নিয়মমত চ'ললে আবার সব ঠিক হ'য়ে যায়। কিন্তু দেহে আর আগের মত বল পায় না। মনের শান্তিও নষ্ট হ'য়ে যায়। এক এক সময় ভাবে...আর কেন? এবার গেলেই হয়। জরাজীর্ণ দেহ নিয়ে বেঁচে থাকা মানে নিজেও কষ্ট পাওয়া, অপরকেও কষ্ট দেওয়া। আর যেতে যখন হবেই......অমর হ'য়ে যখন কেউ আসে নি, তখন সুস্থ সবল দেহ নিয়ে চ'লে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়। আর এখন গেলে অকূলে কেউ ভেসে যাবে না। রামকুমার হাল ধ'রে সংসার-তরণী ঠিক নিয়ে যেতে পারবে। রামেশ্বরও কৃতী হ'তে চ'লেছে। অতএব সে চ'লে গেলে তরী অকূলে ডুববে না বা ছন্নছাড়া হ'য়ে কেউ ভেসেও যাবে না। সাময়িক শোকে একটু মুহ্যমান হবে। চোখে অন্ধকার দেখবে। ভাববে, সব বুঝি ডুবল। কিন্তু কয়েকদিন, তারপর সব ঠিক হ'য়ে যাবে। চোখের জল মুছে বুকে বল বাঁধবে। আজকের মত সেদিনও সংসারতরণী চালিয়ে নিয়ে যাবে। তবে

ঘূর্ণিপাকে যে প'ড়বে না, তা নয়। সে সময় তার কথাটা মনে ক'রবে। ভাববে......মানুষটা থাকলে হয়তো এই বিপদে প'ড়তে হ'ত না। ঠিক উদ্ধার ক'রে নিয়ে যেত। উদ্ধার আজ পর্য্যন্ত সে কিছুই করে নি। ক'রতে পারে কিনা তাও জানে না। শুধু রঘুবীরের উপর নির্ভর ক'রে সব বিপন্মুক্ত হ'য়ে জীবন-সায়াহ্নে চ'লে এসেছে ও পরিবারের সকলকে সেই শিক্ষাই দিয়ে এসেছে। অতএব তারাও রঘুবীরের উপর নির্ভর ক'রে তারই মত এগিয়ে যাবে।

তা ছাড়া তারও জীবনের সব সাধ-আহ্লাদ মিটে গেছে। চাওয়া পাওয়া আজ আর কিছু নেই। কি চেয়েছিল, কি পায় নি তার হিসাব-নিকাশও ক'রতে চায় না। যা পেয়েছে তাই ভাল। যা পায়নি তার জন্যে কোন দুঃখ বা ক্ষোভ নেই। এইটুকু রেখে যেতে পারলেই সে খুশী। তবে একমাত্র গদাধরের জন্যে আরও কিছুদিন বেঁচে থাকার বাসনা জাগে। তার মতিগতি, ভাবধারার পরিবর্ত্তন দেখে, সেই সঙ্গে অনাগত ভবিষ্যতের একটি চিত্র কল্পনা ক'রে নিয়ে যেতে পারলে আরো সুখী হ'ত। শান্তিতে যেতে পারত। কিন্তু তা বুঝি আর সম্ভব হয় না। বেশ বুঝতে পারে তার যাবার দিন সন্নিকট হ'য়ে এসেছে। জীবনের খেয়াতরী পারঘাটায় ভিড়তে বেশী দেরী নেই। এমনি নানাবিধ ভাবনা চিন্তা নিয়ে কখনো সুস্থ থেকে, কখনো অসুস্থতা নিয়ে ফাল্গুন পেরিয়ে আষাঢ়ে এসে পড়ে। সেই সঙ্গে পীড়াও বৃদ্ধি হয়।

গদাধর কিন্তু নির্ব্বিকার। পিতার পীড়া বা ভাবনাকাতর শুষ্ক শীর্ণ রোগপাণ্ডুর মুখচ্ছবি কিছুই তার গতিপথ ফেরাতে পারে না। আপন খেয়াল-খুশীতে এগিয়ে যায়। তার উপরে যখন কেউ কথা-প্রসঙ্গে মাকে তার বয়স জিজ্ঞাসা করে, আর তার উত্তরে চন্দ্রমণি যখন বলে, এই ছয় পেরিয়ে সাতে প'ড়েছে—তখন ভেবে নেয় সে খুব বড় হ'য়েছে। এখন যা খুশী তাই ক'রতে পারে। ক'রলে এখন আর কেউ ব'কবে না বা অশোভনও নয়।

অবশ্য সপ্তম বর্ষে প'ড়ে তিরস্কৃত হবার মত কোন কাজ করে নি সত্য, তবে তার ধারণা—এখন না ব'লে কোথাও যাত্রা, গান, কথকতা শুনতে গেলে কেউ কিছু ব'লবে না; কারণ এখন সে সাবালক হ'য়েছে। আর এই ধারণা জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে আগের তুলনায় অনেক দুঃসাহসিক কাজ ক'রে বসে। সঙ্গী সাথীরা যখন কোন ভীতি-সঙ্কুল স্থানের কথা ব'লতে ব'লতে ভয়ে শিউরে ওঠে, তখন সেকথা শুনে, উপেক্ষা ভরে হাসে।

তাকে হাসতে দেখে সঙ্গীরা ক্রুদ্ধ হয়। দৃঢ়কণ্ঠে বলে, কি তুই হাস্‌ছিস যে? সন্ধ্যের সময় একা একা ভুতির খালে যেতে পারিস?

গদাধর তেমনি হাসতে হাসতে বলে, খুব পারি।

ভুতির খাল—গ্রামের শ্মশান। লোকালয় থেকে খানিকটা দূরে। শুধু কামারপুকুর নয়, আশেপাশের অনেকগুলো গ্রামের লোকই ওখানে শবদাহ ক'রে। সন্ধ্যার পর কেন, দিবা দ্বিপ্রহরেই অনেকে একা যেতে ভয় পায়। পরিণত বয়স্ক লোকেদেরই গা ছম্‌ ছম্‌ করে। তাই ওকে কেন্দ্র ক'রে অনেক গল্প-গুজবই ছড়িয়ে গেছে। কেউ কেউ নাকি ওখানে ভূতপ্রেতদের অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ দেখেছে, অবশ্য দেখেছে কিনা দেখেছে তারাই জানে। তবে চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে, কপাল কুঁচ্‌কে, হাত নেড়ে, মুখের নানা আকৃতি ক'রে যখন বলে তখন বিশ্বাস না ক'রে কেউ পারে না।

বিশেষ ক'রে গদাধরের মত বালকদের বিশ্বাস ও ধারণা বদ্ধমূল হ'য়ে যায় এবং ওধারটা সভয়ে তারা এড়িয়ে চলে। তাই গদাধরের উক্তিটা দম্ভোক্তি মনে ক'রে একজন তাচ্ছল্যভরে বলে, যা যা, আর বাহাদুরী ক'রতে হবে না। ঢের দেখা আছে। আমার কাকা অমন সাহসী লোক, সেই বলে যেতে পারে না, আর উনি যাবেন! তাও দুপুরবেলা নয়, সন্ধ্যের পর। চালাকী করবার আর জায়গা পায় নি।

গদাধর কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না ক'রে সাধ্যমত গম্ভীর কণ্ঠে বলে, যদি পারি ? কি বাজী বল ?

কেউ বলে, কিন্তু তুই যে যাবি আমরা বুঝবো কি ক'রে ?

আর একজন বলে, গেলে না, আর এসে ব'লবে···গেছিলাম।

এ কথায় গদাধর আপমান বোধ করে। মুখ চোখ লাল হ'য়ে ওঠে। দৃঢ়কণ্ঠে বলে, আমি মিথ্যে কথা বলি নে। কি প্রমাণ চাস্ বল ?

গদাধর যে মিথ্যা কথা বলে না এ অবশ্য তারা জানে। প্রমাণ অনেক ক্ষেত্রেই পেয়েছে। কোন কিছু অন্যায় বা অপরাধ ক'রে ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নির্ভয়ে স্বীকারোক্তি দিয়েছে। এতটুকু ইতস্ততঃ করে নি বা ভীত হয় নি। তবে তাতে আর এতে অনেক তফাৎ। সেখানে সত্য কথা বলার জন্য হয়তো একটু তিরস্কার, নয় কিছু প্রহার। কিন্তু এই সাহসিকতা তার চেয়ে অনেক···অনেক শক্ত। জীবন পর্য্যন্ত সংশয়। দুষ্ট প্রেতাত্মারা প্রাণ পর্য্যন্ত বিনাশ করে। আর এ রকম ঘটনা তারা অনেক শুনেছে। কিন্তু গদাধরের নির্ভীক উক্তিতে বিচারবুদ্ধি হারিয়ে ফেলে। ভাবে সে মিথ্যা দম্ভ ক'রছে। তাই একজন বলে, প্রমাণ ?—একটা মড়ার মাথা আনিস, তাহ'লে আমরা বিশ্বাস ক'রবো।

সকলেই সমস্বরে তার প্রস্তাব সমর্থন করে। শুধু গয়াবিষ্ণু গদাধরের দিকে চেয়ে ভীতকণ্ঠে বলে, না না। তুমি যেও না ভাই, শেষকালে কি হবে······

গদাধর গয়াবিষ্ণুকে কথাটা শেষ করার অবকাশ না দিয়ে সগর্ব্বে দৃঢ় কণ্ঠে বলে, কি আবার হবে ? হুঁ—অত ভয় আমার নেই। বেশ, আজই যাবো। আর মড়ার মাথাও আনবো।

গদাধরের কথা শুনে কেউ বিশ্বাস করে, কেউ করে না। কিন্তু গয়াবিষ্ণু গদাধরের সঙ্কল্প সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়, কারণ গদাধর পাঠশালায় ঢোকার পর থেকে তার সঙ্গে সে নিবিড়ভাবে মিশেছে। প্রায় সময়ই সঙ্গে সঙ্গে ফেরে—একদিন একবেলা দেখা না হ'লে মনটা ব্যাকুল

হ'য়ে ওঠে। মনে হয়…কতদিন যেন দেখা হয় নি। কোন-কিছু ভাল খাবার জিনিষ পেলে তাকে না দিয়ে খেতে ইচ্ছা করে না। আর এই মেলা-মেশার ফলে গদাধরের ভালমন্দ সম্বন্ধে আপন জনের মতই আনন্দ ও বেদনা বোধ করে।

এই কারণে গদাধরও গয়াবিষ্ণুকে সব চেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু ব'লে মনে করে। সেও কোথাও কিছু ভাল খাবার জিনিষ পেলে তাকে না দিয়ে খায় না। কেউ তাকে নিমন্ত্রণ ক'রলে গয়াবিষ্ণুর নিমন্ত্রণও স্বীকার ক'রিয়ে নেয় এবং সঙ্গে নিয়ে খেতে যায়। প্রায় সময়ই এক সঙ্গে ফেরে। যত দুঃখ বেদনা, সংশয় সন্দেহ, আশা নিরাশা, বাসনা কল্পনা যা কিছু মনে আসে—যা অন্য কাউকে বলতে কুণ্ঠা বা লজ্জাবোধ করে—সে সব কথা গয়াবিষ্ণুকে অকপটে ব'লে পরামর্শ চায়।

গদাধরের মুখ চোখের অবস্থা দেখে গয়াবিষ্ণু নিঃসন্দেহ হয়—এ তার মিথ্যা দম্ভোক্তি নয়। তা ছাড়া নিবিড়ভাবে তার সঙ্গে মিশে সে বেশ জেনেছে…গদাধর যত অন্যায় ও অপরাধ করুক না কেন মিথ্যা কথা বলে না। আর ঝোঁকের মাথায় অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না ক'রে যদি কিছু ক'রবো বলে তা হ'লে সে ক'রবেই ক'রবে। মিথ্যাবাদী হবে না। তা সে জন্যে যদি মৃত্যুবরণ ক'রতে হয় তাও আচ্ছা কিন্তু পেছ্‌পাও হবে না। তবু আর একবার এগিয়ে এসে হাতখানা ধ'রে মুখের উপর মিনতি-করুণ দৃষ্টি তুলে কাতর অনুরোধ ক'রে বলে, না না ভাই! তুমি যেও না। গেলে আর ফিরে আসতে পারবে না, ভূতপ্রেতরা গলা টিপে মেরে ফেলবে। ব'লতে ব'লতে আর সেই ভয়াবহ দৃশ্যটা কল্পনা ক'রে ভয়ে শিউরে ওঠে। সেই সঙ্গে চক্ষু সজল এবং কণ্ঠ ভারী হ'য়ে আসে।

গয়াবিষ্ণুর সকরুণ অনুরোধ এবং অশ্রুসজল চোখের দিকে চেয়ে গদাধরের মনটাও দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ে। কি যে জবাব দেবে ভেবে পায় না। তাই ইতস্ততঃ করে।

গদাধরকে নীরব দেখে অন্যান্য সঙ্গীরা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে বিদ্রূপ করে বলে, কি ? আর যাবি ? হুঁ…খালি বড়াই…

কথাগুলো গদাধরকে যেন চাবুকের বাড়ি মারে। গয়াবিষ্ণুর কাতর অনুরোধ, অশ্রুসজল আঁখির মিনতি—সব ভেসে যায়। বেত্রাহত অশ্বের মত মনটা চাঙ্গা হ'য়ে ওঠে, তাই কিছুমাত্র দ্বিধা না ক'রে দৃঢ়কণ্ঠে বলে, যাবো।

সঙ্গে সঙ্গে একজন বলে, তুই যে বেলাবেলি গিয়ে একটা মড়ার মাথা এনে বাড়ীর আশেপাশে লুকিয়ে রেখে সন্ধ্যের পরে আমাদের দেখিয়ে বলবি নে—এই দেখ আমি এনেছি।—তার প্রমাণ কি ?

গদাধর প্রতিবাদ ক'রে ক্রুদ্ধস্বরে বলে, আমি মিথ্যা কথা বলি নে, আর বিশ্বাস না হয় সন্ধ্যের পরে তোরা আমার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের সীমানা পর্য্যন্ত যাস, তাহ'লে তো বিশ্বাস হবে ?

প্রস্তাবটা সকলের মনঃপুত হয়। শুধু গয়াবিষ্ণুর ভাল লাগে না। কিন্তু অনুরোধে যে আর ফল হবে না, তা ও বেশ বুঝতে পারে। তাই মনোক্ষুণ্ণ হ'য়ে নীরব থাকে।

তারপর সকলে পরামর্শ ক'রে সন্ধ্যের সময় হালদারদের পুকুরপাড়ে এসে গদাধরের জন্যে অপেক্ষা ক'রবে ও সঙ্গে নিয়ে গ্রামের শেষ সীমায় ছেড়ে দিয়ে আসবে স্থির ক'রে তখনকার মত যে যার বাড়ী চ'লে যায়।

দেখতে দেখতে বেলা যায়। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। গদাধরের মনে কিন্তু কোন ভয় বা ভাবনা জাগে না বরং বেশ একটা রোমাঞ্চ বোধ করে। ঐ শ্মশান সম্বন্ধে অনেক কথাই সে শুনেছে। তাই শুনে অনেকদিন থেকেই মনের মধ্যে একটা কৌতূহলও ছিল, কিন্তু চরিতার্থ করার কোন সুযোগ পায় নি বা এমন কোন পরিস্থিতিরও উদ্ভব হয় নি। অবশ্য এ পর্য্যন্ত দিনমানে ওধারে যে না গেছে তা নয়, তবে ঠিক শ্মশানে যায় নি। আর একা একাও যায় নি। সেই কারণে মনে কোন ভাবান্তর ঘটে নি। তবে ভয় তার কোনদিনই ছিল না

বা নেই। তা ছাড়া ভূতপ্রেতের নানাবিধ অলৌকিক গল্প শুনে শুনে একবার তাদের দেখার বাসনাও মনের মধ্যে বেশ দানা বেঁধে উঠেছে।

আজ ঘটনাচক্রে সেই সুযোগ উপস্থিত হওয়াতে মনে মনে বেশ একটু আনন্দই পায়। তাই যথানিয়েমে সন্ধ্যার আগে বাড়ী এসে হাজির হয় এবং সুযোগের প্রতীক্ষা ক'রতে থাকে।

সুযোগও উপস্থিত হয়। রঘুবীরের সন্ধ্যারতি দেখতে সবাই ঠাকুর-ঘরে আসে। গদাধরও এসে দাঁড়ায়, কিন্তু আরতি শেষ হবার আগেই ভক্তিভরে রঘুবীরকে প্রণাম ক'রে নিঃশব্দে বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে।

হালদারদের পুকুরপাড়ে এসে দেখে—শুধু গয়াবিষ্ণু ছাড়া আর সবাই এসে জড় হ'য়েছে ও উদ্‌গ্রীব হ'য়ে তার প্রতীক্ষা ক'রছে।

গয়াবিষ্ণুকে না দেখে গদাধর একটু নিরাশ হয়। আবার খুশীও হয় এই ভেবে যে, আর কেউ পিছু টানবে না, ফেরার জন্যে অনুরোধও ক'রবে না।

গদাধরকে সত্যই আসতে দেখে সকলেই বেশ বিস্মিত হয়। আগে ভেবেছিল শুধুই আস্ফালন। একা একা এই রাত্রে ঐ ভয়াবহ শ্মশানে সে যেতে পারবে না, ও···সেটা বুঝবে দিবা অবসান হ'লে। অন্ধকার রাত্রের রূপ দেখে নিজেই পিছিয়ে যাবে। দিনে যে দুঃসাহসিক কাজ করা সম্ভব রাত্রে তা সম্ভব নয়। আর যেখানে জীবন মরণ প্রশ্ন। প্রাণের মমতা সকলেরই আছে। কিন্তু সত্যই তাকে যথাসময়ে আসতে দেখে একজন বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, কি রে যাবি ?

গদাধর ঠোঁটের উপর আঙ্গুল তুলে দিয়ে চাপা স্বরে বলে, চুপ! আস্তে! কেউ যদি শোনে আর হয় তো যাওয়া হবে না। বাড়ী গিয়ে খবর দেবে। ব'লে আর তাদের কথা বলার অবকাশ না দিয়ে এগিয়ে যায়।

নিরুপায় ও জেদের বশবর্ত্তী হ'য়ে সকলেই তাকে অনুসরণ করে। তখনও ভাবে—তাদের সঙ্গছাড়া হ'লেই চৈতন্য হবে এবং ফিরবে। কিন্তু

গ্রামের পথপ্রান্তে এসে যখন তাদের দিকে চেয়ে বলে, এবার তোরা যা, বিশ্বাস হ'ল তো ?

এই রাত্রে···লোকালয়ের বাইরে···জনমানবহীন প্রান্তরে দাঁড়িয়ে যে সঙ্কল্প ত্যাগ না ক'রে নির্ভীক কণ্ঠে তাদের ফিরে যেতে বলে, সে যে শ্মশানে যাবেই এখন তারা বিশ্বাস করে, শঙ্কিতও হয়। কিন্তু শিশু-সুলভ দম্ভ এবং জেদের জন্যে ফেরার কথাও ব'লতে পারে না। এই কারণে গয়াবিষ্ণুকে আসতে নিষেধ ক'রে দিয়েছিল, কারণ সে থাকলে হয় তো যেতে দেবে না। গদাধর সেই সুযোগ নিয়ে ব'লবে—আমি তো যেতে চাইছিলাম, তোরাই তো যেতে দিলি নে। তাই কেউ আর কোন বাধা না দিয়ে নির্ব্বাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে এবং অর্থপূর্ণ দৃষ্টি তুলে এ-ওর মুখের দিকে চাওয়া-চায়ি করে।

গদাধর সঙ্গীদের ছেড়ে দৃঢ় পদক্ষেপে শ্মশানের দিকে একা একা এগিয়ে যায়।

যতক্ষণ দেখা যায় সকলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে, আর ভাবে এইবার বোধ হয় ফিরবে, কিন্তু ফেরা তো দূরের কথা—একবার পিছু ফিরেও চায় না বা ভ্রুক্ষেপও করে না ক্রমে ক্রমে দৃষ্টির বাইরে চ'লে যায়।

একজন মনে মনে ভাবে—গদাইকে ভয় লাগিয়ে ফেরাতে হবে। তাই সাধ্যমত চীৎকার ক'রে বলে, ওরে বাবা রে···মা রে···ধরল রে···বলার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের দিকে দৌড় দেয়। ঐ চীৎকার শুনে এবং একজনকে দৌড়াতে দেখে অন্যান্যরাও ভীত হ'য়ে গদাধরকে জনমানবহীন পথে রেখে তাকে অনুসরণ করে।

পঁয়ত্রিশ

সঙ্গীদের ছেড়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে গদাধরের মনটা বেশ দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ে। কেমন যেন ভয় ভয় করে। দিবা দ্বিপ্রহরে যেটা খুব সহজ-সাধ্য ভেবেছিল এখন দেখে সেটা তত সহজ নয়। আর রাত্রিটাও বেশ অন্ধকার। পথটা পরিচিত ব'লে এগিয়ে যেতে কোন অসুবিধা হয় না। কিন্তু আশেপাশে, নিকটে দূরে, কোন কিছু স্পষ্ট নির্ণয় করা যায় না। রাতের অন্ধকারে সব অস্পষ্ট ও রহস্যাবৃত হ'য়ে গেছে। তার উপরে আকাশও মেঘাচ্ছন্ন। তারাগুলো পর্য্যন্ত মেঘের আড়ালে ঢাকা প'ড়ে গেছে। মাঝে মাঝে এক একবার বিদ্যুৎ চম্‌কাচ্ছে বটে, কিন্তু তাতে চোখ ঝ'ল্‌সে অন্ধকার আরো নিবিড় হ'য়ে পথের নিশানা কেড়ে নিচ্ছে।

সহসা সঙ্গীদের ভীত কণ্ঠের চীৎকার ও দৌড়ানোর শব্দে গদাধর বিহ্বল হ'য়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। মনটা দুর্ব্বল হ'য়ে আসে। সংক্রামক ব্যাধির মত ভয় ও ভাবনা এসে চিত্তকে আরো শঙ্কিত ক'রে তোলে। সমস্ত শরীর অবশ হ'য়ে আসে। গাছপালা, ঝোপ-ঝাড়গুলো বিভীষিকা হ'য়ে চোখের উপর ভেসে ওঠে। একবার ভাবে—আর না, ফিরে যাই। ঘুরেও দাঁড়ায়, কিন্তু সঙ্গীদের কোন চিহ্ন না দেখে ও পিছনেও সমান অন্ধকার দেখে নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কি যে ক'রবে ভেবে পায় না। তবে মনোবল যে ভেঙ্গে প'ড়েছে—এটা বেশ বুঝতে পারে।

এই বয়সে অনেক দুঃসাহসিক কাজ সে ক'রেছে, যা তার মত বালকের পক্ষে করা সম্ভব নয় বা তার সঙ্গীরা কেউ ক'রতে পারে নি। পরন্তু তারাই তার দুঃসাহসিকতার কাহিনী শুনে প্রশংসা ক'রেছে। সেই প্রশংসার

বশীভূত হ'য়ে তারও ধারণা জন্মেছিল—দুঃসাহসিক অভিযানে সে আর পশ্চাৎপদ হবে না। অবশ্য যে সব জায়গায় সে একা একা গেছে তা প্রায় দিনমানে। তবে লোকালয়ের বাইরে এবং ভীতিশঙ্কুলও বটে। ফিরে এসে যখন ব'লেছে, আজ একা একা পীরের দর্গায় গিয়েছিলাম, দামোদরের মন্দিরে গিয়েছিলাম—শুনে তারা শিউরে উঠেছে। সেই সঙ্গে সবাই তার সাহসিকতার অকুণ্ঠ প্রশংসা ক'রেছে। সেও জনশ্রুতি শুনে অলৌকিক কিছু দেখবে ব'লেই গিয়েছিল। কিন্তু কিছুই দেখতে পায় নি। যাবার আগে তার যে একটু ভয় হয় নি তা নয়। যথাস্থানে পৌঁছে ভয়, ভাবনা, সন্দেহ, সংশয়ের কিছুই খুঁজে পায় নি। মনটা যেন কি এক রকম হ'য়ে গিয়েছিল। এমন কি বাড়ী-ঘর, বাপ-মা, ভাই-বোন কারো কথা মনে ছিল না। কেমন যেন হতবুদ্ধি হ'য়ে গিয়েছিল। মনে হ'য়েছে—এ তার খুব চেনা জায়গা। অনেকবার এসেছে। কিন্তু সে যে কবে…তা কিছুতেই মনে ক'রতে পারে নি। এইসব স্থানে একা একা যাওয়ার ফলে ভয় ভাবনা তার কিছুই ছিল না। নিজের সাহসিকতার পরিধিও ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

আজ কিন্তু এই অন্ধকার রাত্রে, জনহীন উন্মুক্ত প্রান্তরে, মেঘাচ্ছন্ন আকাশ তলে দাঁড়িয়ে মনে হয়—জীবনে এক সাহসিকতার চরম পরীক্ষার সম্মুখীন হ'য়েছে। আর এ পরীক্ষা তারাই দিয়েছে, যাদের কোন কামনা নেই, বাসনা নেই, জীবনের কোন মায়া নেই, মরণের কোন ভয় নেই।

এই সব তত্ত্বচিন্তা করার বয়স তার নয়। কামনা-বাসনা, জীবন-মরণ তার মত বালকদের কাছে অর্থহীন কয়েকটি শব্দ মাত্র। জীবনের অর্থ তাদের কাছে অস্পষ্ট। ক্ষিদের সময় চারটি খেতে পেলে ও সারাদিন খেলে বেড়াতে পারলে যারা ভাবে দিনটা বেশ গেল।—এই যাদের কাছে বেঁচে থাকার সার্থকতা, তাদের মনে এই সব দার্শনিক চিন্তা আসা উচিৎ নয় বা আসেও না। কিন্তু গদাধরের মনে সেই চিন্তাগুলোই আসে।

যদিও সে বালক। বয়স তার মাত্র সাত বৎসর। কিন্তু সৎ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বংশে জন্মগ্রহণ করার ফলেই হোক অথবা ভাগবত পাঠ শুনেই হোক, মনে তার অনেক অধ্যাত্ম চিন্তা এর মধ্যেই এসে বাসা বেঁধেছে। যেটা বুঝতে না পারে সেটা পিতাকে জিজ্ঞাসা ক'রে জেনে নেয়। একা একা থাকলে তা নিয়ে ভাবে। ভাবতে ভালোও লাগে। নিজের মতন ক'রে একটা সমাধান ক'রে নেয়। তাই বয়সের তুলনায় অনেক বেশী এগিয়ে এসেছে। কামনা বাসনা,জীবন মরণ তার মত বয়সের বালকের কাছে অর্থহীন কতগুলো শব্দ হ'লেও তার কাছে সেগুলো উপভোগ্য। স্পষ্ট না হলেও একটা অস্পষ্ট ধারণা সে ক'রে নিয়েছে। তার উপরে এই পরিস্থিতিতে পড়ে সেটা আরো অর্থপূর্ণ হ'য়ে তাকে খুব ভাবিয়ে তোলে।

সহসা মনে পড়ে—পিতা ব'লেছিল বিপদে প'ড়লে রঘুবীরকে ডাকতে। কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার যেন সাহস পায়। তাই আর দ্বিধা না ক'রে রঘুবীরকে মনে মনে স্মরণ ক'রে শ্মশানের দিকে এগিয়ে যায়।

শ্মশান তখনও অনেকখানি দূরে। নিবিড় অন্ধকারের জন্যে দূর থেকে স্থানটা ঠিক নির্ণয় ক'রতে পারে না। শুধু অনুমানের উপর এগিয়ে চলে। রঘুবীরকে স্মরণ করার পর থেকে ধীরে ধীরে মনটা ভয়মুক্ত হয়। আর সেই সঙ্গে মনে হয়...রঘুবীর যেন তার সঙ্গে সঙ্গে চ'লেছে। যদিও তাকে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু ধারণাটা বদ্ধমূল হ'য়ে তাকে অনুপ্রাণিত ক'রে এগিয়ে নিয়ে যায়। একবারও মনে পড়ে না...বাড়ীর কথা, বাপ-মার কথা, ফিরে যাবার কথা, দাদাদের কঠিন শাসনের কথা। সব-কিছু ভুলে যেন নেশার ঝোঁকে এগিয়ে চলে।

শ্মশানে যাবার কোন প্রশস্ত পথ নেই। কৃষি ক্ষেতের আলের উপর দিয়ে পথ। তাও সমতল নয়। আঁকা-বাঁকা, উঁচু নীচু। এক হাতের বেশী চওড়া নয়। স্থানে স্থানে তাও আবার সঙ্কীর্ণ। মাঠের মধ্য দিয়েও

যাবার উপায় নেই। কারণ মাঠে তখন ধান লাগানো হ'য়েছে। যেতে গেলে ধানগাছগুলো মাড়িয়ে যেতে হয়। অবশ্য গেলে এখন তা আর কেউ দেখতে পাবে না বা তার জন্য কিছু ব'লবেও না। বরং এই সঙ্কীর্ণ পথের উপর দিয়ে টলতে টলতে যাওয়ার চেয়ে অনেক আরামদায়ক। তবে ধানের ক্ষতি হবে। অকারণ সে মানুষের কোন ক্ষতি করে নি, বা ক'রতে চায় না। তাই সেই সঙ্কীর্ণ আলের উপর দিয়েই হোঁচট খেয়ে টলতে টলতে শ্মশানে এসে ওঠে।

মানুষের সাড়া পেয়ে শ্মশানচারী জীবগুলো ছুটে পালায়। কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ ক'রে ডেকে ওঠে। শিয়ালগুলোকে পালাতে দেখে এবং কুকুরগুলো ডেকে ওঠাতে গদাধর চ'ম্‌কে ওঠে। বিদ্যুতের আলোয় পায়ের কাছে একখানা চেলাকাঠ দেখে আত্মরক্ষার জন্যে তাড়াতাড়ি তুলে নেয় ও কুকুরগুলোকে লক্ষ্য ক'রে আন্দোলিত করে। কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ ক'রতে ক'রতে ছুটে পালায়।

গদাধর এবার বেশ নিশ্চিন্ত হ'য়ে ক্লান্তিবশতঃ ভালমন্দ বাছবিচার না ক'রেই সেখানে ব'সে পড়ে। কৌতূহলের সঙ্গে চারিদিকে চায়। দেখে··· একটা চিতা তখনও জ্ব'লছে। সেই আগুনে কিছুটা জায়গা আলোকিত হ'য়ে আছে। নির্ব্বাপিত প্রায় চিতার উপর একটা ভাঙ্গা কলসী বসানো আছে। চিতার সন্নিকটে মৃতের জরাজীর্ণ অন্তিম শয্যা। বাঁশ, দড়ি, অব্যবহার্য্য মরিচা-ধরা একখানা কাটারী ইত্যাদি ছড়ানো রয়েছে। সেই সঙ্গে কয়েকটা মড়ার খুলি ও নরকঙ্কালও চারিদিকে প'ড়ে থাকতে দেখে।

ইতিপূর্ব্বে কোনদিন তার শ্মশানভূমিতে আসার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য হয় নি। তবে শ্মশান সম্বন্ধে অনেক কথা, বিচিত্র গল্প, বহু কাহিনী সে শুনেছে। শুনে একটা কৌতূহলও জন্মেছিল। বিশেষ ক'রে দেবাদি-দেব মহাদেব কেন শ্মশানচারী? কেন তিনি ইন্দ্রলোক ছেড়ে শ্মশানে মশানে ফেরেন? কিসের আকর্ষণে? ভাগবতে সতীর দেহত্যাগ

কাহিনী শুনেই সেটা জানার বাসনা জন্মেছিল। এই রহস্য চরিতার্থ করার আকাঙ্ক্ষাই তাকে এই মেঘ-মন্দ্রিত আষাঢ়ের নিবিড় অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রে বিপদশঙ্কুল ভয় ভাঙিয়ে আকৃষ্ট ক'রে এনেছে।

শিয়াল কুকুরগুলো পালিয়ে যাবার পর আবার স্তব্ধতা ঘনিয়ে আসে। শুধু একটানা ঝিঁঝির শব্দ ও দু'একটা রাতচরা পাখীর চীৎকার সেই জনহীন শ্মশানের নীরবতাকে ভেঙে দিয়ে চ'লেছে।

গদাধর দৃষ্টি বিস্ফারিত ক'রে সেই অন্ধকারের মধ্যেই চারিদিকে নিক্ষেপ করে। খালের ধারে দু'চারটে খেজুর গাছ ও ঝোপ-ঝাড় ছাড়া আর কিছুই নির্ণয় ক'রতে পারে না। কৌতূহলী বিস্মিত দৃষ্টিটা চারিদিক থেকে কুড়িয়ে এনে আবার চিতার উপর নিবদ্ধ করে।

সে শুনেছে—চিতা না নিভিয়ে যেতে নেই। তবে শবযাত্রীরা নিভিয়ে গেল না কেন ? হয় তো সন্ধ্যা ও আকাশে মেঘের ঘটা দেখে তাড়াতাড়ি স'রে প'ড়েছে। নিভ্‌ল কি না নিভ্‌ল তা আর দেখার অবসর পায় নি। তার উপরে উন্মুক্ত প্রান্তরের তীব্র বায়ুবেগ সেটাকে পুন-প্রজ্জ্বলিত ক'রে তুলেছে।

সেই চিতার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে ঐ চিতায় যে ভস্ম হ'য়ে গেল তার কথাটা মনে হয়ঃ যে আজ ঐ চিতার আগুনে পুড়ে গেল হয়তো কালও সে তার মরণের কথা চিন্তা ক'রতে পারে নি। তখনও হয় তো ভেবেছিল সেরে উঠবে। জীবনের সব অপূর্ণ সাধ-আহ্লাদ পরিতৃপ্ত ক'রে নেবে। স্ত্রী-পুত্র-কন্যার যত কিছু আদর আব্দার একে একে মিটিয়ে দেবে। কিন্তু মহাকাল আর সে অবসর দিল না।

জীবের ও জীবনের পরিণাম তার চোখের উপর ছবির মত ভেসে ওঠে। ভাবনাটা আরো বিস্তৃতি লাভ করে। বয়সের গণ্ডী ভুলিয়ে দূর দূরান্তরে নিয়ে যায়। মৃত্যুর পর মানুষ কোথায় যায় সেই কথাটা মনের মধ্যে এসে উদয় হয়। দূর আকাশের দিকে তাকিয়ে প্রশ্নের সমাধান খোঁজে। কিন্তু খুঁজে পায় না। আবার দৃষ্টিটা নামিয়ে এনে চিতার উপর নিবদ্ধ

করে। মনের একাগ্রতা নিয়ে ভাবতে শুরু করে। ভাবতে ভাবতে কেমন যেন আচ্ছন্ন হ'য়ে যায়। মনে বিস্মৃতি ঘনায়। বাড়ীর কথা, ফেরার কথা, রাত্রির কথা সব ভুলে মন তার মৃত্যুপারে রহস্যলোকের সন্ধানে ছুটে চলে।

হঠাৎ কতকগুলো অদৃশ্য পদধ্বনিতে তন্ময়তা টুটে যায়। মনটা দূর শূন্য থেকে ফিরে আসে। চ'মকে উঠে চারিদিকে চায়। দেখে কতকগুলো অস্পষ্ট ছায়ামূর্ত্তি তাকে ঘিরে জোড় হাতে দাঁড়িয়ে আছে। বালক হ'লেও এবং স্পষ্ট ধারণা না থাকলেও বেশ বুঝতে পারে—এরা প্রেতাত্মা। দেখে ভয় পায় না বা বিহ্বলও হয় না। শুধু বুঝতে পারে না—জোড় হাতে তার দিকে চেয়ে থাকার কারণটা! তাই কৌতূহলী হ'য়ে প্রশ্ন করে, তোমরা জোড় হাত ক'রে দাঁড়িয়ে আছো কেন?

উত্তর পাবার আগেই ছোটদার কণ্ঠস্বর ও আহ্বান কাণে ভেসে আসে। সঙ্গে সঙ্গে ছায়ামূর্ত্তিগুলি মিলিয়ে যায়। সেও চ'মকে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। সাড়া দিয়ে চীৎকার ক'রে বলে, এই যে আমি এখানে —যাচ্ছি। সব কৌতূহল ও রহস্য অতৃপ্ত রেখে শ্মশান ছেড়ে বেরিয়ে আসে।

গদাধরের সাড়া পেয়ে রামেশ্বর উৎফুল্ল হয়। কিন্তু কণ্ঠস্বরে তার কোন আভাস না দিয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ভর্ৎসনার সঙ্গে বলে, এধারে আয় হতভাগা! আজ তোর একদিন কি আমার একদিন। কোন্ সাহসে এই রাতে তুই একা একা শ্মশানে এলি? ভয় ডর ব'লে তোর কি কিছুই নেই?

ভয় ডর তার সত্যিই কিছু নেই। যেটুকু ছিল আজ চিতার আগুনে তাকে পুড়িয়ে দিয়ে এসেছে। ভূত, প্রেত, শ্মশান মশানের বিভীষিকা চির জীবনের মত শেষ ক'রে দিয়ে এসেছে। কিন্তু কোন কথার জবাব না দিয়ে অপরাধীর মত নত মস্তকে রামেশ্বরের সম্মুখে এসে দাঁড়ায়।

রামেশ্বর আলোটা তুলে বিস্মিত ও বিস্ফারিত নেত্র গদাধরের মুখের উপর ফেলে। দেখে—একটা অদ্ভুত ভাব মুখখানাকে মণ্ডিত ক'রে আছে।

সে ভাব সহসা কোন মানুষের মধ্যে দেখা যায় না। জপ তপ করে ওঠার পর শুধু তার পিতার মধ্যে দেখেছে। কেমন যেন উদাস, ভাবনাহীন, প্রশান্ত মূর্ত্তি। দেখে বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়। আর তিরস্কার ক'রতে ইচ্ছা হয় না তার পরিবর্ত্তে বুকের মধ্যে স্নেহ ও মমতা জাগে। তাই কাছে টেনে নিয়ে সস্নেহে বলে, চ বাড়ী চ। দেখ তো রাত কত হ'য়ে গেছে। বাবা মা ভাবচে।

দাদার কথার ও ভাবের পরিবর্ত্তন দেখে গদাধর বিস্মিত হয়। লাঞ্ছনা গঞ্জনার পরিবর্ত্তে সহৃদয় ব্যবহার তাকে ভাবিয়ে তোলে। কিন্তু কারণ খুঁজে পায় না। আশ্বস্ত হ'তে বলে, ঐ যাঃ! মড়ার মাথা আনতে ভুলে গেলাম যে! ব'লে শ্মশানের দিকে আবার ঘুরে দাঁড়ায়।

রামেশ্বর বাধা দিয়ে বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, মড়ার মাথা? কি হবে?

গদাধর বলে, আমার শ্মশানে আসার প্রমাণ। ওরা দেখতে চেয়েছিল।

রামেশ্বর গদাধরকে বুকের কাছে টেনে বাড়ীর পথে এগিয়ে যেতে যেতে বলে, আর যেতে হবে না—এখন বাড়ী চল। বাবা মা ভাবছে।

গদাধর কি ভেবে আর কোন কথা না বলে দাদার সঙ্গে সঙ্গে নির্ব্বিবাদে বাড়ী আসে।

রামেশ্বরের মুখে গদাধরের এই শ্মশান-অভিযানের কাহিনী শুনে সবাই স্তম্ভিত হ'য়ে যায়। চন্দ্রমণি ভয়ে শিউরে ওঠে। পুত্রকে নিবিড় স্নেহে বুকের ভেতর টেনে নিয়ে অনুযোগের সঙ্গে বলে, বাবা বাবা! এ দস্যি ছেলেকে নিয়ে কি করি! এই রাত্রে একা একা শ্মশানে গেল! এতটুকু ভয় ডর হ'ল না। তারপর রামেশ্বরের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করে, তা তুই কি ক'রে জানলি যে গদাই শ্মশানে গেছে?

রামেশ্বর মার কথার জবাবে বলে, গয়াবিষ্ণুর কাছে শুনলাম উনি তার বন্ধুদের সঙ্গে বাজী ফেলে শ্মশানে গেছেন। গয়াবিষ্ণুর কাছে শুনে ঐ ধারে গিয়ে চীৎকার করে নাম ধ'রে ডাকতেই সাড়া পেলাম। আমি তবু শ্মশান

থেকে অনেক দূরে ছিলাম। তাতেও আমার গা ছম্ ছম্ ক'রছিল। আর ও একা শ্মশানের মধ্যে গিয়ে কি ক'রে যে ব'সেছিল সে কথাই সারা পথ ভাবতে ভাবতে এলাম।

ক্ষুদিরামও গদাধরের মুখের দিকে চেয়ে সব শোনে। সেই সঙ্গে লক্ষ্য করে তার ভাবনাবিহীন চিন্তাশূন্য মুখচ্ছবি। তখনো শ্মশান-বৈরাগ্য অন্তরটা ছেয়ে আছে। আর তার প্রতিবিম্ব মুখমণ্ডলের উপর ফুটে উঠেছে। মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে মনে পড়ে—জন্মের সঙ্গে সঙ্গে ভস্মাচ্ছাদিত কলেবর। আর এই শ্মশান-অভিযান। আজ আর পুত্রের ভবিষ্যৎ বুঝতে দেরী হয় না। অনাগত দিনের সে চিত্র চোখের উপর ভেসে আসে। সেই দিকে চেয়ে দেখে—কামগন্ধলেশহীন, সর্ব্বাসক্তি মুক্ত, বাসনা আর লালসাকে পদানত ক'রে ব'সে আছে এক মুক্ত পুরুষ সর্ব্ব জীবকে কলুষমুক্ত ক'রতে। পরমাত্মাকে মহাশূন্যের পথ দেখাতে। সেই চিত্র দেখে ক্ষুদিরামের সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হ'য়ে ওঠে। নয়নে ভাবাশ্রু নেমে আসে। সে ভাব লুকোবার জন্য তাড়াতাড়ি উঠে ঘরে এসে ঢোকে।

চন্দ্রমণি স্বামীকে নির্ব্বাক হ'য়ে উঠে যেতে দেখে কয়েক মুহূর্ত্ত বিস্মিত ভাবে চেয়ে থাকে। তারপর গদাধরকে নিয়ে রান্নাঘরে চলে যায়।

●

ছত্রিশ

রাত্রে বিছানায় শুয়ে গদাধর শ্মশানের সেই দৃশ্য আর তার ভাবনাগুলো এড়াতে পারে না। মরণের পরে মানুষ কোথায় যায়—এই রহস্য উদ্‌ঘাটন করার জন্য মনটা তখনো আকুলি-বিকুলি করে। রহস্যটা সে ঠিক জেনে নিতে পারতো, যদি ছোড়দা গিয়ে ও-সময় তাকে না ডাকতো। ঐ প্রেতাত্মা-

গুলোই তাকে বলে দিত, তারা কোথায় আছে, কেমন আছে, আর সব মানুষ মরে সেখানেই যায় কিনা! এই সব আবোল-তাবোল ভাবতে ভাবতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ে।

সকাল বেলা ঘুম থেকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সব ভুলে যায়। গত রাত্রের যত চিন্তা ভাবনা আর কিছু মনে আসে না। শুধু মনে থাকে শ্মশানের ভয়াবহ রূপটা। ভাবে—কতক্ষণে সে তার সঙ্গীদের দুঃসাহসিক অভিযানের কথাটা ব'লবে। তাই অন্যান্য দিনের তুলনায় বিশেষ ব্যস্ততা সহকারে পাঠশালায় যাবার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে নেয়। কিন্তু বই শ্লেট নিয়ে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রমণি যখন বলে, গদাই, তোমাকে আজ আর পাঠশালায় যেতে হবে না। আবার গিয়ে তো ঐ রকম একটা কাণ্ড ক'রে ব'সবে। তার চেয়ে বাড়ী ব'সে পড়ো।

মার কথায় গদাধর শূন্য থেকে সবেগে মাটিতে এসে পড়ে। ঘুম থেকে উঠে যত কিছু ভেবেছিল—সবই অকারণ হ'য়ে যায়। তার অমন বিচিত্র অভিযানের রোমাঞ্চকর কাহিনীটার যেন আর কোন অর্থ খুঁজে পায় না। যারা তার সাহসিকতা সম্বন্ধে সন্দিহান ছিল, নানা মন্তব্য ক'রেছিল, তাদের কাছে যদি ব'লতেই না পারল, তবে এ বাহাদুরী ক'রে লাভ কি হ'ল? কিন্তু মার আদেশ লঙ্ঘন করার সাহসও তার নেই, ইচ্ছাও করে না। তাই নীরবে নত মস্তকে ক্ষুণ্ণ মনে দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনীটা বলার লোভও মন থেকে মুছে ফেলতে পারে না। লেখাপড়ার কথা ভুলে কেবল সুযোগের চিন্তা করে।

সকাল গিয়ে বেলা মধ্যাহ্ন আসে, কিন্তু সুযোগ আর আসে না। মা যেন আজ দুটো চোখ আর মন তারই দিকে প্রহরীর মত ক'রে রেখেছে। সদরের দিকে যেই একটু এগিয়ে গিয়েছে অমনি সঙ্গে সঙ্গে ডেকে ওঠে, গদাই!

মার ডাকে গদাধর চ'মকে ওঠে। সব চেষ্টা কৌশল ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়। সাধ্যমত মুখের প্রশান্তিটা বজায় রেখে জিজ্ঞাসা করে, কি মা?

পুত্রের সন্তর্পণে এগিয়ে যাবার দৃশ্যটা চন্দ্রমণির দৃষ্টি এড়ায় না। নিষেধ করার পর সে যে মনোক্ষুণ্ণ হ'য়েছে তা বেশ বুঝতে পারে। সুযোগ নেবে এটাও বেশ অনুমান ক'রে নেয়। তাই দৃষ্টি ও মন সতর্ক ক'রে রাখে। আর গদাধরকে সেই সুযোগ নিতে দেখে রুক্ষকণ্ঠে বলে, কোথায় যাচ্ছ ?

গদাধর মিথ্যা কথা বলে না। তাই চুপ ক'রে থাকে।

চন্দ্রমণি আদেশের সুরে বলে, এধারে এস।

মার কাছে ধরা প'ড়ে যাওয়ায় লজ্জায় গদাধরের মুখখানা লাল হ'য়ে ওঠে। নির্ব্বুদ্ধিতা ও অসতর্কতার জন্য মনে মনে নিজেকেই নিজে ধিক্কার দেয়। দ্বিরুক্তি না ক'রে কুণ্ঠিত পদে রান্নাঘরে গিয়ে ওঠে।

পুত্রের লজ্জাকরুণ মুখের দিকে চেয়ে চন্দ্রমণির কোন মমতা জাগে না। আগের মতই রুক্ষকণ্ঠে বলে, শুধু বাইরে বাইরে থাকতে ভাল লাগে। একটু অন্যমনস্ক হ'য়েছি অমনি সুড় সুড় ক'রে বেরিয়ে যাচ্ছ। তারপর আদেশের সুরে বলে, কোথাও যাবে না। ছোট বোনটার সঙ্গে খেলা কর।

গদাধর ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ মনে মার আদেশ পালন করে।

দ্বিপ্রহরে অন্যান্য দিনের মত ধনী, প্রসন্ন ও আরো দু'চারজন পাড়া-প্রতিবেশিনী আসে। ধনী গদাধরকে এ সময়ে বাড়ীতে দেখে কারণ জিজ্ঞাসা করে।

চন্দ্রমণি চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে যতদূর সম্ভব পুত্রের শ্মশান-অভিযানের কাহিনী বলে। ব'লতে ব'লতে নিজেই ভয়ে শিউরে ওঠে।

সকলে শুনে শুধু বিস্মিত হয় না, স্তম্ভিত হ'য়ে যায়। সহসা কেউ আর কথা ব'লতে পারে না। সাত বছরের ছেলের এই দুঃসাহসিকতার কাহিনী শুনে গদাধরের উপর ধনীর স্নেহ, প্রীতি, শ্রদ্ধা, ভালবাসা শতগুণে উথলে পড়ে। অনন্যসাধারণ ব'লে মনে হয়। তার মুখ থেকে বিস্তারিত

শোনার কৌতূহল ও আগ্রহ বেড়ে ওঠে। তাই সে-ই সর্ব্বাগ্রে নীরবতা ভেঙ্গে গদাধরকে ডাকে।

ধনীর ডাকে গদাধর রান্নাঘরে আসে। তার মুখের উপর কৌতূহলী দৃষ্টি তুলে জিজ্ঞাসা করে, কি ধাইমা ?

ধনী গদাধরকে কোলের কাছে টেনে নেয়। গায়ে মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে কাল রাত্রে শ্মশানে যাবার সময় তার ভয় ক'রেছিল কিনা, সে কথা জিজ্ঞাসা করে।

ধনীর কথায় গদাধরের রুদ্ধ আবেগ যেন ফেটে বেরুবার পথ পায়। এতক্ষণ পরে মনে হয় শ্মশানযাত্রা সার্থক হ'য়েছে। তাই উচ্ছ্বাসের সঙ্গে একে একে সমস্ত ব'লে যায়। তার ভয়টা রঘুবীরকে ডাকার পর কেমন ক'রে চ'লে গেল। মনের মধ্যে কি ভাবের উদয় হ'য়েছিল। পরিশেষে প্রেতাত্মাদের পদধ্বনি শুনে তার সেই ভাব নষ্ট হ'য়ে যাবার কথা। তাদের জোড় হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে কি প্রশ্ন ক'রেছিল। তারপর ছোটদা ডেকে ওঠাতে ছায়ামূর্ত্তিদের মিলিয়ে যাওয়া ও তার শ্মশান থেকে উঠে আসা।

শুনতে শুনতে সকলেরই নিঃশ্বাস রুদ্ধ হ'য়ে আসে। কাহিনীটা ছবির মত চোখের ওপর ভেসে ওঠে। শ্মশানে না গিয়েও যেন স্পষ্ট দেখতে পায়। ভয়ে তারা শিউরে ওঠে। ভুলে যায় দিবা দ্বিপ্রহরে ক্ষুদিরাম চাটুয্যের রান্নাঘরের দাওয়ায় ব'সে আছে।

অভিজ্ঞতার কথা ব'লতে ব'লতে গদাধরের মধ্যেও শ্মশান-বৈরাগ্য এসে উদয় হয়। সেও তাই বয়সের ধর্ম্ম ভুলে চপলতা ও চঞ্চলতা হারিয়ে নির্ব্বাক হ'য়ে ব'সে থাকে।

ধনী প্রথম মৌনতাকে ভেঙ্গে দিয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চন্দ্রমণিকে লক্ষ্য ক'রে বলে, এ ছেলে তোমার ঘরো হবে না বৌদি !

ধনীর কথা শুনে চন্দ্রমণিও একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে, কি জানি ভাই, রঘুবীরের যা ইচ্ছে তাই হবে।

গল্প শুনতে শুনতে বেলার দিকে কেউ লক্ষ্য করে না। সেই তন্ময়তা ভেঙ্গে যেতে প্রসন্ন গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে, আর না। বেলা প'ড়ে এল। এবার যাই।

প্রসন্নর কথায় সকলেরই হুঁস হয়। সবাই চঞ্চল হ'য়ে ওঠে। যাবার জন্য প্রস্তুত হয়।

বেলার দিকে চেয়ে চন্দ্রমণি আর কাউকে বসবার জন্য পীড়াপীড়ি করে না। কারণ তারও সংসারের অনেক কাজ প'ড়ে আছে। তাই সেও সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ে। উদাস কণ্ঠে বলে, হ্যাঁ, বেলা প'ড়ে এল।

কেউ আর কোন কথা না ব'লে চন্দ্রমণির কাছে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে আসে।

সকলে চ'লে গেলে চন্দ্রমণি সংসারের দু'একটা কাজ সেরে নেয়। তারপর গদাধরকে চারটি মুড়ি দিয়ে গা ধুতে ও জল আনতে ঘাটে যায়।

মা বেরিয়ে যেতে গদাধরের সুযোগ উপস্থিত হয়। মনটা সঙ্গীদের জন্য ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে। শ্মশান-অভিযানের কথা বলা ছাড়াও অন্যান্য অনেক বিষয় আলোচনার আছে। একটা যাত্রার দল গঠন করার কথা। কাকে কি চরিত্র দেওয়া হবে তার একটা পরামর্শ করা। এমন কি সময়, সুযোগ ও সকলকে পাওয়া গেলে একবার মহড়া দিয়ে দেখা—কার দ্বারা কি চরিত্র হ'তে পারে। তাই মা ঘাটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুড়ি ক'টা আর বাড়ীতে না খেয়ে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

মাঠে এসে যখন উপস্থিত হয় তখন বেলা প'ড়ে এসেছে। সূর্য্যদেব অস্তাচলে। তার শেষ রশ্মিতে পশ্চিমের আকাশটা রাঙা ক'রে তুলেছে। কিন্তু আষাঢ়ের খণ্ড খণ্ড কালো মেঘ দুষ্টু ছেলের মত এসে মাঝে মাঝে বিবর্ণ ক'রে দিয়ে যাচ্ছে এবং সেই মেঘের মধ্য দিয়ে পক্ষ বিস্তার ক'রে উড়ে চ'লেছে শ্বেতবলাকার দল। আর নীচে যতদূর দৃষ্টি চলে —চারিধারে শুধু উন্মুক্ত প্রান্তর। সেই প্রান্তরে নবীন ধান্য সবুজের

আস্তরণ বিছিয়ে ব'সে আছে। কখনো কখনো সজল হাওয়ায় দুলে দুলে উঠছে।

গদাধর শিল্পী। প্রকৃতিকে সে ভালবাসে। সুযোগ পেলেই প্রকৃতির আকর্ষণে বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। তার বিচিত্র রূপ প্রাণ ভ'রে দেখে। দেখতে দেখতে মনে নেশা ধরে। তন্ময় হ'য়ে যায়। স্থান কাল কিছু মনে থাকে না। কিন্তু আজকের আষাঢ় আকাশের বিচিত্র রূপ, অস্তগামী সূর্য্যের বর্ণচ্ছটা, আর তারই মধ্যে খণ্ড খণ্ড ভেসে-যাওয়া কালো মেঘের সঙ্গে বলাকাশ্রেণীকে উড়ে যেতে দেখে মনে তার অদ্ভুত নেশা লাগে! দূর আকাশের দিকে দৃষ্টি বিসারিত ক'রে বিস্মিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এমন কি মুখের মুড়ি ক'টা পর্য্যন্ত গলাধঃকরণ ক'রতে ভুলে যায়। মনে পড়ে যায় গত রাত্রের কথা। বলাকাশ্রেণীর সঙ্গে সঙ্গে তারও মন দেহ থেকে বেরিয়ে মৃত্যুপারের রহস্য জানতে ঊর্দ্ধলোকে ছুটে যায়। এক অনির্ব্বচনীয় ভাব এসে তাকে আচ্ছন্ন ক'রে তোলে। ক্রমে সে ভাবাবিষ্ট হ'য়ে ধান ক্ষেতের আলের উপর লুটিয়ে পড়ে।

গদাধরকে দূর থেকে দেখতে পেয়ে তার সঙ্গীসাথী রাখাল ছেলেরা উৎফুল্ল হয়। গরু ছেড়ে তার দিকে ছুটে আসে। কিন্তু গদাধরকে নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকার পর হঠাৎ প'ড়ে যেতে দেখে বিস্মিত হয়। নাম ধ'রে ডাকতে ডাকতে আরো দ্রুতবেগে কাছে ছুটে আসে। গায়ে হাত দিয়ে ডাকাডাকির পরও সাড়া না পেয়ে ভয় পায়। দু'জন বাড়ীতে সংবাদ দিতে ছুটে যায়। কেউ কেউ কাপড়ের আঁচল ভিজিয়ে জল এনে চোখেমুখে ঝাপ্‌টা দেয়। কেউ আঁচল দিয়ে হাওয়া করে।

গয়াবিষ্ণু গদাধরের বাড়ী গিয়ে তাকে না পেয়ে মাঠে আসে। কিন্তু এসে গদাধরকে সংজ্ঞাশূন্য অবস্থায় দেখে যেমন ভয় পায়, তেমনি বিহ্বল হ'য়ে পড়ে। চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসে। কি ক'রলে যে গদাধর সুস্থ হ'য়ে উঠবে ভেবে পায় না। শুধু তার শিয়রে এসে ব'সে পড়ে। মাথাটা কোলের উপর তুলে নেয়। একাগ্র দৃষ্টি মুখের উপর ফেলে

নীরবে কাঁদে। আর মনে মনে বলে, ঠাকুর, গদাইকে ভাল ক'রে দাও।

চন্দ্রমণি ঘাট থেকে ফিরে গদাধরকে বাড়ীতে না দেখে যেমন বিরক্ত হয়, তেমনি ক্রুদ্ধ হয়। জলের কলসীটা রান্নাঘরের দাওয়ায় নামিয়ে রেখে নাম ধ'রে ডাকে। সাড়া না পেয়ে ক্রোধে ফেটে পড়ে। চীৎকার ক'রে আপন মনে বলে, যেই ঘাটে গেছি অমনি বেরিয়ে গেছে। এ ছেলেকে নিয়ে কি যে করি···আবার একটা অনাসৃষ্টি কাণ্ড না ক'রে আসে। কথাটা শেষ হ'তে না হ'তে সংবাদবাহী ছেলে দু'টো ছুটতে ছুটতে বাড়ীর মধ্যে এসে ঢোকে।

তাদের দ্রুতবেগে বাড়ীর মধ্যে ঢুকতে দেখে পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় চন্দ্রমণি শিউরে ওঠে। ক্রোধ শঙ্কায় পরিণত হয়। উদ্বেগ ও আশঙ্কায় দৃষ্টি ডাগর হ'য়ে ওঠে। অজানা ভয়ে বুকের ভিতরটা টিপ টিপ করে। তাই আর সহসা তাদের কোন কথা জিজ্ঞাসা ক'রতে পারে না। শুধু উৎকণ্ঠায় অসংখ্য জিজ্ঞাসাপূর্ণ শঙ্কিত দৃষ্টিটা মুখের উপর তুলে ধরে।

তারা আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা ব'লে যায়।

শুনে চন্দ্রমণি আত্মসংযম হারিয়ে ফেলে। হাউ মাউ ক'রে কেঁদে ওঠে।

ক্রন্দনের শব্দে ক্ষুদিরাম শঙ্কিত মনে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে। দু'চারজন প্রতিবেশীও উপস্থিত হয়। বিস্তারিত শুনে উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ নিয়ে সবাই ঘটনাস্থলের দিকে দ্রুতবেগে রওনা দেয়। গদাধরের সংজ্ঞাশূন্য দেহটা ধরাধরি ক'রে বাড়ী আনে।

বাড়ীতে এনে সযত্নে শুইয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গদাধর নিদ্রোত্থিতের মত উঠে বসে। তার চারিপাশে অনেক লোক এবং তাদের বিস্মিত দৃষ্টি তার মুখের উপর দেখে অবাক হয়।

গদাধরকে চোখ মেলে চাইতে ও উঠে ব'সতে দেখে চন্দ্রমণির অস্ফুট ক্রন্দন থামে। সমস্ত উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা দূর হয়। আশ্বস্ত হ'য়ে পুত্রকে

বুকের ভিতর টেনে নিয়ে গভীর স্নেহে জিজ্ঞাসা করে, কি হ'য়েছিল বাবা ?

গদাধর কোন রকম ইতস্ততঃ না ক'রে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলে, আমার তো কিছু হয় নি মা !

চন্দ্রমণি আরো কিছু ব'লতে যাচ্ছিল, কিন্তু ক্ষুদিরাম বাধা দিয়ে বলে, এখন আর ওকে কোন কথা জিজ্ঞাসা ক'রো না। একটু সুস্থ হ'তে দাও।

গদাধরের সংজ্ঞা প্রাপ্তি ও সুস্থাবস্থা দেখে একে একে সকলেই চ'লে যায়।

সংসারের বৈকালিক কাজ সব প'ড়ে থাকায় চন্দ্রমণিও পুত্রকে নীরবে শুয়ে থাকার আদেশ দিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে। কিন্তু মনটা ভারাক্রান্ত হ'য়ে থাকে। যন্ত্রচালিতের মত সংসারের কাজগুলো করে বটে, কিন্তু পুত্রের ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কায় মনটা ভার হ'য়ে থাকে। নানা চিন্তা ভাবনা এসে তুফানমত্ত নদীর মত হৃদয়টাকে তোলপাড় ক'রে তোলে। —সুস্থ সবল ছেলে মাঠে গিয়ে হঠাৎ অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়লো কেন ? নিশ্চয় কোন অপদেবতার ভর হ'য়েছিল। তার সঙ্গে গত রাত্রে ছেলের শ্মশান-যাত্রা ও প্রেতাত্মাদের ছায়ামূর্ত্তির আবির্ভাবের ঘটনা মিলিয়ে ধারণাটা বদ্ধমূল হ'য়ে যায়। তার উপরে কন্যা কাত্যায়নীর ভূতাবেশ হবার পর থেকে অস্বাভাবিক কোন-কিছু হ'লেই বা দেখলেই সর্ব্বাগ্রে ঐ কথাটাই তার মনে আসে। কিছুতেই মন থেকে দূর ক'রতে পারে না। তাই গদাধরের গত দিনের ও আজকের কার্য্যকলাপ সব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ ক'রে একরকম নিশ্চিত হ'য়ে যায় যে, গদাধরকে ভূতে ধ'রেছে এবং সেই ধারণার বশবর্ত্তী হ'য়ে কাজের ফাঁকে এক সময় স্বামীর কাছে এসে শঙ্কিত কণ্ঠে বলে, হ্যাঁগা, আমার তো ভাল মনে হ'চ্ছে না। তুমি একটা রোজা ডাকো। ছেলেটাকে নিশ্চয়ই ভূত-প্রেতে ধ'রেছে। তা' না হ'লে সুস্থ সবল ছেলে মাঠে গিয়ে হঠাৎ বেহুঁস হ'য়ে পড়বে কেন ?

গদাধর হঠাৎ সংজ্ঞাশূন্য হওয়ায় ক্ষুদিরামও যে চিন্তিত হয় নি তা নয়, এবং তার কারণও মনে মনে চিন্তা করে। কিন্তু কোন সময়ের জন্য ভূতপ্রেতের কথা তার মনে হয় নি, ধ'রলে কাল রাত্রে শ্মশানেই ধ'রত। তা যখন ধরে নি তখন এই অপরাহ্ন বেলায় মাঠ জনশূন্য না হ'তে ধ'রবে না, এবং তার কোন লক্ষণও ছেলের মধ্যে দেখতে পায় নি। বিকৃত কণ্ঠস্বর, বিস্ফারিত দৃষ্টি, উদ্‌ভ্রান্ত ভাব, কিছুই নেই। বায়ু-রোগগ্রস্ত হ'লে হঠাৎ জ্ঞানশূন্য হয় বটে, তবে জ্ঞান হবার পর তাদের ক্লান্ত এবং অবসাদগ্রস্ত দেখায়। কিন্তু পুত্রের মধ্যে তার কোন আভাস পর্য্যন্ত নেই। নিদ্রোত্থিতের মত সুস্থ, সবল, স্বাভাবিক। এতটুকু অসুস্থতা বা ক্লান্তির লক্ষণ পর্য্যন্ত নেই। তবে কি কাল শ্মশান থেকে আসবার পর তার মুখেচোখে যে ভাব দেখেছিল...একি তারই পরিণাম ? কিন্তু বয়সের দিকে চেয়ে সে বিষয়েও নিঃসন্দেহ হ'তে পারে না। একটা কবিরাজকে দেখাবার কথা মনে মনে চিন্তা করে। কিন্তু চন্দ্রমণির কথায় ভাবনায় ছেদ পড়ে। তবে তার রেখাগুলো মুখ থেকে মুছে ফেলতে পারে না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চন্দ্রমণির কথার জবাবে বলে, না না, ভূতপ্রেত নয়। বায়ুর প্রকোপে বোধ হয় এমন হ'য়েছে। রোজা না ডেকে একটা কবিরাজ দেখান দরকার। যাক্, আজ সন্ধ্যে হ'য়ে গেছে, কাল একটা ব্যবস্থা ক'রবো। ব'লে চন্দ্রমণিকে আর কথা বলবার অবকাশ না দিয়ে রঘুবীরের সন্ধ্যারতির জন্য উঠে পড়ে। তারপর জিজ্ঞাসা করে,—ঠাকুরের আরতির জোগাড় হ'য়েছে ?

স্বামীর কথায় চন্দ্রমণির ভাবনা তবু দূর হয় না। তাই কোন জবাব না দিয়ে নীরবে ঘাড় নেড়ে জানায়, হ'য়েছে।

ক্ষুদিরামও আর কোন কথা না ব'লে ঠাকুরের শীতল দিতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে।

●

সাইত্রিশ

মা আদেশ ক'রে চ'লে যাবার পর গদাধর বিছানায় শুয়ে শুয়ে সমস্ত ঘটনাটা মনে মনে পর্য্যালোচনা করে। মাঠে গিয়ে প্রকৃতির বিচিত্র লীলা দেখে বাহ্যিক জ্ঞান হারিয়েছিল। তার ফলে আলের উপর পড়েও গিয়েছিল, কিন্তু আত্মচেতনা যায় নি। ভিতরে বেশ একটা প্রচ্ছন্ন জ্ঞান, সূক্ষ্ম অনুভূতি ছিল। তবে পৃথিবীর কোন-কিছু বা কারো কথা মনে ছিল না। এমন কি নিজেকে পর্য্যন্ত ভুলে গিয়েছিল। বেশ একটা অদ্ভুত আনন্দও পেয়েছিল। যে আনন্দকে পার্থিব জগতের কোন-কিছুর সঙ্গে তুলনা করা যায় না। খেলে, বেড়িয়ে সে আনন্দ পায়—সুযোগ পেলে তার সদ্ব্যবহার করে। এর জন্যে বাড়ীতে বকুনি খায়। কিন্তু আজ যে আনন্দ পেয়েছে আহারে বিহারে, খেলায় ধূলায় তা পায় নি। এই ভাবটা যদি আরো কিছুক্ষণ থাকতো বেশ হ'ত। কেন যে এরা সাত-তাড়াতাড়ি তুলে আনলো! না আনলে ক্ষুধা তৃষ্ণা, খেলা ধূলা সব ভুলে নিশ্চিন্তে মহাকাশে ঘুরে বেড়ানো যেত। তবে মানুষ মরে কোথায় যায় সে রহস্যের কিছুটা যেন জানা হ'য়ে গেছে। কিন্তু তার জন্যে বাপ মার এত ভাবনার কি কারণ হ'ল ? তা'কে বিছানায় শুয়ে থাকার আদেশই বা কেন দিয়ে গেল— এটা কিছুতেই বুঝতে পারে না। তার তো অসুখ-বিসুখ কিছু হয় নি। শরীরে কোন ক্লান্তি, দুর্ব্বলতা, কষ্ট কিছুই নেই। তবে তাকে চুপচাপ শুয়ে থাকতে ব'লে গেল কেন ?

ভাবতে ভাবতে রঘুবীরের সন্ধ্যারতির কাঁসর, ঘণ্টা বেজে ওঠে। গদাধর আর বিছানায় শুয়ে থাকতে পারে না। লাফ দিয়ে নেমে পড়ে। ঠাকুরঘরের দরজায় এসে দাঁড়ায়। ভক্তিভরে রঘুবীরের দিকে চেয়ে থাকে।

পুত্রকে সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় ঠাকুরঘরের দরজায় এসে দাঁড়াতে দেখে চন্দ্রমণির আশঙ্কা ও দুর্ভাবনা অনেকখানি ক'মে আসে বটে, তবে একেবারে যায় না। মনে মনে রঘুবীরকে ডেকে বার বার বলে, ঠাকুর, গদাইকে ভাল রেখ। তার যেন কিছু না হয়।

আরতি শেষে পুত্রকে সুস্থ ও স্বাভাবিক দেখে ক্ষুদিরামও বিস্মিত হয়। কাছে ডেকে নানাবিধ প্রশ্ন করে—মাঠে গিয়ে কোন-কিছু দেখেছিল কিনা ? কেন চৈতন্যটা লোপ হ'ল···ইত্যাদি।

গদাধর সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে বলে, সন্ধ্যাকাশে লাল মেঘের উপর দিয়ে টুক্‌রো টুক্‌রো কালো মেঘ ভেসে যেতে দেখে, আর তার নীচে দিয়ে সাদা সাদা পাখা মেলে বকপাখীকে উড়ে যেতে দেখে সে আত্মবিস্মৃত হ'য়ে প'ড়ে গিয়েছিল কিন্তু চৈতন্য একেবারে লোপ পায় নি। মনে সূক্ষ্ম অনুভূতির একটা রেশ ছিল। তবে সে সময় তার কারো কথা মনে ছিল না ও একটা অদ্ভুত আনন্দ বোধ ক'রছিল।

গদাধরের মুখ থেকে বিস্তারিত শুনে ক্ষুদিরামের মনে নানা সন্দেহ ও সংশয় এসে দেখা দেয়। সে শাস্ত্রজ্ঞ বড় বড় অবতার পুরুষের জীবন-চরিত প'ড়ে দেখেছে—তাঁরা বিশ্বপ্রকৃতির লীলায় মুগ্ধ হ'য়ে সমাধিস্থ হ'য়ে গেছেন, কিন্তু তার একটা বয়স বা সময় আছে। বিশ্বপ্রকৃতিকে বুঝবার মত জ্ঞান এলে তবে তার লীলা মনের মধ্যে ভাব সঞ্চার করে। লীলাময়ের সন্ধানে মন ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে। আর তখন তাঁর অনুসন্ধান ক'রতে গিয়ে বাহ্যিক অনুভূতি লোপ হ'য়ে যায়। তবে তাঁদেরও এ সব পরিণত বয়সেই ঘটেছে। এত অল্প বয়সে কারো যে এ ভাবে সমাধি হ'য়েছে তা তিনি জানেন না বা শোনেন নি। প্রকৃতির লীলামাধুর্য্য সম্বন্ধে যার কোন ধারণাই জন্মাল না, তার এ ভাবাবেশ হয় কি ক'রে ?

আবার মনে হয় জ্যোতিষ শাস্ত্রীর কথা—

"মহাপুরুষ সংজ্ঞোহয়ং নারায়ণাংশ সম্ভবঃ
সর্ব্বত্র জনপূজ্যশ্চ ভবিষ্যতি ন সংশয় ॥"

তবে কি তারই সূচনা দেখা দিল ? তাছাড়া কাল শ্মশান থেকে ফিরে আসার পর তার চোখে মুখে যে নির্লিপ্ত ভাব ও বৈরাগ্যের ছায়া দেখেছে তাতে আজ তার এ রকম হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। হয়তো উন্মুক্ত স্থানে গিয়ে গত রাত্রের কথা মনে প'ড়ে ভাবান্তর ঘ'টে গেছে। তবু বয়সের দিকে চেয়ে একেবারে নিঃসংশয় হ'তে পারে না। অপত্য স্নেহ, গয়াধামের কথা, জ্যোতিষ বচনার্থ সব শিথিল ক'রে আনে। রাত্রি অবসানে একজন কবিরাজ দেখানোই সমীচীন মনে করে।

চন্দ্রমণি তার ধারণার বশবর্ত্তী হ'য়ে সেই রাত্রে গদাধরকে অনাহারে রাখা মনস্থ করে। কারণ সে শুনেছে—ছেলেরা কখনো কোথাও···বিশেষ ক'রে সন্ধ্যার সময় বা রাত্রে ভয় পেলে তাদের অনাহারী রাখতে হয়। তাই ছেলেকে খাবার কথা না ব'লে শুতে যাবার নির্দ্দেশ দেয় ও ঘুমিয়ে প'ড়তে বলে।

মায়ের আদেশ শুনে গদাধরের মুখখানা শুকিয়ে যায়। একেই তো সে একটু পেটুক, তার এ দুর্ব্বলতা পাড়া প্রতিবেশী সকলেই জেনে ফেলেছে। তাই তারা খাবার সামগ্রী দিয়ে তাকে তুষ্ট ক'রে অভিনয়, গান, ব্যঙ্গ-কৌতুক প্রভৃতি শুনতে আসে। আজ আবার তাও কেউ আনে নি। কেবল বিকালবেলা মার দেওয়া সেই মুড়ি কটি। এবং সে কটি সব পেটে যায় নি। মাত্র কয়েক গাল খেয়েছে। তারপর মাঠে গিয়ে সে প'ড়ে গেছে, সেই সঙ্গে মুড়িগুলোও প'ড়ে গেছে। আর খাওয়া হয় নি। এমনিই তো ক্ষিধেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে। এখনই কিছু খেতে পেলে বেঁচে যায়। আর তাই ভেবে উঠেও এসেছে। ঠাকুরের আরতি হ'য়ে গেলেই খেতে দিতে ব'লবে। কিন্তু তার বলার আগেই মা ব'লে দিল, যাও শুয়ে পড় গে। আর অন্যদিন শুতে গেলে বলে, গদাই! একেবারে খাওয়া দাওয়া সেরে শোও গে। আর জ্বালিও না! সেই মা আজ একবার খাবার কথা তো ব'ল্‌লই না, আর যে ব'লবে—কণ্ঠস্বরে তার কোন আভাসও পাওয়া গেল না। এখন ক্ষিধের কথা ব'ললে যে কোন ফল হবে তাও মনে হয় না। কিন্তু সারা রাত ক্ষিধে

চেপে থাকা তো সম্ভব নয়। তাই মার দিকে করুণ দৃষ্টি তুলে প্রায় কাঁদো কাঁদো হ'য়ে বলে, আমার যে ক্ষিধে পেয়েছে। কখন সেই ভাত খেয়েছি…

চন্দ্রমণি গদাধরকে কথাটা শেষ করার অবকাশ না দিয়ে আরো দৃঢ় কণ্ঠে বলে, তা হোক, রোগ বালাই হ'লে এক-আধবেলা উপোস দিতে হয়। আর তাতে কেউ মরে না।

মার কথা বলার ধরণ দেখে অনুনয় করা যে বৃথা গদাধর তা বেশ বুঝতে পারে। তাই আর দ্বিরুক্তি না ক'রে ম্লান মুখে, হতাশ মনে গুটি গুটি ঘরের দিকে পা বাড়ায়।

গদাধরের ম্লান মুখের দিকে চেয়ে ক্ষুদিরামের মমতা হয়। চন্দ্রমণি যে আশঙ্কা ক'রে পুত্রকে অনাহারে রাখতে চায় সেটা অহেতুক ভেবে পুত্রের হ'য়ে অনুরোধ ক'রে বলে, ছেলেমানুষ, ক্ষিধে পেয়েছে ব'লছে… ভাত না দাও চারটি মুড়ি-টুড়ি দাও। ওতে কোন খারাপ হবে না।

স্বামীর কথায় চন্দ্রমণি আর দ্বিরুক্তি ক'রতে পারে না। তবে খুব খুশীও হয় না। তাই মুখভার ক'রে পুত্রের দিকে চেয়ে ঈষৎ রুক্ষকণ্ঠে বলে, বাবা, বাবা! এক-আধবেলা আর উপোস ক'রে থাকতে পারে না! ঘরে যাও! আমি গিয়ে দিয়ে আসছি।

মার মত পরিবর্ত্তনে গদাধর আশ্বস্ত হয়। ধড়ে প্রাণ আসে। বাবার উপর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা উথ্‌লে পড়ে। খুশী মনে ঘরের দিকে এগিয়ে যায়।

পরের দিন পাঠশালায় যাবার জন্যে প্রস্তুত হবার আগেই মা আদেশ জারী করে, তোমাকে আর পাঠশালায় যেতে হবে না। বাড়ী ব'সে পড়ো। আবার কোথাও গিয়ে বেহুঁস হ'য়ে প'ড়বে…

মার আদেশ শুনে গদাধরের মুখখানা আষাঢ়ের মেঘের মতনই কালো হ'য়ে ওঠে। সব উৎসাহ ও আনন্দ অন্তর্হিত হয়। সারাদিন একা একা বাড়ী ব'সে কি যে ক'রবে ভেবে পায় না।

তার উপরে বাবা আবার মার সঙ্গে যোগ দিয়ে বলে, হ্যাঁ, আজ আর পাঠশালায় যেতে হবে না। তোমাকে নিয়ে আমি কবিরাজ বাড়ী যাব।

বাবার কথা শুনে নিরাশার মধ্যে একটু আশা পায়। তবু যা হোক এই গণ্ডীর মধ্য থেকে একবার বেরুতে পারবে। দেখতে পাবে উন্মুক্ত আকাশ, ধান্যক্ষেত, সবুজ বনানী, প্রকৃতির বিচিত্র রূপ।

আজ যেন বুঝতে পারে বাইরে তাকে কে আকর্ষণ করে। কিসের মোহে সে ছুটে ছুটে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ে! আষাঢ়ের মেঘলা আকাশ, সেই সঙ্গে বৃষ্টিধারা তার মনে একটা সুর সৃষ্টি করে। পাগল ক'রে তোলে। সব কিছু ভুলিয়ে নেয়। দুই চোখে স্বপনের কাজল টেনে দেয়। সেই বৃষ্টিতে ভিজতে ভারী ভাল লাগে। ভিজেও। মাথার উপর দিয়ে এক পশলা বৃষ্টি চ'লে যায়। ভিজে বাড়ী আসে। মা দেখে তিরস্কার ক'রে বলে, ঐ দেখো, ছেলে আমাকে জ্বালিয়ে মারল। বৃষ্টিতে ভিজে একেবারে চুপচুপে হ'য়ে বাড়ী এল। এখন জ্বর-জ্বালা না হ'লে বাঁচি। এ ছেলেকে নিয়ে কি যে করি···

কিন্তু মা তো জানে না বা ধারণাও ক'রতে পারে না যে, এই বৃষ্টিতে ভিজে সে কি আনন্দ পায়। মনে তার কি অদ্ভুত নেশা লাগে। যার জন্যে তিরস্কার, লাঞ্ছনা, গঞ্জনার কথা ভুলে যায়। অথচ এঁরা প্রতিনিয়ত একটা না একটা আদেশ জারী ক'রে তার মনটাকে লাগাম দিয়ে টেনে রেখে—ভাবনাগুলোকে সীমাবদ্ধ ক'রে দিতে চায়। অর্থাৎ সে যা' করে সেটা কাজ নয়, সে যা ভাবে সেটা বৃথা। তার ভাবনা ও কাজ দুনিয়ার কোন কাজে লাগবে না। এমন কি তার নিজেরও কোন উপকারে লাগবে না।

ভাবতে ভাবতে গদাধর বেশ উত্তেজিত হ'য়ে ওঠে। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে—তার কাজ ও ভাবনা যে বৃথা নয় একদিন সে দেখিয়ে দেবে। নিশ্চয়ই দেবে। সেদিন মা বাবা ব'লবে, এমন ক'রে ভাবতে তুই শিখ্‌লি কোথা থেকে বাবা? কে তোকে শেখালো? সেই অনাগত দিনের স্বপ্ন দেখতে দেখতে ক্ষুণ্ণমনে ঘরের দাওয়ায় মাদুর বিছিয়ে প'ড়তে বসে।

একটু পরে ক্ষুদিরাম পূজার ফুল তুলে রেখে গদাধরকে নিয়ে কবিরাজ বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওনা দেয়।

পথে বেরিয়ে গদাধরের সমস্ত ক্ষুব্ধতা মিলিয়ে যায়। মনটা পাখীর মতন দিগন্তে ডানা মেলে উড়তে থাকে। মহানন্দে নাচতে নাচতে পিতাকে অনুসরণ ক'রে পথ হাঁটে।

সকাল বেলায় সপুত্র ক্ষুদিরামকে বাড়ীর দরজায় দেখে কবিরাজ বিস্মিত হয়। অভ্যর্থনা ক'রে বাইরের ঘরে এনে বসায়। বাড়ীর চাকরকে তামাক সেজে কড়ি বাঁধা হুঁকায় জল ফিরিয়ে দিয়ে যেতে বলে। তারপর ক্ষুদিরামের উপর কৌতূহলী দৃষ্টি তুলে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করে।

ক্ষুদিরাম গদাধরকে দেখিয়ে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা ও ব্যাধিগ্রস্ত হ'য়েছে কিনা সে বিষয়ে বিশেষ ভাবে পরীক্ষা ক'রে দেখতে বলে।

ক্ষুদিরামের কথা শুনে কবিরাজ দৃষ্টিটা অনুসন্ধিৎসু ক'রে গদাধরের উপর ফেলে। গভীর মনোযোগ সহকারে দু'হাতের নাড়ী পরীক্ষা করে। চক্ষু ও জিহবা কিছুই বাদ দেয় না। কিন্তু দেহে ব্যাধির কিছুমাত্র লক্ষণ খুঁজে পায় না। সাধারণ মানুষের ও বয়সের তুলনায় বরং বেশ সুস্থ ও সবলই মনে হয়। এতটুকু রক্তহীনতা বা দুর্ব্বলতার চিহ্ন নেই। তাই দৃষ্টিটা বিস্মিত ও বিস্ফারিত ক'রে ক্ষুদিরামের মুখের উপর তুলে বলে, না চাটুয্যে-মশায়, দেহে ব্যাধির কোন লক্ষণ নেই! বেশ সুস্থই আছে।

কবিরাজ খুব অভিজ্ঞ। নাম ও হাতযশ দুই-ই তার আছে। নাড়ী-জ্ঞানও যথেষ্ট। নাড়ী ধ'রে শুধু রোগ ব'লে দিতে পারে না···কোন্ রুগী সারবে আর কোন রুগী স'রবে তা পর্য্যন্ত ব'লে দিতে পারে। এমন কি সময়, মাস, দিন পর্য্যন্ত ব'লে দেয়। আর যা বলে তা একেবারে অব্যর্থ। যেন চিত্রগুপ্তের জমা খরচের খাতাটা দেখে এসেছে। তবে দোষের মধ্যে মানুষটা বড় স্পষ্ট কথা বলে এবং মুখের উপরই বলে। ধনী, দরিদ্র, পীড়িত, পীড়িতা কাকেও খাতির করে না।

সেই কবিরাজের মন্তব্য শুনে ক্ষুদিরাম একদিকে যেমন নিশ্চিন্ত হয়, অন্যদিকে তেমনি সমস্যায় পড়ে। ভাবনাটা আবার আগের পথে পা বাড়ায়। তবে এখন ভাববার সময় নয় বা জায়গাও নয়। তাই সে ভাবনার গতিরোধ ক'রে উঠে দাঁড়ায়। কবিরাজের কাছে বিদায় নিয়ে পুত্রসহ বেরিয়ে আসে।

বাড়ী ঢুকতেই চন্দ্রমণি গভীর উৎকণ্ঠা নিয়ে জিজ্ঞাসা করে—হ্যাঁগা, কবিরাজ কি ব'ল্লে ?

কবিরাজ যা ব'লেছে ক্ষুদিরাম সবিস্তারে চন্দ্রমণিকে বলে।

চন্দ্রমণি তবু আশ্বস্ত হ'তে পারে না। যে সন্দেহটা পূর্ব্বে ক'রেছে সেটা কাঁটার মত মনের মধ্যে খচ্ খচ্ করে। মনে মনে তার একটা প্রতিকারের উপায় খোঁজে।

বেলা হ'য়ে যাচ্ছে দেখে ক্ষুদিরাম পূজার জন্য প্রস্তুত হ'তে ঘরে ঢোকে।

অন্যান্য দিনের মত ধনী, প্রসন্ন ও দু'চারজন প্রতিবেশিনী যথা-নিয়মে মধ্যাহ্নকালে এসে উপস্থিত হয়।

কথায় কথায় চন্দ্রমণি গতকাল মাঠে গিয়ে গদাধরের অচৈতন্য হবার কথা বলে। প্রতিকারের বিধান জানতে চায়।

সবাই একবাক্যে অপদেবতার দৃষ্টি প'ড়েছে বলে ও কবচ ধারণ করিয়ে দিবার নির্দ্দেশ দেয়। সেই সঙ্গে উন্মুক্ত স্থানে অবাধ বিচরণের উপর বিধিনিষেধ আরোপ ক'রতে ব'লে সেদিনের মত মধ্যাহ্ন-সভা ভঙ্গ ক'রে উঠে পড়ে।

চন্দ্রমণি তার অসতর্ক মুহূর্ত্তে গদাধর আবার কালকের মত বেরিয়ে না পড়ে তাই বহির্গমন নিষেধ জারী ক'রে সংসারের কাজে মনোনিবেশ করে।

মার আদেশ শুনে গদাধরের বুক ভেঙ্গে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। সে যে সাবালক হ'য়েছে এ ধারণাটা সেই সঙ্গে নষ্ট হ'য়ে যায়। সমস্ত

বালসুলভ চপলতা হারিয়ে উদাস মনে বাড়ীর প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে থাকে। ভাবে—মা হয় তো তার উদাস ভাব দেখে আদেশটা প্রত্যাহার ক'রে নেবে। আর একেবারে না নিলেও অনেকটা শিথিল ক'রে দেবে। ব'লবে, আচ্ছা যাও। তবে অমুক অমুক জায়গায় যেন একা একা যেও না।

কিন্তু জননী ঘাটে যাবার আগে তাকে আরো হতাশ ক'রে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য অবাধ বিচরণের উপর নিষেধ জানিয়ে বেরিয়ে যায়।

যেটুকু আশার প্রদীপ মনের মধ্যে মিট্ মিট্ ক'রে জ্বলছিল তা একেবারে নিভে যায়। আবার যে কখন জ্বলবে তা অনুমান ক'রতে পারে না। অভিমানে মুখখানা অন্ধকার ক'রে ছলছল চোখে ঘরে এসে ঢোকে।

●

আটত্রিশ

এমনি ক'রে বর্ষা যায়, শরৎ আসে। আকাশ আবার সুনীল হয়। নিবিড় কালো মেঘের আস্তরণ ছিঁড়ে তপনদেব বেরিয়ে আসে। ধরণীকে আলোর বন্যায় ভাসিয়ে দেয়। মেঘগুলো খণ্ড খণ্ড হ'য়ে সারা আকাশময় ছুটাছুটি করে। কখনো কখনো সূর্য্যদেবকে আড়াল ক'রে দাঁড়ায়। কিন্তু আগের মতন আর নিষ্প্রভ ক'রতে পারে না—দুষ্টু ছেলের মতন একটু বিরক্ত ক'রে আবার ছুটে পালায়। সবুজ ধানের ক্ষেত পীতাভ হ'য়ে ওঠে। ফলভারে নত হ'য়ে পড়ে। কদম ঝরে, শেফালী ফোটে। দোয়েল, শ্যামা মুখর হ'য়ে কলগুঞ্জন করে। ধরিত্রী বেশ-পরিবর্ত্তন ক'রে দাঁড়ায়।

গদাধর কবি। প্রকৃতির বেশ-পরিবর্ত্তন দেখে মুগ্ধ হয়। বাধা-নিষেধ শিথিল হওয়ায় ভ্রমরের মত অধীর হ'য়ে বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে।

লতায় পাতায়, ফুলে ফলে জীবনের মধু সঞ্চয় করে। মনের নির্ব্বাপিত দীপশিখা আবার জ্ব'লে ওঠে।

কিন্তু ক্ষুদিরামের প্রাণ-প্রদীপ নিভে আসে। বর্ষায় ব্যাধিটা বৃদ্ধি পেয়ে দেহটাকে দুর্ব্বল ক'রে ফেলে। আনন্দ ও উৎসাহ কেড়ে নেয়। দেহ ও মনের অবস্থা হয় খেয়াঘাটে ব'সে থাকা উদাসীর মত। কিন্তু আত্মীয়-স্বজন থাকতে দেয় না। রামচাঁদ আনন্দময়ীর বোধন-উৎসবের আমন্ত্রণ পাঠায়।

রামচাঁদের অবস্থা সচ্ছল হবার পর থেকে প্রতি বছর আনন্দময়ীকে বাড়ীতে আনে। অকাতরে অর্থব্যয় করে। গীতবাদ্যে পূজামণ্ডপ মুখর ক'রে তোলে। ব্রাহ্মণ ভোজন, পণ্ডিত বিদায়, দীন দরিদ্রকে বস্ত্রদান প্রভৃতি ক'রে বাড়ীতে আনন্দের হাট বসায়। আত্মীয় স্বজন যে যেখানে আছে সবাইকে সবান্ধবে নিমন্ত্রণ করে। সকলেই আসে। ক'টা দিন উৎসবে যোগ দিয়ে জীবনের দুঃখ বেদনার উপর আনন্দের প্রলেপ বুলিয়ে যায়। চলার পথে প্রেরণা নিয়ে ফেরে। ক্ষুদিরামও যায়, তবে সপরিবারে যাওয়া হয় না। কারণ বাড়ীতে রঘুবীর আছেন। সপরিবারে গেলে তাঁর সেবার ত্রুটী হবে, তাই একাই যায়। কয়েকটা দিন আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে আনন্দে কাটিয়ে আসে।

কিন্তু এবার আমন্ত্রণে কোন আনন্দ পায় না। মনটা বরং বিষাদে ভ'রে ওঠে। দৈহিক দুর্ব্বলতা ও পথের কথা ভেবে বুকখানা শুকিয়ে আসে, অথচ সে যদি না যায় তা হ'লে রামচাঁদ খুব মর্ম্মাহত হবে। আনন্দময়ীকে এনে নিরানন্দে থাকবে। ভারাক্রান্ত মনে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন ক'রে যাবে। সে যে তাকে কতখানি ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে তা আর কেউ না জানুক সে জানে। তাই না-যাওয়ার কথাটা একেবারে চিন্তা ক'রতে পারে না। আবার গদাধরকে ছেড়ে যেতেও মন চায় না। কেন জানে না—শুধু মনে হয়, এবার গেলে আর হয়তো ফিরে আসতে পারবে না। এ যাত্রা তার অগস্ত্য যাত্রা হবে। গদাধরকে সঙ্গে নিয়ে

যাওয়া সমীচীন হবে না। একে দীর্ঘ পথ, তার উপরে চন্দ্রমণি তাকে ছেড়ে থাকতে পারবে না। পারলেও অশেষ উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ নিয়ে দিন কাটাবে। অবশ্য গদাধরকে ব'ললে এখনই সে লাফিয়ে উঠবে। যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে দেবে। কিন্তু তাকে নিয়ে যাওয়া আর এক বিপদ। যে দুরন্ত ছেলে—ওখানে গিয়ে কার সঙ্গে কোথায় চ'লে যাবে। নয়তো কোন শ্মশানে মশানে গিয়ে ব'সে থাকবে। আনন্দ ক'রতে গিয়ে নিরানন্দ হবে। সবাই ভাবনায় প'ড়বে। ব্যাকুল হবে। যে পাগল ছেলে, ওর অসাধ্য কোন কাজ নেই।

ভাবতে ভাবতে আরো কয়েকটা দিন চ'লে যায়। পূজার দিন এগিয়ে আসে। রামচাঁদ মনোক্ষুণ্ণ হবে তাই শেষ পর্য্যন্ত যাওয়াই স্থির করে। তবে মনে কোন উৎসাহ বা আনন্দ পায় না।

অবশেষে পূজার কয়েকদিন আগে রামকুমারকে সঙ্গে নিয়ে সেলাম-পুরের পথে পা বাড়ায়। যাবার সময় গদাধর সঙ্গ নেবার জন্যে বায়না ধরে। অনেক কষ্টে তাকে নিরস্ত করে। বুকের ভিতর জড়িয়ে ধ'রে গণ্ডে শিরে বার বার চুম্বন দেয়। ছেড়ে যেতে বেদনা বোধ করে। অন্তরটা হাহাকার ক'রে ওঠে। চক্ষু সজল হ'য়ে আসে। বিচ্ছেদটা চির বিচ্ছেদ ব'লে মনে হয়। ধারণাটা কিছুতেই মন থেকে দূর ক'রতে পারে না।

পিতা পুত্রের বিদায় দৃশ্যে চন্দ্রমণিও হৃদয়াবেগ সম্বরণ ক'রতে পারে না। চক্ষু সজল হ'য়ে ওঠে। কিন্তু স্বামীর দুর্ব্বলতা ও কাতরতা দেখে বিস্মিত হয়। কোনদিন তার মধ্যে দুর্ব্বলতা বা কাতরতা দেখে নি। বরাবরই দেখে এসেছে—স্বামী তার কর্ত্তব্যে কঠোর। সেখানে কোন দুর্ব্বলতার স্থান নেই। সে মানুষ আজ কেন যে এত কাতর হ'চ্ছে তার কারণ কিছুতেই বুঝতে পারে না।

রামকুমারও পিতৃচরিত্র জানে। তাই পিতার চোখে জল দেখে বিস্মিত হয়। কিন্তু কয়েকটা দিনের জন্য বিচ্ছেদে এত কাতর হবার কারণ খুঁজে পায় না।

বেলার দিকে চেয়ে রামকুমারই বিচ্ছেদের যবনিকা টেনে দিয়ে বলে, বাবা, চলুন। বেলা হ'য়ে যাচ্ছে।

রামকুমারের কথায় ক্ষুদিরাম আত্মসম্বরণ ক'রে নেয়। গদাধরকে আলিঙ্গনমুক্ত ক'রে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলে, হ্যাঁ চল। তারপর চাদরের প্রান্তভাগ দিয়ে চোখের জল মুছে চন্দ্রমণিকে সাবধানে থাকার নির্দ্দেশ ও সাংসারিক দু'চারটে উপদেশ দিয়ে ভারাক্রান্ত মনে বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে।

মাতুলকে পেয়ে রামচাঁদ খুব উৎফুল্ল হয়। আনন্দময়ীর আগমন সার্থক হ'য়ে ওঠে। কিন্তু আবার ব্যথিত হয় শুষ্ক শীর্ণ স্বাস্থ্য দেখে। অনুযোগ ক'রে বলে, আপনি হেঁটে এলেন কেন? আমাকে জানালে পাল্কী পাঠিয়ে দিতাম।

ক্ষুদিরাম কিছু একটা কৈফিয়ৎ দিয়ে ভাগিনেয়কে শান্ত করে।

সপ্তমী পূজার দিন থেকে ক্ষুদিরামের পীড়া প্রবল আকার ধারণ করে। আনন্দ নিরানন্দে পর্য্যবসিত হয়। পেটের যন্ত্রণায় কাতর হ'য়ে পড়ে। উঠে হেঁটে বেড়ান সম্ভব হয় না।

মাতুলের অবস্থা দেখে রামচাঁদ উদ্বিগ্ন হ'য়ে ওঠে। সেই সঙ্গে রামকুমার, রামশীলা ও হেমাঙ্গিনী চিন্তিত হয়। কেউ প্রাণ খুলে মহামায়ার পূজায় যোগ দিতে পারে না। একটা দুর্ভাবনা ও দুশ্চিন্তার কালোছায়া সবারই মুখের ওপর ফুটে ওঠে। শয্যাপাশ ছেড়ে কেউ আর সহসা উঠতে চায় না।

বিশেষ ক'রে রামচাঁদ, সে তার এই মাতুলকে দেবতার মতই শ্রদ্ধা করে। এতবড় নির্লোভ, নির্ভীক, নিষ্ঠাবান মানুষ এই বয়সের মধ্যে তার চোখে পড়ে নি। সেই মাতুলের যদি তার বাড়ীতে কোন-কিছু হয়

তা হ'লে দুঃখ ও ক্ষোভের সীমা থাকবে না। আর এ মানুষকে হারানোর ব্যথাও তার সহ্য হবে না। তাই সঙ্গে সঙ্গে কবিরাজ ডাকে। সেবা-শুশ্রূষার জন্যে লোক নিয়োগ করে। শত কাজের মধ্যেও বার বার এসে শয্যাপার্শ্বে বসে।

যদিও কবিরাজ আসে, ওষুধ দেয়। ক্ষুদিরাম তা' সেবনও করে কিন্তু মনের নিভৃত স্থানে শুনতে পায় মহাকালের চরণধ্বনি। চোখের পাতায় ঘনিয়ে আসে অনন্ত অন্ধকার। হৃদয়ে নামে বিস্মৃতির যবনিকা।

শেষ মুহূর্ত্তে ক্ষুদিরাম সেই যবনিকাকে দু'হাত দিয়ে সরিয়ে দেয়। আঁখি মেলে চায়। মনে মনে মহামায়াকে ডেকে বলে, যদি কোনদিন তোকে ভক্তিভরে ডেকে থাকি মা, তবে তোর পূজা শেষ না হ'তে আমায় নিস্ না। তারপর রামচাঁদকে তার শিয়রে ব'সে থাকতে দেখে বিস্মিত ও ব্যস্ত হ'য়ে ক্ষীণকণ্ঠে বলে, একি! তুমি এখানে ব'সে আছো? যাও যাও, তোমার বাড়ীতে পূজো, তোমার কি রোগীর কাছে ব'সে থাকা উচিৎ? আমি এখন বেশ সুস্থ বোধ ক'রছি। আমার জন্যে ভাবতে হবে না। মার পূজায় যেন কোন ত্রুটি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখো।

মাতুলের কথা শুনে রামচাঁদ একটু আশ্বস্ত হয়। শয্যাপাশ ছেড়ে উঠে আসে।

ক্ষুদিরাম আবার আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়ে। তন্দ্রাঘোরে মহাকালকে দেখে। দেখে ভয়ও জাগে না, ভাবনাও আসে না। পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার জন্যে মনে মনে প্রস্তুত হয়। রঘুবীরকে স্মরণ করে।

কিন্তু তার তন্দ্রাচ্ছন্ন আঁখিতারকায় যে এসে দাঁড়ায় সে নব দূর্ব্বাদল-বরণ, হাতে ধনুর্ব্বাণ, সারা জীবনের আরাধ্য দেবতা বালকবেশী শ্রীরামচন্দ্র নয়, আসে তার বালকপুত্র রক্তমাংসের দেহধারী গদাধর।

ক্ষুদিরাম শিউরে ওঠে। একি! একি! আজ সে সর্ব্ব মায়া, সকল মোহমুক্ত হ'য়ে বিদায় নিতে চায়। আর যেন পৃথিবীর কোন আকর্ষণ তাকে না টানে। যাবার বেলায় এতটুকু দুঃখ, কিছুমাত্র ক্ষোভ, লেশমাত্র

অনুশোচনা চিত্তকে দুর্ব্বল না করে, সেই ভাবেই সে নিজেকে প্রস্তুত ক'রে রেখেছিল। বিশ্বাসও ছিল বিদায় বেলায় ধূলার জিনিষ ধূলাতেই রেখে যাবে। দয়া, মায়া, স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা যা দিয়ে ঘর বেঁধেছিল সব ফেলে দিয়ে চ'লে যাবে। একবারও পিছু ফিরে চাইবে না। কিন্তু গদাধর এসে তাকে পিছু টানে কেন ?

না না, কাকেও চাই না। হোক গদাধর তার স্নেহের পুত্র, আদরের ধন, কিন্তু সে মায়ার বন্ধন। পরপারের অন্তরায়।

ক্ষুদিরাম জোর ক'রে গদাধরকে মন থেকে মুছে ফেলে। বালকবেশী শ্রীরামচন্দ্রের মূর্ত্তিটা আবার স্মরণ করে। মনে মনে বলে, যাবার সময় দেখা দাও প্রভু।

কিন্তু না, রামচন্দ্র আসে না। সকল সাধনা, শত চেষ্টা, আকুল আহ্বান ব্যর্থ ক'রে গদাধর এসে দুটি চক্ষু আলো ক'রে দাঁড়ায়। ক্ষুদিরামের অন্তরাত্মা হাহাকার ক'রে ওঠে। নিবিড় হতাশায় আবার চক্ষু উন্মোচন ক'রে।

এমনি ক'রে অষ্টমী, নবমী চ'লে যায়। আসে দশমী।

কবিরাজ নাড়ী পরীক্ষা ক'রে মুখ বিকৃত করে। রামচাঁদ ও রামকুমারকে শেষ অবস্থার কথা জানিয়ে দেয়। নিদান কালের ওষুধ মকরধ্বজ দিয়ে যায়।

রামকুমার, রামচাঁদ, হেমাঙ্গিনীর মুখে শোকের ছায়া পড়ে। এক হাতে চোখের জল মুছে দশমীর বিধি শেষ করে। আনন্দময়ীকে বিসর্জ্জন দিয়ে পরমারাধ্য মাতুলের শয্যাপাশে এসে বসে। আত্মীয়রাও ভীড় ক'রে দাঁড়ায়।

রামচাঁদের সাড়া পেয়ে ক্ষুদিরাম স্তিমিত আঁখি উন্মোচন করে। মহামায়ার বিসর্জ্জন হ'য়েছে কিনা জানতে চায়।

রামচাঁদ জানায়—হ'য়েছে।

শুনে ক্ষুদিরামের জীর্ণ পঞ্জর ফুলে একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে। ক্ষীণকণ্ঠে বলে, রামচাঁদ, আমায় বসিয়ে দাও।

রামচাঁদ, রামকুমার, হেমাঙ্গিনী ধরাধরি ক'রে শয্যায় ব'সিয়ে দেয়। বুঝতে পারে, সময় অন্তিম হ'য়ে এসেছে। তাই বয়োকনিষ্ঠরা সজল চোখে চরণ ধূলি নিয়ে ৺বিজয়ার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানায়।

ক্ষুদিরাম দুর্ব্বল হাত তুলে সর্ব্বান্তঃকরণে সকলকে আশীর্ব্বাদ করে। তারপর ক্ষীণকণ্ঠে তিনবার রঘুবীরের নামোচ্চারণ করে। সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর শেষ আলোটুকু নয়ন হ'তে মুছে যায়। অন্তিম নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে। চৈতন্যের ওপর চিরকালের মত বিস্মৃতির যবনিকা নামে। দেহটা শয্যার ওপর এলিয়ে পড়ে। প্রাণ-বিহঙ্গ দেহ-পিঞ্জর ছেড়ে মহাশূন্যে উড়ে যায়। বিন্দু সিন্ধুতে গিয়ে মেশে।

সবাই হাহাকার ক'রে ওঠে।

গদাধর তখন জানতেও পারে না যে, তার জীবন-বীণার একটি তার ছিঁড়ে গেল। আদর, আব্দার, অভিমান জানাবার পাত্র চিরদিনের মত পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে চ'লে গেল।

●

শেষ

প্রকাশ পথে

লেখকের আর দু'খানা বই

১। গদাধর (২য় খণ্ড)

২। রামকৃষ্ণ-গুরু তোতাপুরী